ব্যাচেলর অব এডুকেশন

শিখন ও শিখনযাচাই

Learning and Assessment

EDBN 2401

রচনা

প্রফেসর মো: গোলাম মোস্তফা
প্রফেসর হোসনে আরা আহমেদ
প্রফেসর মো: মুজিবুর রহমান
রিজিয়া সুলতানা
সামসুদ্দিন আহমেদ তালুকদার

মূল্যায়ন

প্রফেসর নিখিল কুমার রায়
নুসরাত জাহান হোসেন
সালমা সুলতানা

সম্পাদনা

প্রফেসর মো: মুজিবুর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিখন ও শিখনযাচাই
EDBN 2401

বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট- ২ (টিকিউআই- ২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই- ২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই- ২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০
পুন:মুদ্রন: জানুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0103-8

মুদ্রণে:
সিকিউরিটি পেপার এন্ড কনভারটিং লি:
৬৫/২/১ বক্স কালবার্ড রোড
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

সূচিপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট ১	**শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া (শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে)**	**১-১২**
১.১	শিখন সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুটন ও পরিশোধন	২-৪
১.২	শিখনের শর্ত চিহ্নিতকরণ	৫-৯
১.৩	মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের শিখনের সাথে পরিচিতিকরণ এবং শিখন-শেখানোর সাথে সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়করণ	৯-১২
ইউনিট ২	**দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন মতবাদ**	**১৩-৩৭**
	আচরণবাদ	
২.১	সংযোজনবাদ (থর্নডাইক) ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (প্যাভলভ)	১৫-২১
২.২	করণ শিখন (স্কিনার) ও মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা ● করণ শিখন (স্কিনার) ● মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা	২১-২৪
	জ্ঞান বিকাশ মতবাদ	
২.৩	জ্যাঁ পিয়াঁজে-এর শিখন তত্ত্ব	২৫-২৮
২.৪	ব্রুনার-এর শিখন তত্ত্ব	২৮-২৯
২.৫	অসবেল-এর শিখন তত্ত্ব	৩০-৩২
২.৬	সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি), অসবর্ন ও উইট্রক-এর মতবাদ ● সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি) ● অসবর্ন ও উইট্রক-এর মতবাদ	৩৩-৩৪
২.৭	মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক গঠনবাদ ও জ্ঞান বিকাশ মতবাদের ভূমিকা।	৩৫-৩৭
ইউনিট ৩	**বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গঠনবাদী ধারণার প্রয়োগ**	**৩৮-৪৬**
৩.১	অংশগ্রহণমূলক ও সতীর্থ শিখন, দলগত কাজ-সম্মিলিত শিখন (জনসন এন্ড জনসন)	৩৯-৪২
৩.২	বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলীয় চেতনা, সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ ও কনসেপ্ট ম্যাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার	৪৩-৪৬
ইউনিট ৪	**পরিমাপ, মূল্যায়ন ও মূল্য যাচাই**	**৪৭-৬৪**
৪.১	পরিমাপ, শিখনযাচাই ও মূল্যায়নের ধারণা	৪৮-৫২
৪.২	গাঠনিক (ধারাবাহিক) ও সামষ্টিক (প্রান্তিক) শিখনযাচাই	৫২-৫৫
৪.৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই	৫৫-৫৬
৪.৪	আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের/(ক্ষেত্র বিশেষে অভীক্ষা) নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য : স্বচ্ছতা, যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা	৫৭-৬৪
ইউনিট ৫	**বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিরাজমান শিখনযাচাই কার্যক্রম**	**৬৫-৯৬**
৫.১	জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা	৬৬-৬৯
৫.২	শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই ও শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতার শিখনযাচাই	৬৯-৭৩
৫.৩	শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তনের শিখনযাচাই	৭৩-৭৯
৫.৪	পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক নির্দেশনা বা কৌশলের মাধ্যমে শিখনযাচাই	৮০-৮৭
৫.৫	মানদণ্ড ভিত্তিক শিখনযাচাই–একটি বিকল্প পন্থা	৮৭-৯০
৫.৬	শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নত করার জন্য শিখনযাচাই	৯০-৯৬

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট ৬	**বিভিন্ন প্রকার শিখনযাচাই : প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও অভীক্ষা গঠন**	**৯৭-১১৬**
৬.১	ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিখনযাচাই	৯৮-৯৯
৬.২	মানসম্মত প্রশ্ন, শ্রেণি অভীক্ষা ও পরীক্ষা সংগঠন ● রচনামূলক প্রশ্ন ● বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ● সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন	১০০-১১১
৬.৩	নম্বর প্রদানের মানদণ্ড ও নম্বর প্রদানের গ্রিড	১১২
৬.৪	উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার বৈশিষ্ট্য	১১৩-১১৪
৬.৫	প্রশ্ন মডারেশন ও চূড়ান্তকরণ	১১৫-১১৬
ইউনিট ৭	**অভীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যাক**রণ	**১১৭-১৪৫**
৭.১	গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয়	১২২-১৩২
৭.২	আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়	১৩৩-১৪১
৭.৩	স্বাভাবিক বণ্টন	১৪২-১৪৩
৭.৪	নম্বর বণ্টনের ব্যাখ্যাকরণ বা বিশ্লেষণ	১৪৩-১৪৫
ইউনিট ৮	**ধারাবাহিক শিখনযাচাই**	**১৪৬-১৬৭**
৮.১	ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য	১৪৮-১৫১
৮.২	ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ	১৫১-১৫৫
৮.৩	ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব	১৫৫-১৫৯
৮.৪	ধারাবাহিক শিখনযাচাই লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ	১৬০-১৬৭
ইউনিট ৯	**প্রতিফলন অনুশীলন**	**১৬৮-১৯১**
৯.১	প্রতিফলন অনুশীলন ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা	১৬৯-১৭৪
৯.২	প্রতিফলন শিখন চক্র	১৭৫-১৭৭
৯.৩	প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ	১৭৮-১৮১
৯.৪	প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী : শিক্ষক ডায়েরি, শিখন জার্নাল, সতীর্থ জার্নাল এবং প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা প্রণয়ন	১৮১-১৮৬
৯.৫	প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগে সমস্যা ও উত্তরণের উপায়	১৮৬-১৯১
	সহায়ক তথ্যসূত্র	**১৯২-১৯৩**

ইউনিট ১ : শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া (শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে)

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

১.১: শিখন সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুটন ও পরিশোধন

১.২: শিখনের শর্ত চিহ্নিতকরণ

১.৩: মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের শিখনের সাথে পরিচিতিকরণ এবং শিখন-শেখানোর সাথে সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়করণ।

ইউনিট ১ : শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া (শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে)

মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিখন (learning)। মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সবই হচ্ছে শিখনের সমন্বিত ফসল। মানব শিশুর শৈশবকাল কাটে তার মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনের সাহচর্যে। শিশু তাদের কাছ থেকে দেখে দেখে এবং শুনে শুনে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এরপর ধীরে ধীরে সেগুলো আয়ত্ত করতে শেখে। নতুন কোনো কিছু আয়ত্তকরণই হলো শিখন। নতুন ও পুরোনো অভিজ্ঞতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমেই হয় শিখন। শিখনের মাধ্যমেই প্রাণী তার কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে।

মানুষ জৈবিক, মানসিক ও নান্দনিক প্রয়োজনে প্রথমে সে তার পরিবার থেকে টিকে থাকার মতো কিছু কৌশল আয়ত্ত করে। এরপর সে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তাকে বেষ্টিত সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেও আয়ত্ত করে থাকে নিত্যনতুন জ্ঞান, কলাকৌশল ও আচরণ।

পরিবর্তনশীল বিচিত্র পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য মানুষকে আয়ত্ত করতে হয় নিত্যনতুন জ্ঞান, কলাকৌশল ও আচরণ। এই আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াকেই শিখন বলা হয়। শিখনের বিষয়বস্তু হতে পারে কতকগুলো (ideas), ধারণা (concept), কাজের কায়দা-কানুন (skills), অথবা আচরণ (behaviour)। নতুন যা কিছু মানুষ আয়ত্ত করে তার মূলে থাকে পুরোনো অভিজ্ঞতা। সেই পুরোনো অভিজ্ঞতা এগিয়ে দিচ্ছে নতুন অভিজ্ঞতার দিকে। নতুন আর পুরাতনের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই হয় শিখন। শিখনের ফলে শুধু বাহ্যিক আচরণে নয় অভ্যন্তরীণ ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ ব্যক্তির আচরণ ও অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন দেখা দেয়।

শিখনের একটি প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, শিখন ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায়। অন্যদিকে বলা যায় অভিজ্ঞতা অর্জনও শিখন। তবে অভিজ্ঞতা ভালো বা মন্দ হতে পারে। কিন্তু শিখন বা শিখন অভিজ্ঞতা বলতে ইতিবাচক শিখনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কেননা নেতিবাচক পরিবর্তন সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয় এবং এই উভয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে এ জগতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এজন্য শিক্ষক হিসেবে জানা দরকার কোনো্ কোনো্ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিখলে একজন শিশুর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং কী কী শিখনের মাধ্যমে তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে তা পরিস্ফুটনের জন্য বিষয়টি নিম্নবর্ণিত তিনটি ধাপে আলোচিত হয়েছে–

১.১: শিখন সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুটন ও পরিশোধন

১.২: শিখনের শর্ত চিহ্নিতকরণ

১.৩: মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের শিখনের সাথে পরিচিতিকরণ এবং শিখন-শেখানোর সাথে সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়করণ।

১.১ : শিখন সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুটন ও পরিশোধন

শিখন যে ঠিক কীভাবে ঘটে বা ঠিক কী প্রক্রিয়ায় ঘটে সেটি এক কথায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। তবুও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। নিচে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

এ.বি. ক্রাইডার (A.B. Crider) ও তার দলের মতে, æLearning can be defined as relatively permanent change in immediate or potential behaviours that results from experience." অর্থাৎ শিখনকে তাৎক্ষণিক বা কার্যকর আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা অভিজ্ঞতার ফলে উদ্ভূত হয়।

মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ (Woodworth) এর মতে, শিখন হচ্ছে ব্যক্তির পক্ষে নতুন ধারণা (new ideas) বা দক্ষতা (skills) অর্জন। তাই তিনি বলেছেন, 'শিখন হলো এমন এক পূর্ববর্তী ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।' অর্থাৎ যখনই কোনো ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য করা যায় তখনই ওই ক্রিয়াকে শিখনের ফল বলে মনে করা হয়। মনোবিদ গিলফোর্ড (Gilford) বলেছেন, 'শিখন এক ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারাই সংঘটিত হয়।'

ম্যাকডুগাল (Mcdugal) বলেন, 'শিখন হলো অভ্যাসের ফলে আচরণের পরিবর্তন।'
ই.এল. থর্নডাইক (E.L. Thorndike) এর মতে, 'শিখন হচ্ছে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফল।'

মর্গ্যান অ্যান্ড কিং (Morgan and King) বলেছেন, 'শিখনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় আচরণের যে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে যা ঘটে অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে।'

এই সংজ্ঞায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে–

১. শিখন হলো আচরণের একটি পরিবর্তন;
২. এটি আচরণের সেই ধরনের পরিবর্তন যা ঘটে অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের মাধ্যমে;
৩. শিখন হতে হলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হতে হবে।

কোহলার (Cohler), কোফকা (Coffka) ও ওয়ার্দিমার (Wertheimer) গেস্টাল্টবাদীদের (যেসব মনোবিজ্ঞানী মনের দর্শনে বিশ্বাসী) মতে, 'কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করাই হলো শিখন।'

প্লেটোর (Plato) মতে, এই বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিমূর্ত 'ধারণা' রয়েছে। যার ফলে মানুষ ওই বস্তুটির বিমূর্ত ধারণার সাথে বাস্তব বস্তুটির অনুষঙ্গ স্থাপন করে বস্তু সম্পর্কে 'প্রকৃত ধারণা' অর্জন করে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির শিখন সম্পন্ন হয়। জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্লেটোর ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ জীবনব্যাপী যে জ্ঞান অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে তা কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে। আর এ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মানুষ নিজের ধারণাকে পরিশুদ্ধ ও স্পষ্ট করে। ফলে কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব ধারণা আরও বাস্তবভিত্তিক হয়। কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে এই যে বাস্তবভিত্তিক ধারণা গঠন এটিই 'শিখন'।

এরিস্টটল (Aristotle) বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা থেকেই যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছে (..... knowledge was gained from sense experience and thinking.)। জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অনুধাবন থেকে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন হয় তা-ই প্রকৃত জ্ঞান। আর জ্ঞান অর্জনের এই উপায়কেই 'শিখন' হিসেবে অভিহিত করা যায়। এজন্য এরিস্টটলকে অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) দার্শনিক বলা হয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। ফলে অভিজ্ঞতাকে শিখনের অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এরিস্টটল মনে করেন, 'অভিজ্ঞতা সকল জ্ঞানের উৎস।' সে জন্যই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনকে 'শিখন' বলা হয়।

শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সে জন্য আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে শিখন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। The American Heritage Dictionary-তে শিখনকে æTo gain knowledge, comprehension or mastery through experience or study" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই সংজ্ঞায় 'knowledge', 'comprehension' ও 'mastery'–এর মতো অস্পষ্ট শব্দের উপস্থিতির জন্য অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী হেরিটেজ অভিধানে বর্ণিত শিখনের এই অর্থকে মেনে নিতে চাননি। কারণ তাঁদের মতে, 'আচরণের পর্যবেক্ষণীয় পরিবর্তনই হচ্ছে শিখন।'

শিখন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বলা যায়, শিখন হচ্ছে, প্রাণীর এমন এক পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ যা অর্জনের পূর্বে প্রাণী ওই আচরণটি করতে পারতো না, অথচ শিখন সম্পন্ন হওয়ার পর অনায়াসেই প্রাণী ওই কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে পারে বা কোনো কিছু করতে পারে। প্রাণীর এই কাঙ্ক্ষিত আচরণ করা বা কোনো কিছু করাই হলো শিখন। যেমন– দুই বছরের শিশু প্রথম 'চেয়ার' দেখার পর কোনোভাবেই বলতে পারে না এটি কী জিনিস বা বস্তু। কিন্তু যখন তার সামনে 'চেয়ার' দেখানোর সাথে সাথে 'চেয়ার' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তখন ধীরে ধীরে শিশুটি বাস্তব চেয়ারের সাথে উচ্চারিত 'চেয়ার' শব্দটির সংযোগ সাধন করে নিজের মস্তিষ্কে এর একটি প্রতিবিম্ব ধারণ করে। পরবর্তীকালে 'চেয়ার' দেখলেই সে বলে দিতে পারে এটি 'চেয়ার'। এভাবেই শিশুর আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিখনের জন্য দরকার নতুন নতুন জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতা অর্জন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জন্মের পর শিশু অসহায় থাকে। ধীরে ধীরে সে খেতে, কথা বলতে, হাঁটতে ও খেলতে শেখে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুটি বিভিন্ন কাজ করা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক রীতিনীতি শেখা এবং এক সময় পড়ালেখা শেখার চেষ্টা করে। কার্যত সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তাকে অনেক কিছুই শিখতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, শিখনের মূল উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তির আচরণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মোকাবেলা করতে সহায়তা করা; আর এ পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলো পরিবেশের সাথে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার উপযোগী সেগুলোকে স্থায়ী করা। তাই সহজভাবে বলা যায় যে, আচরণের পরিমাপযোগ্য পরিবর্তনই হলো শিখন।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে

শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিম্নবর্ণিত উপায় অনুসরণ করে শেখার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে, যেমন–

- পারিবারিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে;
- পরিবারের বড়দের অনুকরণ করে;
- শিশুর চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের নানা ধরনের কার্যক্রম থেকে;
- দৈনন্দিন কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে;
- ভুল করে করে;
- অনুশীলন করে;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে;
- সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে interaction করে;
- কোনো কিছু স্পর্শের মাধ্যমে অনুভূতি দিয়ে শেখে।

শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার চারপাশের জগতের সাথে পরিচিত হতে থাকে। তার জগত যত বড় হয় ততই তার জানার পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তার এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জিত হয় বিভিন্ন শিখনের মাধ্যমে। অর্থাৎ কোনো অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার জন্য যে কসরত বা প্রচেষ্টা সেটাই হলো শিখন। শিশু যখন তার সমবয়সীদের সাথে স্কুলে যেতে শুরু করে তখন সে আরও বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করে শেখে। সেসব কৌশলকে নিম্নবর্ণিতভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে–

১. দৃষ্টি নির্ভর শিখন কৌশল

- প্রতীক বা চিহ্ন বা আইকন দিয়ে প্রকাশ করা
- কোনো বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিহ্নিত করা
- কোনো বিষয়বস্তুকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা
- ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করা।

২. শ্রবণ নির্ভর শিখন কৌশল

- সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে আলোচনা করা
- কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বা অন্যকে শেখানো
- অন্যের কাছ থেকে কোনো কিছু শুনে শেখা।

৩. পঠন ও লিখন নির্ভর শিখন কৌশল

- চমকপ্রদ তথ্যসমূহ পড়া
- ভালো লাগার বিষয়গুলো লিখে রাখা
- নিরবে পড়া
- নিজের ভাষায় লেখা।

৪. অনুভূতি ও স্পর্শ নির্ভর শিখন কৌশল

- হাতের কাজ করা
- কোনো কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করা।

এ ছাড়া ব্যক্তির শিখনের আরও কিছু কৌশল রয়েছে, যার মাধ্যমে শিখন হয়ে থাকে। যেমন–

- তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে (Information Processing)
- কোনো কিছুর সাহায্যে (Scaffolding)
- অনুকরণের (Imitation) মাধ্যমে এবং
- মডেলিং বা নমুনার (Modeling) মাধ্যমে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিখনের মাধ্যম অনেক। যে মাধ্যমেই শিখুক না কেন এর দ্বারা ব্যক্তির আচরণের পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন হতে হবে এবং তা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হতে হবে। তবেই তার শিখন কার্যকর হবে।

১.২ : শিখনের শর্ত চিহ্নিতকরণ

শিখনের প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে অনুশীলন, দৈহিক ও মানসিক পরিণমন বা পরিপক্বতা, প্রেষণা এবং বলবৃদ্ধি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়। দৈহিক ও মানসিক পরিণমন শিখনের অপরিহার্য শর্ত। বিশেষ বিশেষ শিখনের জন্য নির্দিষ্ট দৈহিক ও মানসিক পরিণমন রয়েছে। তা হওয়ার আগে শিক্ষক যতই চেষ্টা করুন না কেন শিখন সম্ভব নয়। প্রেষণা হলো শিখনের একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। প্রাণী ওই আচরণটি করতে শিখে, যা দিয়ে সে তৃপ্তি পায়। প্রেষণা হলো তৃপ্তির পূর্বশর্ত। প্রেষণা না থাকলে তৃপ্তি লাভের প্রশ্নই আসে না। এছাড়া পর্যবেক্ষণ, মনোযোগ, আগ্রহ ও অনুরাগ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ও ফল লাভের জ্ঞান শিখনের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

শিখনকে কার্যকর করে তোলার জন্য যেসব কৌশল সহায়ক সেগুলোকে শিখনের শর্ত বলা হয়। নিচে এ রকম কিছু শর্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে–

১. **পরিপক্বতা :** পরিণমন হলো প্রাণীর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বা পরিপক্বতা। যথোপযুক্ত পরিণমন ঘটলেই যেমন পাখির ছানা পাখা মেলতে বা উড়তে শেখে, তেমনি মানব শিশু লিখতে, পড়তে ও জ্ঞান অর্জন করতে শেখে। এ ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিঁয়াজে তার শিখন তত্ত্বে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শিখনের জন্য বয়সের পরিপক্বতা প্রয়োজন। সব বয়সের শিক্ষার্থী সব বিষয় শিখতে পারে না। যেমন– ছয় মাসের শিশু হাঁটতে পারে না অথচ দুই বছরের শিশু দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। ছয় বছরের শিশু বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না। বিমূর্ত চিন্তার জন্য বার-তের বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত পরিণমন হলেই উপযুক্ত বিষয় শেখানো যায়। তাই শিশুর পরিণমনের উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়। দৈহিক ও মানসিক পরিণমন শিখনের অপরিহার্য শর্ত। বিশেষ বিশেষ শিখনের জন্য নির্দিষ্ট দৈহিক ও মানসিক পরিণমন প্রয়োজন। তা হওয়ার আগে শিক্ষক যতই চেষ্টা করুন না কেন শিখন সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জ্যাঁ পিঁয়াজের শিখন তত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

২. **প্রেষণা :** প্রেষণা হলো শিখনের একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। যা কিছু প্রাণীকে চালিত করে উজ্জীবিত করে তাকেই প্রেষণা বলে। প্রেষণা প্রাণীর মানসিক বা দৈহিক স্পৃহা বা চাহিদা থেকে উৎপত্তি হয় এবং প্রাণীকে কর্মশক্তি দান করে। প্রেষণাকে তৃপ্তির পূর্বশর্ত বলা হয়। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন প্রাণীর উপর গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন। প্রেষণা প্রাণীর আচরণের চালিকাশক্তি। উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবনে যে সক্রিয়তা ও গভীর গতিময়তার সৃষ্টি হয় তাই হলো প্রেষণা। মানুষের কতকগুলো শারীরিক ও মানসিক চাহিদা আছে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানি, বাতাস, জৈবিক ও শারীরিক চাহিদা এবং নিরাপত্তা, প্রতিপত্তি, ভালোবাসা, পুরস্কার ইত্যাদি মানসিক ও সামাজিক চাহিদা মানুষের মনে ও দেহে প্রেষণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এগুলোকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে শিখন ঘটে থাকে। প্রেষণা ব্যক্তির মাঝে আত্মসক্রিয়তার সৃষ্টি করে। সফল শিখনের মূলে থাকে এই আত্মসক্রিয়তা। তাই শিক্ষকের উচিত শিখনের উপকারিতা বর্ণনা করে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা জাগিয়ে তোলা। শেখার জন্য চাহিদা বা আগ্রহ না থাকলে কাউকে শেখানো যায় না।

৩. **অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি :** অধিকাংশ শিখনের জন্যেই অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি একান্ত প্রয়োজন। নামতা শেখা, গ্রামার শেখা, সাঁতার শেখা, সাইকেল চালানো শেখা, খেলাধুলা শেখা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। অনুশীলন অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। অনেক জটিল বিষয়বস্তুও অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তির ফলে সহজ হয় এবং দীর্ঘদিন তা মনে থাকে। তাই শিক্ষার্থীর উচিত বারবার অনুশীলন করা। দীর্ঘ কবিতার চরণ, গণিতের জটিল সূত্র, কোনো জটিল সংজ্ঞা স্মরণ রাখার জন্য অনুশীলনের বিকল্প নেই। অনুশীলনের ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪. **বলবৃদ্ধি/পুরস্কার :** বলবৃদ্ধি শিখনকে মজবুত করে। প্রাণীর সঠিক আচরণ বা নির্ভুল প্রতিক্রিয়াকে পুরস্কৃত করলে তা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে সেটা স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়। পুরস্কার ও প্রশংসা শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর করে তোলে। তাই শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহিত করা দরকার।

৫. **পর্যবেক্ষণ :** অনেক শিখনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণে যে যত বেশি মনোযোগী হবে তার শিখনও তত নিখুঁত হবে। দেখা গেছে, যেসব শিশু কোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখে তারা সে কাজটি তুলনামূলকভাবে ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন– বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ, রান্না শেখা, সেলাই শেখা ইত্যাদি। পর্যবেক্ষণ ছাড়া শুধু বই পড়ে কোনো কাজের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। পর্যবেক্ষণ যার যত নিখুঁত তার শিখন তত বেশি সফল হবে।

৬. **মনোযোগ :** শিখনের জন্যে মনোযোগ অপরিহার্য। আমরা যখন যে বিষয়ে মনোযোগ দেই সে বিষয়টিকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করি। অমনোযোগী শিক্ষার্থী কোনো বিষয় শিখতে পারে না। শিক্ষককে তাই শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করার জন্য শিক্ষককে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

৭. **আগ্রহ-অনুরাগ :** আমাদের চারপাশে পড়ে থাকা অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্যে আমরা বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নেই এবং তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। যে বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও অনুরাগ রয়েছে সে বিষয়টি আমরা বেছে নেই। আগ্রহ ও অনুরাগ ছাড়া কোনো কিছু শেখা সম্ভব হয় না। শিক্ষক যত ভালোই পাঠদান করুন না কেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ না থাকলে তাকে শেখাতে পারবেন না।

৮. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের একটা উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রয়েছে। পাঠ্য বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা থাকলে ঐ বিষয় সম্পর্কে তারা সচেতন হয় এবং বিষয়গুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখতে আগ্রহী হয়।

৯. **সমস্যা :** যা সহজলভ্য, অনায়াসে যা হাতের মুঠোয় এসে যায়, তার ফলে কোনো শিখন ঘটতে পারে না। কারণ পূর্বে আয়ত্তকৃত বা অভ্যস্ত আচরণের দ্বারাই তা লাভ করা যায়। শিক্ষাবিদ এ এন হোয়াইটহেড (Alfred North Whitehead) বলেছেন, যে পাঠ্যপুস্তকে কোনো সমস্যা নেই, কোনো কাঠিন্য নেই তা পুড়িয়ে ফেলা প্রয়োজন। অতএব পাঠ্যপুস্তকে অবশ্যই সমস্যামূলক পরিস্থিতি থাকবে। সমস্যামূলক পরিস্থিতি বলতে বোঝায় এমন একটা পরিস্থিতি যেন অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছানো আর সম্ভব হয় না এবং সময় ও পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ আবিষ্কার ও আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়। নতুন কার্যকর আচরণ আয়ত্ত করাই হলো শিখন। সমস্যা থাকলেই প্রাণী তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে। এভাবেই সে নতুন আচরণ বা শিখন আয়ত্ত করে।

১০. **সংযোগ বা অনুষঙ্গ :** শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো সংযোগকরণ। সংযোগ অর্থ দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগাযোগ তৈরি করা। এই সংযোগ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে।

শিখনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

শিখন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এসব বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো–

১. **আচরণের পরিবর্তন :** শিখনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে নতুন নতুন আচরণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। ব্যক্তির নতুন আচরণ করার যোগ্যতা অর্জনই হলো শিখন। অর্থাৎ পুরাতন আচরণের পরিবর্তন এবং নতুন আচরণ সম্পাদনই শিখন।

২. **নতুন অভিজ্ঞতা :** ব্যক্তি কী ধরনের আচরণ করবে তা নতুন অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আচরণের পরিবর্তন নির্ভর করে ব্যক্তির নতুন নতুন অভিজ্ঞতার উপর। কারণ শিখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নতুন আচরণ সম্পাদনের মাঝেই ব্যক্তি বিশেষ নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

৩. **আচরণের স্থায়িত্ব :** নতুন আচরণের স্থায়ি ত্ব না থাকলে তাকে শিখন বলা যাবে না। কোনো কিছু আজ শিখে পরদিন তা ভুলে গেলে তাকে শিখন বলা যাবে না। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, শিখনের ফলে ব্যক্তির বা প্রাণীর আচরণের পরিবর্তন হয়ে যে নতুন আচরণের অভ্যাস গড়ে উঠে তা স্থায়ী হয়। এই স্থায়ী আচরণ করাই শিখন।

৪. **আচরণের উৎকর্ষতা :** ব্যক্তির যখন শিখন সম্পন্ন হয় তখন তার আচরণেরও গুণগত পরিবর্তন হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যেমে নতুন নতুন আচরণ অর্জনের সাথে সাথে পুরনো আচরণ পরিত্যাগ করে ক্রমাগত নতুন আচরণ করে তখন তা প্রত্যাশিত হয় এবং এর গুণগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে। এ কারণে শিখনের ফলে আচরণের শুধু পরিবর্তন নয় উন্নত আচরণ আশা করা যায়।

৫. **অনুশীলন ও অভ্যাস :** পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে বারবার চেষ্টা ও অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। অনুশীলন বা অভ্যাস ছাড়া শিখন হয় না। নতুন অংক শিখতে বা টাইপ করতে অনুশীলন করতে হয়। এ থেকে বলা যায়, যে কোনো কাজই নতুন করে করতে হলে তাকে নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে এবং ওই কাজটি ভালোভাবে করার জন্য নিজের মধ্যে এক ধরনের অভ্যাস গঠন করতে হবে। কাজেই দেখা যায়, অভ্যাস ও অনুশীলন শিখনের বৈশিষ্ট্য।

৬. **পরিণমন :** পরিণমন বা পরিপক্বতা শিখনের একটি অপরিহার্য শর্ত। দৈহিক এবং মানসিকভাবে পরিপক্ব না হলে ব্যক্তি বিশেষকে বিষয়বস্তু বা দক্ষতা শেখানো যায় না। লেখা শিখতে গেলে হাতের আঙুলগুলোর সে ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ জন্য শিখনের ক্ষেত্রে পরিপক্বতা অর্জন জরুরি।

৭. **প্রেষণা :** প্রেষণা হলো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চাহিদা বা তাগিদ যার কারণে ব্যক্তি কোনো কিছু সম্পন্ন করার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। ঠিক তেমনিভাবে ব্যক্তির ভেতর শেখার জন্য চাহিদা বা আগ্রহ না থাকলে নতুন কিছু শেখানো যায় না।

৮. **সমস্যা :** সৃষ্টির শুরু থেকেই সমস্যা সমাধানে মানুষের মধ্যে দুর্দমনীয় আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমাধানও মানুষ খুঁজে বের করে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে। সমস্যা সমাধানের জন্য নিরলসভাবে লেগে থাকার কারণে এক সময় মানুষ সফল হয়। এভাবেই সে নতুন আচরণ বা শিখন আয়ত্ত করে। আর শিখন প্রক্রিয়ার রয়েছে তিনটি স্তর। যথা : সমস্যা প্রত্যক্ষণ, উপযুক্ত আচরণের উদ্ভাবন এবং সেই আচরণের আত্মীকরণ।

৯. **বর্ধন ক্রিয়া :** সকল শিখনেই প্রয়োজন বলবর্ধনকারী বস্তুর। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার পর প্রাণী তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলে শিখন হয় না। প্রেষণার উপযুক্ত বর্ধন ক্রিয়া শিখনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

১০. **সংযোগ বা অনুষঙ্গ :** শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো সংযোগ সাধন। সংযোগ অর্থ দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা যোগাযোগ সংঘটিত হওয়া। এই সংযোগ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে।

সফল শিখনের জন্য শিক্ষকের করণীয়

সফল শিখনের জন্য শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো নিম্নরূপ–

- পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- বিদ্যালয়ে কার্যকর সময় তালিকা প্রণয়ন করা।
- শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্র ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
- পাঠাগার ও গবেষণাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা।
- শ্রেণি পাঠদানে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজ দেওয়া এবং সব শিক্ষার্থীকে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- দলগত কাজের সময় শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজের তদারকি করা, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা, তাদের সম্পন্ন করা কাজের জন্য প্রশংসা করা এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা।
- পাঠদানের পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, উপকরণ সংগ্রহ করা এবং যথাযথভাবে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতির ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদানের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের মন্দ দিকগুলো পরিহার করে ভালো দিকগুলোর বিকাশ লাভের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।
- মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীর গরজ ও তাড়নাকে সমাজ অভিপ্রেত পথে পরিচালনা করা।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শুধু শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শেখার ক্ষেত্র তৈরি করে দেবেন। দলগত কাজে সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী মিশ্রিত করে দেবেন, পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে দেবেন এবং দলগত কাজে উৎসাহ প্রদান করবেন। তাহলেই শিক্ষার্থীরা আপনা-আপনিই শিখবে।

শিখন সঞ্চালন (Transfer of Learning)

সঞ্চালন কথার অর্থ হলো স্থান পরিবর্তন। শিখন সঞ্চালন কথার অর্থ হলো শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতার স্থান পরিবর্তন। অর্থাৎ কোনো বিশেষ পরিস্থিতির শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারাই শিখন সঞ্চালন। যেমন– কোনো শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেই অভিজ্ঞতা যদি ভূগোল পাঠের ক্ষেত্রে স্থানান্তর করে ভূগোল পাঠকে সহজ এবং স্পষ্ট করে তুলতে পারে তবে সেক্ষেত্রে বলা যাবে শিখনের সঞ্চালন হয়েছে।

শিখন সঞ্চালনের প্রকারভেদ

শিখন সঞ্চালন তিন রকম হতে পারে। যথা–

১. ইতিবাচক সঞ্চালন (Positive Transfer)
২. নেতিবাচক সঞ্চালন (Negative Transfer)
৩. শূন্য সঞ্চালন (Zero Transfer)

নিচে এই তিন প্রকারের শিখন সঞ্চালনের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো–

১. ইতিবাচক সঞ্চালন (Positive Transfer)

পূর্ববর্তী শিখন যদি পরবর্তী শিখনকে সহায়তা করে তবে সেই শিখনকে ইতিবাচক সঞ্চালন বলে। যেমন– বাইসাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা থাকার কারণে যদি মোটর সাইকেল চালানো শিক্ষা দ্রুত হয় অর্থাৎ বাইসাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা মোটর সাইকেল চালানোর কাজে সাহায্য করে তাহলে এই সঞ্চালনকে শিখনের ইতিবাচক সঞ্চালন বলে।

২. নেতিবাচক সঞ্চালন (Negative Transfer)

পূর্ববর্তী শিখন যদি পরবর্তী শিখনকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে তাকে নেতিবাচক সঞ্চালন বলে। যেমন– বিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞান যদি ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে বা স্বাভাবিক অবস্থায় ভূগোল শিখনের যে হার তাকে কমিয়ে দেয় তাহলে বলা হবে যে বিজ্ঞানের শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে সঞ্চালিত হয়েছে।

৩. শূন্য সঞ্চালন (Zero Transfer)

পূর্ববর্তী শিখন যদি পরবর্তী শিখনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে অর্থাৎ পূর্ববর্তী শিখন যদি পরবর্তী শিখনকে সহায়তা না করে অথবা বাধাও না দেয় তাহলে তাকে শূন্য সঞ্চালন বলা হবে। যেমন– শিক্ষার্থী প্রথমে ইংরেজি শিখে পরে অংক শিখল, এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শিখন পরবর্তী শিখনে সহায়তাও করল না আবার বাধাও সৃষ্টি করল না। এক্ষেত্রে বলা যায় যে শিখনের কোনো সঞ্চালন হয়নি। এটাই হলো শূন্য সঞ্চালন।

শিখন সঞ্চালনের নীতিসমূহ

শিখন নিচের নীতিগুলো অনুসরণে সঞ্চালিত হয়–

- দুটি শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যদি মিল থাকে তাহলে ইতিবাচক সঞ্চালন হয়।
- শিখন সঞ্চালন নির্ভর করে অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণের উপর।
- দুটি শিখন পরিস্থিতিতে যদি উদ্দীপক অভিন্ন হয় এবং প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয় তাহলে নেতিবাচক সঞ্চালন হয়।
- দুটি পরিস্থিতিতে যদি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া দুটিই ভিন্ন হয়, তাহলে শূন্য সঞ্চালন হবে অর্থাৎ কোনো সঞ্চালনই হবে না।
- দুটি পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার ধরনের মিল যত বেশি থাকবে ইতিবাচক সঞ্চালনের সম্ভাবনা তত বেশি হয়। আর অমিল যত বেশি থাকবে নেতিবাচক সঞ্চালনের সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে।
- যদি দুটি শিখনে উদ্দীপক ভিন্ন কিন্তু প্রতিক্রিয়া একই রকম হয় তাহলে ইতিবাচক সঞ্চালন হবে। তবে যেহেতু উদ্দীপক দুটির মধ্যে মিল নেই তাই সঞ্চালন কম হবে।
- বেশি মেধাবী শিক্ষার্থীরা কম মেধাবী শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি সূক্ষ্মভাবে শিখনের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করতে পারে বলে তাদের ক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন বেশি হয়।
- অর্থ বুঝে অন্তর্দৃষ্টি সহকারে শিখনের অনুশীলন করলে ইতিবাচক সঞ্চালন বেশি হয়।
- যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি বেশি এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশি তার ক্ষেত্রে শিখনের ইতিবাচক সঞ্চালন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- পূর্ববর্তী শিখনের অনুশীলন বেশি হলে পরবর্তী শিখনে তার সঞ্চালন বেশি হয়।

শিখন সঞ্চালনের শিক্ষাগত মূল্য

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে যে নীতি কাজ করছে তা হলো শিখন সঞ্চালনের নীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত করতে না পারে, তাহলে সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা তার নিজস্ব তাৎপর্য হারাবে। শিখন সঞ্চালনের জন্য নিচের বিষয়গুলো বর্তমান থাকা প্রয়োজন–

- বিষয়বস্তুর অভিন্নতা
- পদ্ধতিগত অভিন্নতা
- মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রের অভিন্নতা
- উপরের ক্ষেত্রগুলোর সমাবেশ।

উপরের বর্ণনা থেকে বলা যায় যে, শিক্ষক যথেষ্ট সার্থক ও নির্ভুলভাবেই বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালনের সূত্রগুলোর প্রয়োগ করতে পারেন এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সহজ, দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারেন।

শিখন সঞ্চালনের জন্য শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষক যে বিষয়বস্তুই পাঠদানে সহযোগিতা করুন না কেন তিনি যদি শিখন সঞ্চালনের নীতিগুলো কাজে লাগাতে পারেন তাহলে শিখন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে। শিখন সঞ্চালনের জন্য শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো নিম্নরূপ–

- পাঠদানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর কী কী আচরণগত পরিবর্তন ঘটবে তা শিক্ষককে স্থির করে নিতে হবে।
- শিখনের বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে পাঠদান করা প্রয়োজন।
- শিখন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষণ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য বা সম্বন্ধ নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চালন করতে হবে।
- শিখন সঞ্চালন কার্যকর হয় এমন সব পদ্ধতি, যেমন– প্রদর্শন, কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন, আবিষ্কার প্রকল্প, পরীক্ষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষণে বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যতটা সম্ভব অভিন্নতা সৃষ্টি করে ধারণা গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষার্থী যাতে বিষয়বস্তুর ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারে সেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চালন করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর আংশিকের উপর জোর না দিয়ে সমগ্রের উপর জোর দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সংগঠন গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

শিখন অর্জন যথেষ্ট জটিল হলেও এর শর্তগুলো বিবেচনায় রেখে নতুন আচরণের প্রচেষ্টা রাখতে পারলে ব্যক্তি এক সময় সফল হবে এবং তার শিখন সম্পন্ন হবে। তবে এ জন্য ব্যক্তিকে শিখনের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে।

১.৩ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের শিখনের সাথে পরিচিতিকরণ এবং শিখন-শেখানোর সাথে সম্পৃক্তকরণ ও সমন্বয়করণ

সার্থক ও কার্যকর শিখনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে সতীর্থ শিক্ষণের (Peer teaching) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচে নিজ সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিকভাবে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করে ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারে। এতে গণতান্ত্রিক ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। শিক্ষক বিষয়ের উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার মাধ্যমে পাঠকে আকর্ষণীয় করতে প্রয়াস পান। শ্রেণিতে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়। উপস্থাপনের জড়তা হ্রাস পায়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সময়ানুবর্তিতার অনুশীলন হয়। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষক বিশেষভাবে মনোযোগী হতে পারে।

একজন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শ্রেণির অপর শিক্ষার্থীর সহায়তায় সহজে একটি বিষয় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নিঃসংকোচে আয়ত্ত করতে পারে। ফলে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য একইভাবে ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার্থীর জানার দমিত প্রশ্নটি বন্ধুদের কাছ থেকে সহজে জানা সম্ভব হয়। লাজুক ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বন্ধুর সহায়তায় পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মধ্য থেকে ভয় দূর করা সম্ভব হয় এবং তাদের ধারণা স্পষ্ট করা সম্ভব হয়।

সতীর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখেন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়ক ভূমিকা পালন করে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে দলগত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। সকলকে সমানভাবে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেন এবং দুর্বল শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

সর্বোপরি পাঠে আকর্ষণীয় উপস্থাপন, শিক্ষকের সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপকরণের সার্থক ব্যবহার, বিষয়ের অভিনবত্ব, শিক্ষকের বন্ধু সুলভ ব্যবহার, শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের সার্থক শিখনে সহায়তাদান করা সম্ভব।

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের জানতে হবে শিক্ষার্থীর শিখন কীভাবে হয় এবং একইসঙ্গে কার্যকর শ্রেণিপাঠনার জন্য রপ্ত করতে হবে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল। ২০১২ সালের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর বয়স ও বিষয়ের সহজতা ও কাঠিন্যের নিরিখে শিখন-শেখানো সম্পর্কে যা বলা হয়েছে নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হলো–

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে– শ্রেণিশিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করার জন্য অনেক শ্রম ও সময় প্রয়োজন তা যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে কম পরিশ্রমে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার বিষয়ে কয়েকটি কথা (মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী)

১. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দুটি ক্ষেত্র– মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত করা। এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।

২. মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপ্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপ্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। অতএব শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প বলা, ছবি আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র (every individual is a unique)। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

৪. শিক্ষাকে বলা হয় 'ব্লক প্রক্রিয়া'। ব্লকের উপর ব্লক স্থাপন করে বিরাট ইমারত তৈরি করা হয়। একইভাবে জানা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনে সহজে সহায়তা দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার্থীর

জীবন থেকে উপমা, উদাহরণ দিয়ে এবং পূর্বলব্ধ জ্ঞান, দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হলে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

৫. শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখে কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। কোনো সমস্যা সমাধানের যুক্তি ও পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করলে অনুরূপ সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে। তাই মুখস্থের চেয়ে বোঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৬. শিক্ষালাভে যথাযথ শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়েই কম-বেশি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও মূর্ত করে উপস্থাপন করে বিষয়টির উপর স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। একটি ছোট গাছ শ্রেণিতে প্রদর্শন করে গাছের বিভিন্ন অংশ বা মাল্টিমিডিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখালে যত সহজে সঠিক ধারণালাভ সম্ভব অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অভিনয় বা চার্ট ব্যবহার করা যায়।

৭. শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮. শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী শুধু লেখাপড়া বিষয়ক সমস্যা নয়, তার যে কোনো ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা নিঃসংকোচে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে কোনো দূরত্ব থাকবে না। তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে স্নেহ-শ্রদ্ধার এবং খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

৯. শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তাঁর সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন। সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শেখে। কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ওই শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উচ্চ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোনো শিক্ষার্থীকে কখনও 'মাথায় গোবর', 'তোকে দিয়ে কিছুই হবে না', 'গাধা', 'অপদার্থ' ইত্যাদি কোনো ধরনের নেতিবাচক বা নিরুৎসাহমূলক কথা বলা যাবে না। বেত ব্যবহার বা কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান শিক্ষা লাভের অন্তরায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উৎসাহ প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) শিখন বলতে কী বোঝায়?
(খ) শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে?

২. (ক) শিখনের উপাদানগুলো কী?
(খ) শিখনের শর্তগুলো লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) শিখনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিন।
(খ) কার্যকর শিখনের উপাদানসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. (ক) শিখনের সাথে পরিণমনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
(খ) 'শিখনের জন্য প্রেষণা অপরিহার্য'–ব্যাখ্যা করুন।

৩. (ক) সফল শিখনের জন্য শিক্ষকের করণীয় দিকগুলোর বর্ণনা দিন।
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে শিখন সম্পর্কে কী বলা হয়েছে বিস্তারিত লিখুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

রায়, সুশীল, শিক্ষা মনোবিদ্যা (১৯৯৯), ৮ম সংস্করণ।

হক, মোহাম্মদ নাজমুল ও জাহান, মনিরা, শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা: পিয়াঁজে তত্ত্ব (২০০২), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ শিখন সামগ্রী)–২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

Hergenhahn, B.R.(1982), An Introduction to Theories of Learning, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632, USA.

ইউনিট ২ : দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন মতবাদ

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

আচরণবাদ

২.১: সংযোজনবাদ (থর্নডাইক) ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (প্যাভলভ)

২.২: করণ শিখন (স্কিনার) এবং মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা

জ্ঞান বিকাশ মতবাদ

২.৩: জ্যাঁ পিয়াঁজে-এর শিখন তত্ত্ব

২.৪: ব্রুনার-এর শিখন তত্ত্ব

২.৫: অসবেল-এর শিখন তত্ত্ব

২.৬: সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি), অসবর্ন ও উইট্রক-এর মতবাদ

২.৭: মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক গঠনবাদ ও জ্ঞান বিকাশ মতবাদের ভূমিকা।

ইউনিট ২ : দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন মতবাদ

শিখন কীভাবে হয় সে সম্পর্কে যেসব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে থর্নডাইক (Thorndike), প্যাভলভ (Pavlov) এবং স্কিনার (Skinner) অন্যতম। এর মধ্যে থর্নডাইক সংযোজনবাদী মনোবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। থর্নডাইকের মতে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তাঁর মতে, উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হলো শিখন। আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বারবার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে শুধরে নেয় এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়।

রাশিয়ার শরীরতত্ত্ববিদ প্যাভলভ মনে করেন, নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং ওই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। এই শিখনকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়। বি.এফ. স্কিনারের করণ শিখন মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ। কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পুরস্কৃত হয়।

এ ছাড়াও জ্যাঁ পিয়াঁজে, ব্রুনার, অসবেল, অসবর্ন, উইট্রক এবং ভাইগোটস্কি শিখনের সাথে শিশুর বুদ্ধিমত্তা, ভাষা, পরিপক্বতা ও পরিণমনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তাদের সবাই এসব দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা মনোবিদদের গবেষণালব্ধ মতবাদকে প্রধানত ৩টি ধারায় ভাগ করা হয়েছে–

১. আচরণবাদ
২. জ্ঞান বিকাশ মতবাদ
৩. সামাজিক গঠনবাদ।

আচরণবাদীদের মতবাদের আওতাভুক্ত শিখনের সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদ–

- থর্নডাইকের সংযোজনবাদ
- প্যাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ
- স্কিনারের করণ শিখনবাদ।

জ্ঞান বিকাশ মতবাদে যেগুলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সেগুলো হচ্ছে–

- জ্যাঁ পিয়াঁজ এর শিখন তত্ত্ব
- ব্রুনার-এর শিখন তত্ত্ব
- অসবেল-এর শিখন তত্ত্ব।

সামাজিক মতবাদগুলো হচ্ছে

- সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি)
- অসবর্ন ও উইট্রক এর মতবাদ।

শিখন প্রক্রিয়ার উপর অনেকগুলো ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। এসব ঐতিহাসিক তত্ত্বের মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনা করা হলো। এই ইউনিটের পাঠগুলোকে নিম্নবর্ণিত ৭টি অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে–

আচরণবাদ

২.১: সংযোজনবাদ (থর্নডাইক) ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (প্যাভলভ)
২.২: করণ শিখন (স্কিনার) এবং মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা

জ্ঞান বিকাশ মতবাদ

২.৩: জ্যাঁ পিয়াঁজে-এর শিখন তত্ত্ব
২.৪: ব্রুনার-এর শিখন তত্ত্ব
২.৫: অসবেল-এর শিখন তত্ত্ব
২.৬: সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি), অসবর্ন ও উইট্রক-এর মতবাদ
২.৭: মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক গঠনবাদ ও জ্ঞান বিকাশ মতবাদের ভূমিকা।

২.১ : সংযোজনবাদ (থর্নডাইক) ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (প্যাভলভ)

বিখ্যাত মার্কিন মনোবিজ্ঞানী **ই.এল. থর্নডাইক** (Edward Lee Thorndike) সংযোজনবাদী মনোবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তাঁর মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন, উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হলো শিখন। আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বারবার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে সংশোধন করে নেয় এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়।

সংযোজনবাদী থর্নডাইকের শিখন মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপন। সংযোজনবাদের অপর নাম প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ। মতবাদটির উদ্ভাবক ই.এল. থর্নডাইক।

নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। এই শিখনকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়। এর উদ্ভাবক রাশিয়ার একজন শরীরতত্ত্ববিদ। তিনি হলেন **আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলভ** (Ivan Petrovich Pavlov)। সাপেক্ষীকরণ নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বলেই এই মতবাদকে 'চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ' বলা হয়। আসল উদ্দীপকের সাথে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক বারবার উপস্থাপিত হলে যে প্রতিক্রিয়া হয় পরবর্তীকালে শুধু কৃত্রিম উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াকে সাপেক্ষীকরণ বলে।

মনোবিজ্ঞানী **বি.এফ. স্কিনার** ((Burrhus Frederic Skinner) এর মতে, 'যেসব আচরণ বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির বা প্রাণীর জীবনে কোনো প্রয়োজন সাধন করে বা কোনো প্রেষণা নিবৃত্তি করতে সাহায্য করে সেই আচরণ শিখনকে করণ শিখন বলে।' করণ শিখনের মূল কথাই হচ্ছে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তিলাভ। কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় (তৃপ্তিলাভ করে বা সন্তুষ্ট হয়)। শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় খেয়াল রাখবেন শিখন হবে আগের কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে। শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে পুরস্কৃত (Reinforcement) করতে হবে।

সংযোজনবাদী থর্নডাইক-এর শিখন মতবাদ

আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী ই.এল. থর্নডাইক (Edward Lee Thorndike) ১৮৭৪ সালের ৩১ আগস্ট ম্যাসাচুসেটসের উইলিয়ামসবার্গে (Williamsburg, Massachusetts) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালের ৯ আগস্ট নিউইয়র্কের মনট্রোজে (Montrose, New York) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজে কাটিয়েছেন। তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী ও মানুষের শিখন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি সংযোজনবাদ (Connectionism) নামে শিখনের একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেন। এই মতবাদটি ১৮৯৯ সালে তাঁর Animal Intelligence নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়।

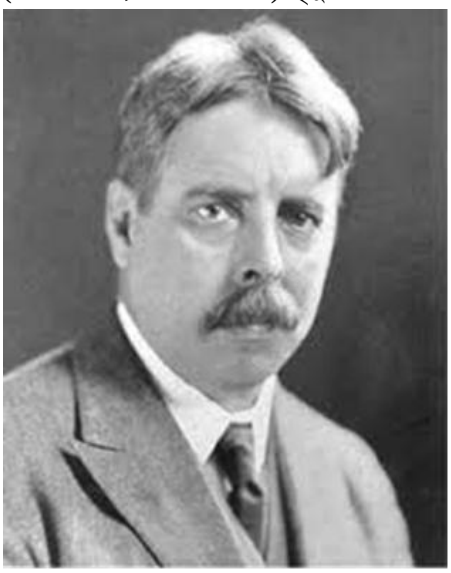

Edward Lee Thorndike

শিক্ষা সম্পর্কে থর্নডাইকের একটি স্মরণীয় উক্তি হলো, æJust as the science and art of agriculture depend upon chemistry and botany, so the art of education depends upon physiology and psychology."

থর্নডাইকের পরীক্ষণের বর্ণনা

ই.এল. থর্নডাইক উদ্ভাবিত সংযোজনবাদের (Connectionism) অপর নাম প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ। তার মতে, উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হলো শিখন। এই সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে প্রাণী বারবার নানা ধরনের ভুল প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। এভাবে সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বারবার চেষ্টা করে এবং এক সময় ভুলগুলোকে সংশোধন করে নেয়। এরপর এক পর্যায়ে সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। অর্থাৎ এভাবে শিখন সম্পূর্ণ হয়। থর্নডাইক এটি পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

এই পরীক্ষণটি পরিচালনার জন্য থর্নডাইক একটি ধাঁধা বাক্স (Puzzle Box) বা খাঁচা ব্যবহার করেন। ধাঁধা বাক্সটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে এর বিশেষ কোনো জায়গায় চাপ দিলে ধাঁধা বাক্স বা খাঁচার বন্ধ দরজা খুলে যায়। তিনি বিড়ালকে দিয়ে পরীক্ষণটি করেছেন। তাঁর পরীক্ষণে ব্যবহৃত বিড়ালটি ছিল ক্ষুধার্ত। বিড়ালটিকে ওই খাঁচার মধ্যে রাখা হতো; আর বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হতো মাছের টুকরা যা বিড়ালটি খাঁচার ভেতর থেকে দেখতে পেত। খাঁচাটির ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছিল যে খাঁচার ভেতরে স্থাপিত বিশেষ একটি চাবিতে চাপ দিলেই এর দরজা খুলে যাবে এবং বিড়ালটি খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। থর্নডাইক ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন আর খাঁচার বাইরে রাখলেন মাছের টুকরা। বিড়ালটি মাছ পাওয়ার জন্য খাঁচার ভেতর এলোপাথাড়িভাবে চেষ্টা করতে থাকে। এক সময় খাঁচার ভেতরের চাবির যথাস্থানে বিড়ালের থাবার চাপ পড়ায় দরজাটি হঠাৎ খুলে যায় এবং বিড়ালটি বাইরে এসে মাছটি পেয়ে যায়। খাঁচা থেকে প্রথমবার বের হয়ে আসতে বিড়ালের সময় লেগেছিল ১৬০ সেকেন্ড। এরপর একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিড়ালকে বারবার ওই খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। দেখা যায় যে, পরবর্তী প্রতিটি প্রচেষ্টায় তার সময় কম লাগছে। ২৪তম প্রচেষ্টায় খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে বিড়ালের সময় লেগেছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড। এই প্রচেষ্টা ও সময়ের তুলনামূলক চিত্রটি নিচে দেখানো হলো–

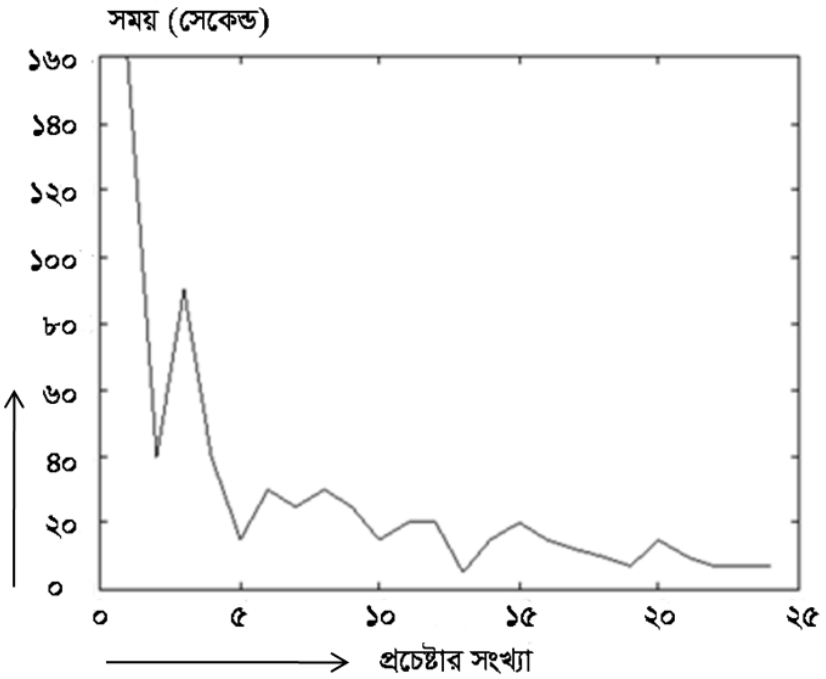

চিত্র: ধাঁধা বাক্স থেকে বিড়ালের বের হয়ে আসার সময় ও প্রচেষ্টার তুলনা

এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, প্রাণী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে শিখে থাকে এবং প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের পরিমাণও কম লাগে। থর্নডাইকের মতে, শুধু ইতর প্রাণীই নয়, মানুষও এই পদ্ধতিতে শিখে থাকে। অর্থাৎ মানুষও বারবার ভুল করে এবং ভুলগুলো সংশোধন করে শেখার চেষ্টা করে।

সংযোজনবাদী দার্শনিক থর্নডাইক এই পরীক্ষণের ভিত্তিতে শিখনের কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। তার শিখন মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপন। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের পরীক্ষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনি শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র উপস্থাপন করেন। সূত্র তিনটি হচ্ছে–

১. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)
২. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)
৩. ফললাভের সূত্র (Law of Effect)

এসব সূত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো–

১. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

শিখনের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, কোনো কিছু শেখার জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি থাকলে শিখন ত্বরান্বিত হয়। থর্নডাইকের মতে, শিখনের জন্য প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রাণীর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ বস্তু পাওয়ার জন্য যে অভাব বা তাড়নার উদ্ভব ঘটে যার ফলে প্রাণী ওই বস্তুটি পাওয়ার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায় এবং পরিণামে সফল হয়। তাঁর পরীক্ষণে ব্যবহৃত বিড়ালটি মানসিক ও দৈহিকভাবে প্রস্তুত ছিল বলেই সে বারবার ধাঁধা বাক্সের দরজা খোলার চেষ্টা করে যায় এবং এক সময় সফল হয়। বিড়ালটি যদি রোগাক্রান্ত বা দুর্বল হতো বা খাবারের জন্য সে ক্ষুধার্ত না হতো তাহলে সে চেষ্টা চালাতো না এবং সফলও হতো না। এ থেকে বোঝা যায়, কোনো কাজের প্রতি প্রাণীর আগ্রহ সৃষ্টি না হলে প্রাণীকে দিয়ে জোর করে কাজ করাতে গেলে তার মধ্যে এক ধরনের বিরক্তির সৃষ্টি হয়। পরিণামে প্রাণী তার কাজে সফল হয় না। সুতরাং শিক্ষার্থীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই তার পক্ষে শিখন সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। অন্য কথায়, এই প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর শিখনে বিরক্তির সৃষ্টি হয় এবং শিখন অবদমিত হয়।

২. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

কোনো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বারবার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার বন্ধন (শিখন) দৃঢ়তর হয়। আর যদি কোনো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোনো সংযোগ না হয় তাহলে শিখন শিথিল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো বিষয় দীর্ঘকাল না পড়ে তাহলে সে বিষয়টি তার আয়ত্তে থাকে না। কারণ থর্নডাইকের পরীক্ষা অনুযায়ী শিখন বারবার অনুশীলনের উপর কার্যকরভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সংযোগটি যদি বারবার সংঘটিত হয় তাহলে ওই সংযোগ এক সময় দৃঢ়তা লাভ করে। অপরদিকে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি সংযোগ সাধনে কোনো বিরতি ঘটে অর্থাৎ দীর্ঘদিন এই সংযোগ না ঘটে তাহলে তা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায়। শিখনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। অর্থাৎ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘন ঘন সংযোগ অর্থাৎ 'অনুশীলন' উভয়ের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। সেজন্য শিখনের ক্ষেত্রে শিখনীয় বিষয়বস্তু বারবার অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী রূপ লাভ করে।

৩. ফললাভের সূত্র (Law of Effect)

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগটি প্রাণীর কাছে যদি তৃপ্তিকর হয় তাহলে তার ফলটি (শিখন) দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। আর সংযোগটি যদি দৃঢ় না হয় তাহলে তা শিথিল ও বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ যে কাজ করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায় প্রাণী সেই কাজে বারবার প্রচেষ্টা চালায়। তাই মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি বারবার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে শিখে। প্রাণী কোনো কাজ করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু প্রথমে ভুল করে, আবার চেষ্টা করে, আবার ভুল করে, এভাবে ভুলের পরিমাণ কমে আসে এবং এক সময় সফল হয়। অর্থাৎ কাজ করায় পুনরাবৃত্তি যত বেশি হয় ভুলের সংখ্যাও তত কমে আসে এবং সময়ও কম লাগে। অপরদিকে শিখনের সাথে প্রকৃত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স বেশি সম্পর্কযুক্ত। শিখনকে স্থায়ী করতে হলে শিক্ষক এমনভাবে পাঠদান করবেন, যা শিক্ষার্থীদের কাছে আরামদায়ক হয়। বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের বারবার অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি মুখ্য সূত্রের সাথে ই.এল. থর্নডাইক আরও পাঁচটি গৌণ সূত্রের অবতারণা করেছেন যা মানুষের শিখনের সাথে সম্পর্কিত। সূত্র পাঁচটি হচ্ছে–

১. একই উদ্দীপকের প্রতি বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response to the same External Stimulus)
২. মনোভাব, পদ্ধতি বা প্রবণতার সূত্র (Law of Attitude, Set or Disposition)
৩. আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Activity)
৪. উপমানের সূত্র (Law of Assimilation of Analogy)
৫. অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting)

নিম্নে পাঁচটি গৌণ সূত্রের বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১. একই উদ্দীপকের প্রতি বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র

মানুষ বা অন্য যে কোনো প্রাণী যখন কোনো নতুন পরিস্থিতি বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তার সমাধান করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ সঠিক প্রতিক্রিয়াটি করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার যত রকম অর্জিত আচরণধারা আছে তার দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে চায়। এই যে একই উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া করার রীতি, থর্নডাইক একে বলেছেন বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা।

শিক্ষাক্ষেত্রে এর উপযোগিতা হলো, শিক্ষার্থীদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান করার সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং যথাযথভাবে তা শুধরে নিতে পারে। তা ছাড়া ভুল করলেও সেই ভুল শিক্ষার্থীদের নতুন আচরণ সম্পাদনে বা শিক্ষার পথে আগ্রহান্বিত করবে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, ভুল অভিজ্ঞতারও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে।

২. দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক অবস্থার সূত্র

প্রাণীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে। প্রাণীকে যে জিনিসটি শেখানো হচ্ছে, সেটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর হবে তা নির্ভর করে তার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার ওপর। শিখন সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থীদের উপযোগী মানসিক অবস্থা আছে কিনা। শিক্ষক যদি শ্রেণিতে আনন্দদায়ক ও সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৩. আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র

প্রাণী সামগ্রিক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া করে না, প্রতিক্রিয়া করে অংশ বিশেষের উপর এবং তা করে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে। এই সূত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ বোধগম্য করার জন্য পাঠ্য বিষয়ের সামগ্রিক অংশ একবারে উপস্থাপন না করে অংশ বিশেষ উপস্থাপন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি কবিতা বা গল্পের পুরোটা প্রথমে আলোচনা না করে একেকটা অনুচ্ছেদ করে আলোচনা করতে হবে। স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এই কৌশলটি খুবই কার্যকর।

৪. সাদৃশ্যকরণ বা উপমানের সূত্র

পূর্বপরিচিত শিখন পরিস্থিতির অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী সাধারণত পূর্বের কাজকেই অনুসরণ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হলো, শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য নতুন পাঠ্য বিষয় বা সমস্যার সাথে আগে শেখা কোনো পাঠের মিল থাকলে তা তুলে ধরতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানা জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

৫. অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপকের সাথে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত কোনো প্রতিক্রিয়াকে অন্য উদ্দীপকের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রতিক্রিয়াকে অনুবর্তন বলা যেতে পারে। শিশুরা বিদ্যালয়ে যেসব অভ্যাস, অনুরাগ অর্জন করে, পরবর্তীকালে তা তারা বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে এটাই হলো এই সূত্রের মূল কথা।

সুতরাং শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কতকগুলো অভ্যাস ও মানসিক সংগঠন তৈরি করা যা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

থর্নডাইকের শিখন তত্ত্বের সমালোচনা

থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং শিখনের সূত্রগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। তথাপি অনেক মনোবিজ্ঞানী এগুলোর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। যেমন–

১. থর্নডাইকের শিখন মতবাদের মূলভিত্তি হলো, শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলোর মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নডাইক যাকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেছেন, শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হলো, দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। সাধারণত দুটি নিউরনের সন্ধিস্থলে (Synapse) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বারবার একই কাজ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং দুটি নিউরনের মধ্যে একটি স্থায়ী স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তার ফলেই শিখন সংগঠিত হয়। শিখনের এই শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা ল্যাশ্‌লে (Lashley), ফ্রানজ (Fronz), ক্যামেরন (Cameron) প্রভৃতি বিখ্যাত গবেষকগণ মানতে রাজি নন। তারা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

২. থর্নডাইকের অনুশীলন সূত্রানুযায়ী কোনো কিছু বারবার অভ্যাস বা চর্চা করলে শিখন স্থায়ী হয়, এ কথাটি আংশিক সত্য। কারণ শুধু অভ্যাস বা চর্চা করলেই শিখন স্থায়ী হতে পারে না। তার সাথে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোও থাকা দরকার। আবার অনুশীলন বা অভ্যাস ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা আমাদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। যেমন– আনন্দ, শোক বা উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা। আমরা যখন অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন অনুশীলনের তেমন প্রয়োজন হয় না।

৩. ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এর কারণ এ সূত্রে শিখন প্রতিক্রিয়ার পেছনে মানসিক অনুভূতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজি নন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী ফললাভের সূত্রের বিরোধিতা করেন অপর একটি

কারণে। তাঁদের মতে, সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোনো আচরণের শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সেই অনুভূতিটি নিশ্চয়ই ওই আচরণটি সম্পাদনের আগে ঘটবে। কেননা যে কোনো কারণ সর্বদাই কার্যের আগেই ঘটে থাকে। অথচ থর্নডাইকের সূত্রে শিখনরূপ আচরণটি ঘটছে আগে, তারপর ঘটছে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি। সুতরাং এখানে সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা যায় না।

৪. থর্নডাইকের সূত্রগুলো কেবল ত্রুটিপূর্ণই নয়, সেগুলোতে শিখন প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন– উদ্দেশ্য, আগ্রহ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৫. গেস্টাল্টবাদীরা থর্নডাইকের সংযোজনতত্ত্ব এবং প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখন তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলোর প্রতি ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে একেকটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দেয় না। শিখনের সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি ব্যক্তি সমগ্র প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সাড়া দেয়। এই সাড়া দেওয়ার সময় ব্যক্তি ওই পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করে এবং এদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে সুসংগঠিত করে নেয়। তাঁদের মতে, সমস্যাটির অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলোর সংগঠনের মাধ্যমেই শিখন ঘটে থাকে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (প্যাভলভ)

রাশিয়ান শরীরতত্ত্ববিদ **আইভ্যান পেট্রোভিচ প্যাভলভ** (Ivan Petrovich Pavlov) রাশিয়ার রায়াজনায় (Ryazna, Russia) ১৮৪৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে (Saint Petersburg, Russia) মৃত্যুবরণ করেন। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Classical Conditioning) উপর গবেষণাকর্মের জন্য তিনি ব্যাপক খ্যাতি পেয়েছেন। প্যাভলভের পরীক্ষণের মূল কথা হচ্ছে, নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব।

প্যাভলভের পরীক্ষণের বর্ণনা

প্যাভলভ সাপেক্ষীকরণ নিয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বলেই এই মতবাদকে 'চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ' বলা হয়। তার মতবাদ অনুসারে আসল উদ্দীপকের সাথে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক বারবার উপস্থাপিত হলে যে প্রতিক্রিয়া হয় পরবর্তীকালে শুধু কৃত্রিম উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াকে সাপেক্ষীকরণ বলে। প্যাভলভ একটি কুকুরকে নিয়ে এই পরীক্ষাটি চালিয়েছেন। তিনি প্রথমে কুকুরের সামনে এক টুকরা মাংস রাখলেন এবং দেখলেন যে মাংসটি দেখে কুকুরের মুখ থেকে লালা নির্গত হচ্ছে। এরপর শুধু ঘণ্টাধ্বনি করলেন তাতে লালা নির্গত হলো না। তারপর তিনি ঘণ্টাধ্বনি দেওয়ার পরপরই মাংসখপিণ্ড কুকুরের সামনে রাখলেন। তিনি দেখলেন যে, এবারে লালা নির্গত হচ্ছে। এ ব্যাপারটি তিনি বার কয়েক করলেন। তারপর শুধু ঘণ্টাধ্বনি করলেন। দেখলেন তাতেও লালা নির্গত হচ্ছে; শুধু ঘণ্টা ধ্বনিতে আগে লালা আসেনি। কিন্তু মাংসপিণ্ডের সঙ্গে একে জুড়ে দেওয়ার ফলে পরবর্তীকালে শুধু ঘণ্টা ধ্বনিতে লালা নির্গত হচ্ছে। ঘণ্টা ধ্বনির প্রতি লালা নিঃসরণকে প্যাভলভ নাম দিলেন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এখানে মাংসপিণ্ড হচ্ছে আসল উদ্দীপক আর ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে কৃত্রিম উদ্দীপক।

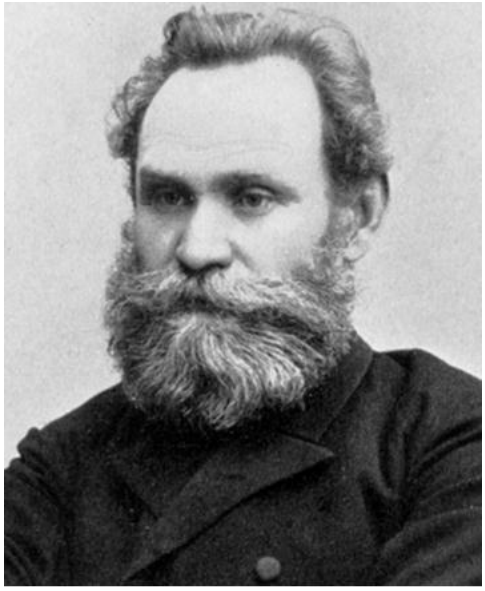

Ivan Petrovich Pavlov

নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। এই শিখনকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়। প্যাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Classical Conditioning) অনুসরণ করে ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শব্দ, ভাষা ইত্যাদি শেখানো যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদের গুরুত্ব

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে শিশুরা মায়ের কোলে লুকায়, বেত হাতে শিক্ষককে দেখলে দুষ্টু ছেলে-মেয়েরা ভয়ে পালায়, বিজলী চমকাতে দেখলে পথিক দুই কানের দুই পাশে হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখে। মানব জীবনের এমনি আরও অনেক প্রতিক্রিয়াই আসলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন, যেহেতু সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দিয়ে কোনো উদ্দীপকের সাহায্যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়, সেহেতু এই তত্ত্ব দিয়ে মানুষের শিখন প্রতিক্রিয়াও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিম্নরূপ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়–

১. ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে

শিশুর ভাষা শিক্ষায় সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ভাষা শিখনের শুরুতে শিশু কতকগুলো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে। সে লক্ষ্য করে যে অর্থহীন শব্দ করলে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। ক্রমশ সে উপলব্ধি করে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার প্রতি সাড়া দেয় বা সে যে জিনিসটা চাচ্ছে সেটা তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে অনুবর্তিত হয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীকালে সে ওই ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বোঝাতে গেলে ঐ শব্দটি ব্যবহার করে।

২. অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে

বিভিন্ন ধরনের সুঅভ্যাস গঠনে যেমন– সকালে ঘুম থেকে ওঠা, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, গুরুজনকে ভক্তি করা প্রভৃতি অনুবর্তিত ক্রিয়ার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভালো অভ্যাস গঠনের ন্যায় বদ অভ্যাস বর্জনেও অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা রয়েছে। ভালো কাজের জন্য যেমন শিশুকে প্রশংসা করা হয়, পুরস্কৃত করা হয়, কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয় একইভাবে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক কাজের জন্য তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে অনুবর্তনের প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশুর সুঅভ্যাস গঠিত হবে ও বদ অভ্যাস বর্জিত হবে।

৩. প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে

অনুবর্তিত ক্রিয়ার ফলেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রক্ষোভ যেমন– আনন্দ, ভয়, অনুরাগ, দুঃখ, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। স্কুলের পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে অংক, ইংরেজি এই দুটি বিষয়কে শিক্ষার্থীরা ভয় পায় ও ফাঁকি দিতে চায়। ফলে এই দুটি বিষয়েই তারা অকৃতকার্য হয়। অনেক সময় অংক ও ইংরেজি শিক্ষকের কঠোর শাস্তি শিক্ষার্থীদের মনে ভীতির সৃষ্টি করে। এই ভীতি থেকে শিক্ষকদের প্রতি বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। এক সময় সেই ভীতি ও বিতৃষ্ণা শিক্ষক যে বিষয়গুলো পড়ান সেই বিষয়গুলোতে অনুবর্তিত হয়ে থাকে।

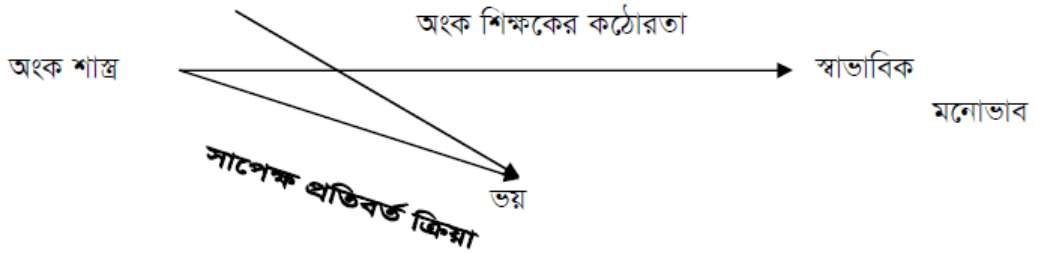

চিত্র : সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া নির্ভর করে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপর। সুতরাং শিখন পদ্ধতির ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে উদ্ভূত প্রতিকূল প্রক্ষোভ যাতে শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রভৃতির উপর প্রতিবর্তিত হয়ে না যায় সেদিকে পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং অভিভাবকের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. মনোভাব গঠনের ক্ষেত্রে

অনেক সময় সমাজের এমন সব ঘটনা বা বিষয় মানুষের সামনে আসে যার সম্পর্কে তাদের মনোভাব গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মানুষের মনোভাব গঠনের জন্য মানুষ নানামুখী চেষ্টাও করে থাকে। অথচ বিভিন্ন বিষয় বা সামাজিক ঘটনার প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব (Attitude) গঠনের জন্য শিক্ষক অনুবর্তনের সাহায্য নিতে পারেন।

৫. পুনরাবৃত্তিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে

বিদ্যালয়ে শিশুদের বানান, নামতা ইত্যাদির মতো যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক এই কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।

প্যাভলভের মতবাদের সমালোচনা

প্যাভলভের তত্ত্বের যথেষ্ট শিক্ষামূলক গুরুত্ব থাকলেও অনেক মনোবিজ্ঞানী একে স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। তাঁরা মনে করেন, অনুবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর শিখন এবং মানুষের ক্ষেত্রে কেবল কিছু যান্ত্রিক অভ্যাস (Mechanical habit) আয়ত্তকরণের প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের সম্পূর্ণ শিখন প্রতিক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়। প্যাভলভের মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অনুবর্তন হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কিছু আমরা শিখি যার জন্য পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন হয় না। একবার মাত্র দেখে সেটা আমরা শিখতে পারি। আবার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, তা চর্চা ছাড়াই বহুদিন মনে রাখা যায় এবং বহুদিন পর তার প্রয়োগও করা যায়; এর জন্য মাঝে মাঝে বলবৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মানুষের শিখন ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাখ্যা আমরা প্যাভলভের তত্ত্বের মধ্যে পাই না। তা ছাড়া মানুষের প্রত্যেক আচরণই উদ্দেশ্যমুখী। যেমন– অংক শিক্ষকের কঠোরতা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিখন হতে পারে না। ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষার উপরও তা নির্ভর করে। কিন্তু এই মতবাদে আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো স্থান নেই। তাই এটুকু বলা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক শিখন যেমন– লেখা, কথা বলা, টাইপ করা ইত্যাদি এই ধরনের অনুবর্তনের দ্বারা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মানুষের শিখনের আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে এবং সেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের দেহমন সামগ্রিক সত্তায় কাজ করে।

২.২ : করণ শিখন (স্কিনার) এবং মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা

করণ শিখন (স্কিনার)

আমেরিকার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী **বি.এফ. স্কিনার** (Burrhus Frederic Skinner) ১৯০৪ সালের ২০ মার্চ আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় (Pennsylvania, United States) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯০ সালের ১৮ আগস্ট ম্যাসাচুসেটসের ক্যামব্রিজে (Cambridge, Massachusetts) মৃত্যুবরণ করেন। বহু গবেষণা করে তিনি ১৯৮৩ সনে শিখন সংক্রান্ত তার নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। শিখন সম্পর্কে তিনি যে মতবাদ বা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে 'Instrumental learning theory' বা 'করণ শিখন মতবাদ' হিসেবে পরিচিত। শিখন তত্ত্বের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। তিনি এই মতবাদের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, প্রাণী তার প্রেষণা নিবৃত্ত করার জন্য বিভিন্ন রকমের আচরণ করে থাকে, এগুলোকে আমরা করণ শিখনরূপে ধরে নিতে পারি। তাঁর মতে, প্রাণী ওইসব আচরণ করে বা শিখে যে আচরণের মাধ্যমে তার প্রয়োজন মিটে থাকে। যেমন– শিশু ক্ষুধার্ত হলে কাঁদে, আর তখন তাকে খাবার দেওয়া হয়। কাজেই শিশুটি একসময় খাবার পাওয়ার অস্ত্র হিসেবে কান্নাকে ব্যবহার করে থাকে। এখানে স্কিনার এই কান্নাকে খাবার পাওয়ার 'অস্ত্র' বা 'Instrument' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সে জন্য স্কিনারের এই মতবাদকে 'Instrumental learning theory' বলা হয়। শিক্ষা সম্পর্কে তার একটি স্মরণীয় উক্তি, æEducation is what survives when what has been learned has been forgotten."

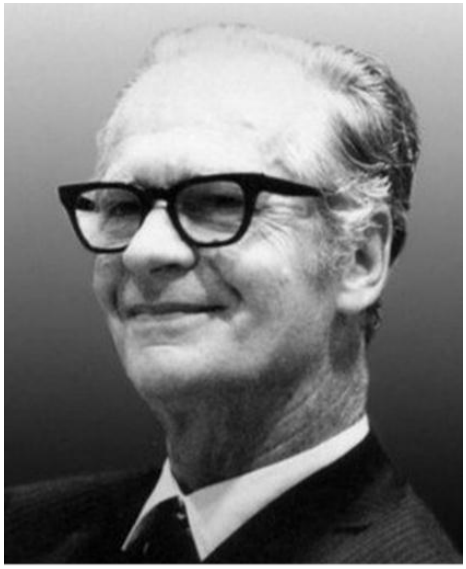

Burrhus Frederic Skinner

স্কিনারের মতে, যখন কোনো প্রতিক্রিয়া বা আচরণ অনুকূল ফলাফল সৃষ্টি করে (বলবর্ধক প্রতিক্রিয়া বা re-inforcing Stimulus) তখন সেটি শক্তিশালী হয় এবং পুনরায় সেই প্রতিক্রিয়া বা আচরণ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অতএব, যেসব আচরণ বা প্রতিক্রিয়া মানুষ কিংবা প্রাণীর জীবনে কোনো প্রেষণা নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে, সেসব আচরণ শেখাকেই করণ শিখন বলে। একে করণ সাপেক্ষীকরণ শিখনও বলা হয়। কারণ প্রাণীর সেই আচরণটি করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যেটি তার অভীষ্ট লাভ বা সন্তুষ্টিলাভে সহায়তা করে। এ ধরনের শিখনকেই করণ শিখন বলা হয়। আর বলবর্ধক হলো, একটি উদ্দীপক যা আচরণের শক্তি বৃদ্ধি করে।

কোনো কাজকে পুরস্কৃত করলে সে কাজটা পুনরায় করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটাই হলো করণ শিখনের মূল কথা। এখানে পুরস্কার বলতে বোঝানো হয়েছে অভীষ্টলাভ বা সন্তুষ্টি অর্জন। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, কোনো প্রচেষ্টা বা কাজের মাধ্যমে সন্তুষ্টি সিদ্ধ হলে ব্যক্তি অন্য সব নিষ্ফল প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে পুনরায় ওই প্রচেষ্টা বা কাজটি করতে সচেষ্ট হবে।
বি.এফ. স্কিনার তাঁর মতবাদটি একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যা স্কিনার পরীক্ষণ নামে পরিচিত। নিচে পরীক্ষণটির বর্ণনা দেওয়া হলো–

স্কিনারের পরীক্ষণের বর্ণনা

করণ শিখন নিয়ে গবেষণা করার জন্য স্কিনার একটি পাজল্ বক্স (Puzzle Box) ব্যবহার করেন। এই পাজল বক্সটিকে স্কিনার বক্স (Skinner Box) বলা হয়। এ বক্সের ভেতরে একপাশে একটি চাবি আছে যার মধ্যে সামান্য চাপ লাগলেই বক্সটির ভেতরে যান্ত্রিক উপায়ে নির্দিষ্ট পথে খাবার চলে আসবে। স্কিনার এই বক্সে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুর রাখলেন। ইঁদুরটি বক্স থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নানা রকম প্রতিক্রিয়া করতে লাগল। তার ছুটাছুটির এক পর্যায়ে হঠাৎ চাবিতে চাপ লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবার চলে এলো। ইঁদুরটা প্রথমে খেয়ালই করেনি যে চাবির নির্দিষ্ট জায়গায় চাপ দেওয়াতে খাবার এসেছে। ইঁদুরটি খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর ইঁদুর খাবারের আশায় আবার ছুটাছুটি করতে লাগল। একইভাবে দ্বিতীয়বার হঠাৎ করে চাবিতে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবার আসল। তারপর ইঁদুর আবার খাবার খাওয়ার জন্য ছুটাছুটি করতে লাগল। তৃতীয়বারেও দৈবাৎ চাবিতে চাপ পড়ল। এবারও খাবার আসল ও ইঁদুরটা তা খেল। চতুর্থবার চাবিতে সরাসরি চাপ দিল এবং খাবার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁদুরটা তা খেতে লাগল। এরপর ইঁদুর খুব ঘন ঘন চাবিতে চাপ দিয়ে খাবার খেতে থাকল। অর্থাৎ ইঁদুরটা শিখল যে চাবিতে চাপ দিলেই খাবার পাওয়া যায়। এ থেকে দেখা যায়, ইঁদুরটি চাবিতে চাপ দেওয়াকে খাবার পাওয়ার উপায় হিসেবে নিল। এর মাধ্যমে ইঁদুরটি প্রেষণা নিবৃত্ত করার উপায় শিখে নিল যা তার জন্য তৃপ্তিদায়ক হয়ে দাঁড়াল। স্কিনারের পরীক্ষণটি নিচে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–

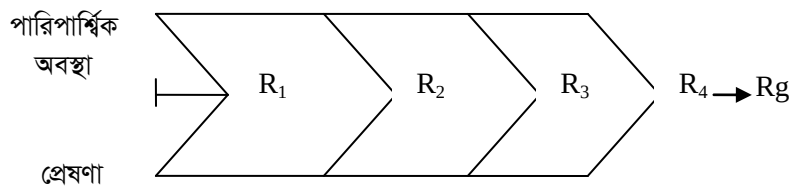

চিত্র: ইঁদুরের সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেষণার নিবৃত্তি

বর্ণিত চিত্রটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, ক্ষুধার্ত ইঁদুরটি খাদ্যলাভের আশায় (এখানে প্রেষণা হচ্ছে খাদ্য) নানা রকম প্রতিক্রিয়া করে, যেমন– R_1, R_2, R_3। অবশেষে ৪ নং প্রতিক্রিয়া (R_4) তার প্রেষণার নিবৃত্ত করে অর্থাৎ সে খাদ্য পায়। এরপর সে সবশেষে সাফল্যজনক প্রতিক্রিয়ার (Rg) (এখানে চাবিতে চাপ দেওয়া) পুনরাবৃত্তি করে এবং অন্যান্য নিষ্ফল প্রতিক্রিয়াগুলো ত্যাগ করে। স্কিনারের মতে, অনুবর্তন হয়ে থাকে উদ্দীপক ও বিশেষভাবে আচরণ করার প্রবণতার মধ্যে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নয়। প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফলের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে স্কিনার তাকে Contingencies of Re-inforcement বলেছেন। কোনো আচরণ শিখনের জন্য দরকার সেই আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার ফলের প্রকৃতি জানা অর্থাৎ কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই হবে, যখন তা সম্পন্ন করার সাথে সাথে ব্যক্তি পুরস্কৃত হয়।

করণ শিখনের শর্তাবলি

স্কিনারের পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি বর্তমান থাকতে হবে–

- ইঁদুরটি ক্ষুধার্ত হতে হবে।
- নির্ভুল প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- প্রেষণা সৃষ্টির কারণ প্রাসঙ্গিক হতে হবে।
- নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি প্রাণীর ক্ষমতার মধ্যে হতে হবে।
- প্রেষণার জন্য তাগিদ থাকতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের মতবাদের গুরুত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রাণী ও মানুষের উপর অসংখ্য পরীক্ষা করার পর তিনি শিখন সম্পর্কে পরীক্ষণীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেগুলো হচ্ছে–

- শিখন পদ্ধতির প্রত্যেকটি স্তর হবে সংক্ষিপ্ত।
- আগে শেখা আচরণের ভিত্তিতে শিক্ষা দিতে হবে।
- শিখনের প্রথম দিকে প্রায়ই পুরস্কার দিতে হবে।
- পরবর্তীকালে সেটা কমিয়ে আনতে হবে এবং অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পুরস্কার দিতে হবে যাতে তা বিপরীত ফল সৃষ্টি করতে না পারে।
- সঠিক আচরণের পরপরই পুরস্কার দিতে হবে।
- বিলম্বিত পুরস্কার গ্রহণযোগ্য হয় না।
- শ্রেণিকক্ষে প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করবেন।
- শিক্ষক সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণের মূল্যায়ন করবেন।
- প্রয়োজনে নতুন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন, যা হবে কাঙ্ক্ষিত।

বি.এফ. স্কিনারের পরীক্ষণকৃত এ মতবাদটির তত্ত্বকথা প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আচরণিক ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন– মিথ্যা বলা, চুরি করা এবং অন্যান্য অনভিপ্রেত আচরণের সংস্কার ও সংশোধন করা যায়। কাজেই এ তত্ত্বটি শিক্ষাক্ষেত্রে সচেতনভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্কিনারের মতবাদের সমালোচনা

বি.এফ. স্কিনারের করণ শিখন মতবাদের ব্যাপক ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ এটিকে শিখনের ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন না। কারণ তাঁদের মতে, এ তত্ত্বের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক ত্রুটির দরুন এর দ্বারা মানুষের সব রকমের শিখন ব্যাখ্যা করা যায় না। মনোবিদ নোয়াম চোমস্কি (Noam Chomsky) স্কিনারের তত্ত্বের ত্রুটিগুলোকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে চিহ্নিত করেছেন। যেমন–

১. স্কিনার তার প্রাণীর আচরণকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশের উপর প্রভবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, যা ঠিক নয়। কারণ পরিবেশের বিভিন্নতায় প্রাণী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন আচরণ করতে পারে। যা কেবল একটি পরীক্ষা তত্ত্বে আবদ্ধ করে শিখনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

২. স্কিনার তাঁর শিখন সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রাণীর নিজস্ব মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। বিশেষ করে মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে নতুন প্রতিক্রিয়া করে থাকে তার মূলে তার নিজস্ব চাহিদা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ইত্যাদি রয়েছে। তার গুরুত্ব না দেওয়ায় স্কিনারের মতবাদটি যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে।

৩. স্কিনারের মতবাদ দ্বারা শিশুর ভাষা শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে, স্কিনার তা স্বীকার করেননি।

৪. স্কিনারের তত্ত্বে কোথাও শক্তিদায়ক উদ্দীপক সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ফলে এ তত্ত্ব দ্বারা শিখনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না।

মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনের আচরণবাদী তত্ত্বসমূহের ভূমিকা

থর্নডাইকের তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে, বারবার ভুল করে মানুষ শিখে। ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। কোনো কিছু শেখার জন্য প্রয়োজন দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকলে শিখন ত্বরান্বিত হয়। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয়।

প্যাভলভের পরীক্ষণের মূল কথা হচ্ছে, নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব।

বি.এফ. স্কিনারের করণ শিখন মতবাদের মূল কথাই হচ্ছে, কোনো আচরণের মাধ্যমে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তিলাভ। কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় অর্থাৎ ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করে বা সন্তুষ্ট হয়।

থর্নডাইক, প্যাভলভ ও স্কিনার এই তিনজনই আচরণবাদী ছিলেন। তাদের তিনজনের তিনটি মতবাদেই আচরণের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। তবে এই আচরণের পরিবর্তন কীভাবে হবে তা তিনটি মতবাদে তিনভাবে বলা হয়েছে। যেমন– থর্নডাইক এর মতবাদে যে কোনো শিখনে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্যাভলভ শিখনে সাপেক্ষীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং স্কিনারের মতবাদে আচরণের পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সন্তুষ্টি লাভের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

থর্নডাইক, প্যাভলভ ও স্কিনারের শিখন মতবাদের শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ কৌশল

ই.এল. থর্নডাইক যে শিখন মতবাদ দিয়েছেন সে অনুযায়ী শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত করতে হবে। এ কারণে পাঠ-পরিকল্পনায় প্রস্তুতিপর্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়। এ জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বারবার অনুশীলন করাতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু ভুল (যেমন বানান ভুল) করলে তা অনুশীলন করে ওই ভুলসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ শিখন হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় আংশিকভাবে শুদ্ধ হলেও প্রশংসা করতে হবে এবং সংশোধনের জন্য তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে।

প্যাভলভ প্রদত্ত শিখন মতবাদ অনুযায়ী শিখনের ক্ষেত্রে শিখন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সাথে সাথে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ কোনো কিছু মুখে বলার সাথে সাথে শিক্ষক যদি একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করেন অর্থাৎ বলার সাথে সাথে বোর্ডে লিখেন, প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু প্রজেক্ট করে শিক্ষা দেন তবে তা ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অভ্যাস পরিবর্তনে সাপেক্ষীকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বি.এফ. স্কিনার শিখন তত্ত্ব দিতে গিয়ে যে মতবাদ দিয়েছেন সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কোনো সাফল্যের জন্য তাদের উপহার বা টোকেন গিফ্‌ট প্রদান করা যেতে পারে। উপহার বা টোকেন গিফ্‌ট প্রদান করা সম্ভব না হলে ন্যূনতম প্রশংসামূলক বাক্য ব্যবহার করে বলবৃদ্ধি (Re-inforcement) করতে হবে এবং এর পরও ব্যর্থ হলে তাকে পুনরায় সফল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

আচরণবাদ কীভাবে মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানোয় অবদান রাখতে পারে তার ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো–

১. উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এর ফলে শিখন হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণের একটি বাস্তবভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংব্যাখ্যানের উপযোগিতা যথেষ্ট। শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখাতে হলে উদ্দীপকটিকে যে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত করা দরকার এই সত্যটি এ তত্ত্বের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. আচরণবাদের প্রয়োগ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে খুব বেশি কার্যকর। শিশুর ভাষা শিক্ষা, অভ্যাস গঠন, নতুন নতুন আচরণ শেখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং তত্ত্বগুলো খুবই কার্যকর। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোজন এবং পুনর্স্থাপনের নীতি শিশুর আচরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে থাকে।

৩. শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণের প্রভাব প্রচুর। শিশু তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর নাম সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই শেখে।

৪. শিশুর বহু মৌলিক আচরণ সাপেক্ষীকরণের ফল। যে সকল আচরণ বা অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে, যেমন– সকালে ঘুম থেকে উঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা বা শুতে যাওয়া ইত্যাদি সবই সাপেক্ষীকরণের ফল হিসেবে হয়ে থাকে। তা ছাড়া সামাজিক আদব-কায়দা শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচরণগুলো ও সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা শিখে থাকে।

৫. শিখনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর হলে সে শিখন স্থায়িত্বলাভ করে। আর শিখনের ফল বিরক্তিকর হলে সেটা স্থায়ী হয় না। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর শিখনকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষককে এ ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে যেন তার ফললাভের জন্য শিক্ষার্থীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে না হয়।

স্কিনারের করণ শিখন মতবাদ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ফল প্রাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীর সাফল্যের স্বীকৃতি দিলে সে শিখনে উৎসাহ পায় এবং শিখন সফল ও কার্যকর হয়।

২.৩ : জ্যাঁ পিঁয়াজে-এর শিখন তত্ত্ব

সুইজারল্যান্ডের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা দার্শনিক জ্যাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) জীববিজ্ঞানের একজন গবেষক। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিয়াঁজে ১৮৯৬ সালের ৯ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের নিউচ্যাটেলে (Neuchâtel, Switzerland) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জেনেভায় (Geneva) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে জ্ঞান বিকাশের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, পরিপক্কতার সাথে শিশুর প্রত্যক্ষণ ও শিখনের কী সম্পর্ক রয়েছে। কীভাবে শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশ ঘটে, তার মধ্যে কখন যুক্তির বিকাশ হয় এবং কখন সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা জন্মে এসব দিক নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি যে তত্ত্ব দিয়েছেন সেটাই জ্ঞান বিকাশ তত্ত্ব (Cognitive Development theory) হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে।

Jean Piaget

শিখনের ক্ষেত্রে জ্যাঁ পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাঁর তত্ত্বে জ্ঞান বিকাশ বলতে তিনি প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, জানা, মনে রাখা, চিনতে পারা, বিমূর্তকরণ, সামান্যীকরণ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। পিয়াঁজের দার্শনিক মতবাদের মূল কথা হলো, জ্ঞান মানুষের আবিষ্কৃত। জ্ঞান মানুষের জন্মগত সংগঠনের মধ্যে থাকে না বা আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে থাকে না। এটাই হলো তার জ্ঞানমূলক বিকাশ তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি।

মানব সমাজের প্রতিটি সদস্য অর্থাৎ প্রতিটি মানবশিশু জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নতুন নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এর মধ্য দিয়েই তার জ্ঞান বিকাশ ঘটে। জ্যাঁ পিয়াঁজে জ্ঞান বিকাশকে দেখেছেন পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে চলা বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটি বিশেষ যোগ্যতা বা দক্ষতা হিসেবে। মানবশিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে পিয়াঁজে তা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, জীবনের শুরুতে শিশু নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া করে। এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, আঙুল চোষা, কান্না করা, এলোপাথাড়ি হাত-পা নাড়ানো ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়াকে তিনি Reflex action (প্রতিবর্ত ক্রিয়া) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর শিশুটি ধীরে ধীরে আরও কিছু অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া করে বা সাড়া দেয়। যেমন– শিশুটি তার মাকে দেখলে হাসে, তার খিদে পেলে কাঁদে। এমনকি অপরিচিত লোক দেখলে বা অপরিচিত কোনো মানুষের শব্দ শুনলেও কাঁদে বা ভয় পায়। এসব প্রতিক্রিয়াকে তিনি প্রতিবর্ত ক্রিয়া না বলে 'উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়া' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পিয়াঁজের মতে, এসব প্রতিক্রিয়া শিশু অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। আবার তিনি লক্ষ্য করেছেন, ছয় মাসের শিশু দুধের জন্য হাত বাড়ায়, প্রয়োজনে সে হামাগুড়ি দিয়ে দুধের কাছে আসতে চেষ্টা করে। এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায় শিশুটি দুধ খুঁজছে। এভাবে যখনই শিশু দুধ খুঁজে তখনই সে এ কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এভাবে শিশুর আচরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। পিয়াঁজের মতে, শিশুর আচরণের পরিবর্তনের একটি প্যাটার্ন আছে যাকে তিনি স্কিমা (Schema) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, শিশুর পৃথক পৃথক আচরণের জন্য পৃথক পৃথক স্কিমা গঠিত হয়। এর সাহায্যে শিশু অর্জিত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত (processing) করে এবং নির্বাচন (selection) ও সংরক্ষণ (conservation) করে। পিয়াঁজে এই স্কিমার সমষ্টিকেই জ্ঞান হিসেবে বুঝিয়েছেন। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন, শিশুর মধ্যে স্কিমার সংখ্যা কম থাকে এবং শিশু ধীরে ধীরে যত বড় হতে থাকে তার মধ্যে স্কিমার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এর ফলে তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং শিশু নতুন নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

পিয়াঁজের মতে, নতুন নতুন স্কিমা গঠন এবং নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শিশুর ভেতরে দুটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। একটি হলো Assimilation (আত্মীকরণ) এবং অন্যটি হলো Accomodation (উপযোজন)। পিয়াঁজের বর্ণনা মতে, আত্মীকরণ হলো পূর্বপরিচিত পরিবেশের কোনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া করা এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় উপযোজন। শিশুর মধ্যে যে স্কিমা রয়েছে তা যদি নতুন কোনো চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তখন তাকে উপযোজন বলা হয়। এরপর শিশুটি ধীরে ধীরে এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে যার ফলে সে অভিযোজন করতে শেখে। এভাবেই শিশুর জ্ঞান বিকাশ ঘটে।

জ্যাঁ পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ

জ্যাঁ পিয়াঁজে মানুষের বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই স্তর চারটি হলো–

১. ইন্দ্রিয় পেশিজ স্তর (Sensory-motor period): ০-২ বছর বয়স
২. প্রাক কার্যকরী স্তর (Pre-operational period): ২-৭ বছর বয়স
৩. মূর্ত কার্যকরী স্তর (Concrete operational period): ৭-১১ বছর বয়স
৪. বিমূর্ত কার্যকরী স্তর (Formal operational period): ১১-১৫/১৬ বছর বয়স

পিয়াঁজে এই স্তরগুলো মোটামুটি শিশুর গড়-পড়তা বয়সভিত্তিক করেছেন। তবে সব শিশুর ক্ষেত্রে এটা নির্দিষ্ট সময় মেনে নাও চলতে পারে। কারও বেলায় একটু আগে বা পরে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে পারে।

১. ইন্দ্রিয় পেশিজ স্তর (Sensory-motor period)

সাধারণত এই স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহ জন্ম থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত দেখা দেয়। জন্ম মুহূর্তে শিশুর মধ্যে আত্মসচেতনতা থাকে না। পৃথিবী তার কাছে স্থানহীন, কালহীন, পাত্রহীন একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই জন্ম মুহূর্তে তার কতকগুলো সক্রিয় ইন্দ্রিয় (active sense organ) থাকে যার দ্বারা পরিবেশের সক্রিয়তায় সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

এগুলো ছাড়াও তার কতকগুলো অত্যন্ত সাধারণ ধরনের প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। যেমন– আঁকড়ে ধরা, হাত বা পা নাড়াচাড়া করা, মায়ের দুধ চুষে খাওয়া ইত্যাদি। শিশু এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করতে গিয়ে তার আচরণ ধারার পরিবর্তন হয়। যেমন– প্রথমে তার দৃষ্টি সহজাতভাবে আলোকের তীব্রতা দ্বারা বা রঙের তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে সে নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। তা ছাড়া কী কী জিনিস সে মুখে দিয়ে চুষতে পারে সেগুলো সে বুঝতে শেখে। অনেক সময় সে মুখে আঙুল দিয়ে চুষতে চুষতে মুখ ও আঙুলের কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে।

পিয়াঁজের মতে, প্রায় এক বছর বয়সে শিশু তার আয়ত্তের মধ্যে পরিবেশের সকল অংশের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে এবং সে আচরণগুলো তার মধ্যে প্রকাশ পায়। যেমন– ঘরের দরজা খোলা দেখলে বোঝে কেউ আসবে বা সে এটা দিয়ে বাইরে যাবে। মা ভালো পোশাক পরলে বা ব্যাগ নিলে সে ভাবে মা বাইরে যাবে। আস্তে আস্তে সে শব্দের (Sound) প্রতি তার সংবেদন সঞ্চালন হয়। যেমন– সে বারবার জিনিস ফেলে শব্দ তৈরি করে বা কোনো জিনিসে আঘাত দিয়ে সে শব্দ সৃষ্টি করতে চায়। আবার কোনো জিনিস খোলার সময় তার দাঁত ও মুখকে দৃঢ় করে এবং কখনও মুখ ফাঁক করে। অর্থাৎ সে নিজের হাত ও মুখের মাধ্যমে মানসিক কল্পটি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমাধান করে।

দুই বছর বয়সে শিশুর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। যেমন– তারা বস্তু দেখতে পায় কিন্তু ধীরে ধীরে বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়া বস্তুর অবর্তমানেও চালিয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে চলমান বস্তুকে অনুসরণ করতে পারে; এমনকি বস্তু আড়ালে চলে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। শিশু এ পর্যায়ে বুঝতে শিখে যে, যে বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়া করা যায় না এ রকম বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। পিয়াঁজে জীবন বিকাশের এই স্তরকে সংবেদন সঞ্চালনমূলক স্তর নামে অভিহিত করেছেন। কারণ এই সময় পর্যন্ত শিশুর চিন্তামূলক জ্ঞান তার সংবেদন সঞ্চালনমূলক ক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বস্তু সম্পর্কিত চিন্তা তার একান্তই নিজস্ব। বয়স্কদের ভাষা ও চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান শিশুরা এই সময় আয়ত্ত করতে পারে না।

২. প্রাক কার্যকরী স্তর (Pre-operational period)

এই স্তরের বয়সসীমা ২ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–
(ক) প্রাক-চিন্তা স্তর ও (খ) অনুভূতি স্তর।

(ক) **প্রাক-চিন্তা স্তর :** এ স্তরে শিশু সংবেদন ও ক্রিয়াগত প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে। যেমন– মায়ের প্রতিচ্ছবি হলো মায়ের সামগ্রিক কাজের সমষ্টি। অর্থাৎ খাওয়ানো, গোসল করানো, পোশাক পরানো ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াগুলো মানসিক প্রতিচ্ছবিই তার মায়ের প্রতিরূপ। সে খেলনা পুতুলের মুখে কোনো কিছু তুলে দিয়ে খাওয়ায়। অর্থাৎ শিশু তার নিজের খাওয়ানোর প্রতিচ্ছবি এবং খাদ্যবস্তুর প্রতিচ্ছবিকে অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে। এ সময় তার স্থান সম্পর্কিত ধারণা খুব স্পষ্ট হয় না। সে বস্তু সামগ্রিকে দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারলে পরমুহূর্তে নতুন বিন্যাসে সাজাতে পারে না।

(খ) অনুভূতি স্তর : এই স্তরের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এই সময় প্রাক-ধারণার পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই সময় শিশুর মানসিক কল্প (Mental representation) ও ক্রিয়াগুলো অনেক বেশি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হয়। তাছাড়া ওই সব মানসিক কল্প ও ক্রিয়াগুলোর মধ্যে অনেকটা সমন্বয় হয়। এই সমন্বয় প্রবণতাই শিশুকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পিয়াঁজে এই স্তরকে পরিবর্তনের স্তর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পিয়াঁজের মতে, এই সময় ভাষার মাধ্যমে সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে শিশুর মানসিক সংগঠনে ও ধারণার মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং এই সময় থেকে সে তার ভাষামূলক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক প্রভাব শিশুর বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বা বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণার বিকেন্দ্রিকরণ হতে থাকে।

শিশু যত সমাজে মিশতে থাকে ততই তার ইতঃপূর্বে গঠিত মানসিক ধারণাগুলো পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। তার ধারণা ও চিন্তন প্রক্রিয়া প্রজ্ঞা (Intuition) দ্বারা পরিচালিত হয়। পিয়াঁজের এই সময়কে প্রাক-ধারণামূলক স্তর বলেছেন। কারণ এ সময় শিশুর যে আপাত ধারণাগুলো সংগঠিত হয় তাদের প্রকৃত ধারণা বলা যায় না। কেননা প্রকৃত ধারণার মতো সেগুলো সামগ্রিক নয়। এই জাতীয় প্রাক-ধারণা শিশুকে চিন্তামূলক বাস্তব নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে না।

৩. মূর্ত কার্যকরী স্তর (Concrete operational period)

এই স্তরের বয়সসীমা ৭ বছর থেকে ১১ বছর। এই স্তরে শিশুরা কতকগুলো বস্তুকে ক্রমানুসারে সাজাতে পারে। ধরা যাক ৬ ও ৮ বছরের দুটি শিশুর প্রত্যেককে বিভিন্ন মাপের ১০টি কাঠি দেওয়া হলো। দৈর্ঘ্যগুলো যথাক্রমে ১-১০ সে.মি পর্যন্ত। ৬ বছরের শিশুটি কাঠিগুলো দৈর্ঘ্যের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে না পারলেও সে কাঠিগুলো এক লাইনে সাজাতে পারে। কিন্তু আট বছরের শিশুটি দৈর্ঘ্যের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে পেরেছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৬ বছরের শিশুর বস্তুর আকার সম্পর্কে ধারণা জন্মেনি কিন্তু ৮ বছরের শিশুটির আকার সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে। এই স্তরে শিশুর শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ, উভয়বিধ চিন্তন, আকার বা পরিমাণের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা জন্মে। এই স্তরের শিশু যদি ফুল, পাখি, পশু ইত্যাদির ছবি আলাদা করতে পারে বা বই-খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি আলাদা রাখতে পারে তাহলে বুঝতে হবে শ্রেণিকরণ শিখেছে।

দুটি সমান কাদা-মাটির গোলা তাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি গোলা দিয়ে কেঁচোর মতো লম্বা করে প্রশস্ত করা হলো। এরপর যদি প্রশ্ন করা হয়, দুটোতেই কি সমপরিমাণ মাটি আছে? যে শিশুর সংরক্ষণ ধারণা জন্মেনি সে বলবে কেঁচো আকৃতির মাটিতে বেশি পরিমাণ মাটি আছে। ৭–৮ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য।

চিত্র: বস্তুর সংরক্ষণের ধারণা পরীক্ষণ

আবার দেখা যায়, ১১-১২ বছরের শিশুদের আয়তনের ধারণা জন্মে। প্রথমে দুটি সমান আয়তন আকারের পাত্র "ক" ও "খ" মধ্যে সমপরিমাণ পানি নিয়ে তারপর "খ" পাত্রের পানি আরেকটি লম্বা ও সরু পাত্র "গ" এর মধ্যে ঢালতে হবে যাতে পানির উপরিতল পূর্বের পাত্রের পানির উপরিতল অপেক্ষা উপরে থাকে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কোনো পাত্রে বেশি পানি আছে? যার আয়তনের ধারণা হয়নি সে বলবে "গ" পাত্রে পানি বেশি আছে। যার আয়তনের ধারণা আছে সে বলবে দুটো পাত্রেই সমান পানি আছে। যদি জানতে চাওয়া হয় কেন? তাহলে সম্ভাব্য উত্তর হবে–

১. দুটি পাত্রে পানি রাখার পর কোনো পাত্রের পানি কমিয়ে ফেলা হয়নি

২. লম্বা পাত্রের পানি পুনরায় চওড়া পাত্রে রাখলে আবারও একই রকম থাকবে

৩. পাত্রটি লম্বা বলে পানির উপরিতল উপরে উঠে গেছে।

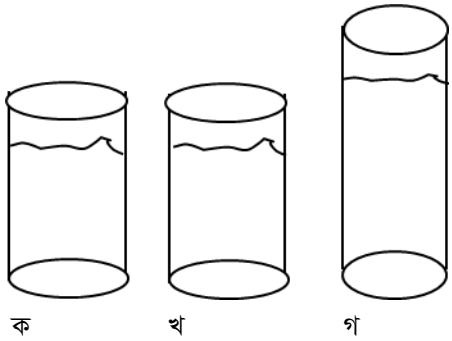

চিত্র : বস্তুর আয়তন সংরক্ষণের ধারণা

প্রথম যুক্তিটি একটি কার্যকারণ নির্দেশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রথম যুক্তিকে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ দ্বিতীয় উত্তরে উভয়বিধ চিন্তন দেখতে পাওয়া যায়। পিয়াঁজে এই ক্ষমতাকে উভয়বিধ চিন্তন বলে চিহ্নিত করেছেন।

৪. **বিমূর্ত কার্যকরী স্তর (Formal operational period)**

এই স্তরের বয়সসীমা ১১ বছর থেকে ১৫/১৬ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। শিশু এই স্তরে এসে বাল্যকালের পালা চুকিয়ে কৈশোরের সন্ধিলগ্নে উপস্থিত হয়। সে বিমূর্ত চিন্তনে সক্ষম এবং কোনো বস্তুর ধারণা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সে অনুমান করতে এবং এর ভিত্তিতে যুক্তি দাঁড় করাতে পারে। যেমন– একটি কাঠের বল, একটি পেরেক, এক টুকরো পাথর, একটি কর্ক এবং গামলাতে একটু পানি দিয়ে যদি বলা হয়, আচ্ছা বলো তো, কোনোটি পানিতে ভাসবে বা ডুববে এবং কেন? ৬ বছরের শিশু উত্তর দেবে কাঠের বল হালকা তাই পানিতে ভাসবে। আবার ৯ বছরের শিশু উত্তর দেবে, বল ও কর্ক পানিতে ভাসবে কারণ এগুলো হালকা। অন্যদিকে ১২ বছরেরর শিশু উত্তর দেবে, কাঠ ও কর্ক ডুববে না কারণ এগুলো পানির চেয়ে হালকা; পাথর ডুববে যেহেতু এটা পানির চেয়ে ভারি। পিঁয়াজে এই সময়কে প্রাক-ধারণামূলক স্তর বলেছেন। কারণ এ সময় শিশুর মধ্যে যে আপাত ধারণাগুলো সংগঠিত হয় তাদের প্রকৃত ধারণা বলা যায় না। কারণ প্রকৃত ধারণার মতো সেগুলো সামগ্রিক নয়। এই জাতীয় প্রাক-ধারণা, শিশুকে চিন্তামূলক বাস্তব ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে না। আবার ১৫ বছরের কিশোর উত্তর দেবে, কাঠ ও কর্কের একই আয়তনের পানির ওজন বেশি হওয়ায় এগুলো পানিতে ভাসবে। পেরেক ও পাথরের সমআয়তনের পানির ওজন কম হওয়ায় সেগুলো পানিতে ডুবে যাবে। উপরে বর্ণিত উত্তরগুলো তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা আসছে। এই স্তরে শিশুর চিন্তাধারা বস্তুর বাস্তব অবস্থা বা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিচালিত হয় না।

জ্যাঁ পিঁয়াজের জ্ঞান বিকাশের মতবাদকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ও শ্রেণি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রয়োগ করা গেলে শিশুর জ্ঞান বিকাশের দিকটি সহজ হবে এবং তাদের চিন্তন ক্ষমতারও বিকাশ ঘটবে।

২.৪ : ব্রুনার-এর শিখন তত্ত্ব

জেরমি সিমৌর ব্রুনার (Jerome Seymour Bruner) একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালের ১ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটিতে (New York City, New York) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৬ সালের ৫ জুন একই শহরে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশ বলতে ব্যক্তির বৌদ্ধিক সংগঠনের গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের জীবন বিকাশ পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের প্রতিস্থাপন সিস্টেম বা সাংকেতিককরণের আত্মীকরণের উপর নির্ভর করে। এখানে প্রতিস্থাপন বলতে তিনি একগুচ্ছ নীতি বা নিয়মকে বুঝিয়েছেন। যার ভিত্তিতে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করে এবং সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাগুলোকে কতকগুলো মাধ্যমের দ্বারা সংকেতায়ন করা হয় এবং স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

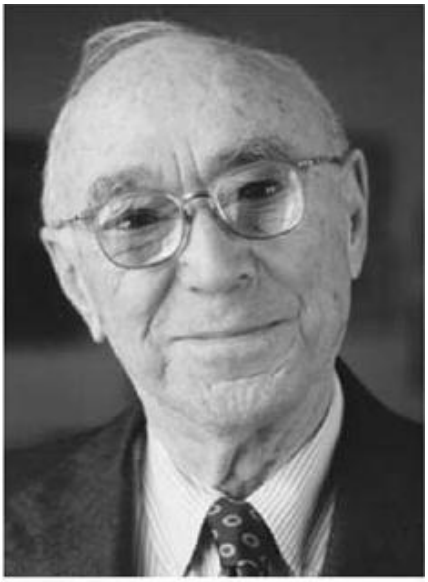

Jerome Seymour Bruner

ব্রুনারের এই মাধ্যমগুলো হলো, ক্রিয়া (Actions), কল্প বা ভাবমূর্তি (Images) এবং সংকেত (Symbols)। ব্রুনার এই ক্রিয়া বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমগুলোর নিম্নরূপ নাম দিয়েছেন–

১. সক্রিয়তাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব (Enactive Representation)।
২. আইকনিক প্রতিনিধিত্ব (Iconic Representation)।
৩. সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব (Symbolic Representation)।

সক্রিয়তাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব (Enactive Representation)

বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিশু বস্তুর প্রতি দৈহিক বা সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়া করে। শিশু টিকটিকি বা সাপ দেখার পর সেটি বোঝানোর জন্য হাতটি এঁকে-বেঁকে দোলায়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই অভিজ্ঞতাকে দৈহিক সক্রিয়তা ভিত্তিক সংকেতের মাধ্যমে স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। শিশুরা এ স্তরে কোনো কিছু প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সে তার আকার ইঙ্গিত বা ইশারাকে ব্যবহার করে। শিশুটি যে বস্তু বা ব্যক্তিকে বা কাঙ্ক্ষিত জিনিসকে বোঝাতে বা পেতে চায় তা সে বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন– ঘরের বাইরে যেতে হলে দরজার দিকে ইশারা করে বা টেনে নিয়ে যেতে চায়। শিশু গতিমান বা নড়াচড়া করে থাকে এমন জিনিস সে অনুকরণ করে শেখে এবং অনুরূপ আচরণ দিয়ে প্রকাশ করে। কোনো মৌখিক শব্দ সে উচ্চারণ

করতে পছন্দ করে না বা উচ্চারণ করে না। টিভিতে কার্টুন ছবির ভাষা নয়, নানা রকম সক্রিয় চলাচল দেখে সে অবিকল সেটা করতে চেষ্টা করে এবং সফলভাবে কিছুটা সে করতে সক্ষম হয়। এ স্তরটি জ্যাঁ পিয়াঁজের ইন্দ্রিয় পেশিজ স্তর (Period of sensory motor thinking) এর সাথে কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ।

আইকনিক প্রতিনিধিত্ব (Iconic Representation)

এখানে ব্যক্তির কল্পের মাধ্যমে সাংকেতিককরণকে বোঝায়। একজন শিল্পী যেমন তাঁর ছবিতে বিশেষ কোনো ঘটনা বা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন তেমনি বিভিন্ন কল্পের মাধ্যমে শিশু তার অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করে। শিশু তার চারপাশের জগতে দৃশ্যমান যা কিছু আছে, যা তার মনে আনন্দ দান করে বা ভীতি প্রদান করে, তা সে তার নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং সেটা একান্তই সে তার নিজস্বভাবে তৈরি কোনো প্রতীক বা মডেলের বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখায়। তবে শিশু তার দৃশ্যমান জগতের বাইরে কোনো কাল্পনিক (imaginary) চিত্র বা অবয়বের মূর্তি বা প্রতীক চিন্তা করতে পারে না। সে শুধু তার দেখা বস্তু বা পরিবেশ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেই সেটা (প্রতীক বা আইকন) ব্যবহার করে। এভাবেই ধীরে ধীরে তার মধ্যে কাল্পনিক চিত্র তৈরির ক্ষমতা জাগে। প্রতীক নির্বাচনে যে যতটা সঙ্গতি প্রদর্শন করতে পারে সে পরবর্তী স্তরে দ্রুত অভিযোজিত হতে পারে। ফলে সে স্কুল পরিবেশে এসে বেশ এগিয়ে থাকে।

সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব (Symbolic Representation)

জেরমি ব্রুনারের মতে, সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব মূলত ভাষাভিত্তিক ও বিমূর্ত প্রকৃতির। যেমন 'ছাতা' শব্দটির (ভাষা) সঙ্গে ছাতার আকৃতির মিল নেই। এই ভাষা সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতাকে স্থায়ী স্মৃতিতে ধারণ করে বৌদ্ধিক সংগঠন দৃঢ় করতে পারে। অর্থাৎ পরিণত অবস্থায় ছাতা শব্দটি ব্যবহার করে সে একটি বস্তুকে বুঝতে পারে।

ব্রুনারের তত্ত্বের বিশেষত্ব হলো ব্রুনার বলেছেন, অভিজ্ঞতার এই সাংকেতিককরণের রীতি ও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি হলেও একটি পর্যায়ে এলে নিম্নবর্তী পর্যায়টি চলে যায় না। অর্থাৎ মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে তিন ধরনের সাংকেতিককরণের ক্ষমতাসহ অবস্থান করে অর্থাৎ শিখনের জন্য তিন ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক সাংকেতিককরণ প্রয়োজন হয় এবং অভিজ্ঞতার পুনরুত্থানের জন্যও শিক্ষার্থী প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি কৌশল ব্যবহার করতে পারে। সব শিশুকেই সব কিছুই শেখানো যায় যদি তাকে তার মতো করে শেখানো হয়।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্বের ভূমিকা

শিশুদের জন্য শিক্ষাক্রম তৈরিতে ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশু যা কিছু তার প্রথম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণ করে ও সংরক্ষণ করে পরবর্তীকালে নতুন কোনো ধারণা পাওয়ার পর যদি পূর্বের ধারণার সাথে কিছু নতুনত্ব বা পরিবর্তন আসে সে সেটা তার মতো করে অভিযোজিত করে। যেহেতু শিশুর মধ্যে মূর্ত বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ বেশি থাকে সে জন্য সে স্কুলে আসার পর তাকে স্কুল পরিবেশে মূর্তবস্তু বা বাস্তব জিনিস দেখিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শেখানো যেতে পারে।

শিশু একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সাথে থেকে প্রতিটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে তবে সেটি করে সে তার বয়স উপযোগী এবং ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী। সে জন্য বলা হয়ে থাকে, একজন শিশুকে সকল ধরনের শিক্ষা দেওয়া যায়, যদি সেটা তার বয়সানুযায়ী দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'পানি' সম্পর্কিত অনেক তথ্য আছে, যেমন– তরল পদার্থ হিসেবে পানি, জীবন ধারণের জন্য পানির অপরিহার্যতা, যৌগিক পদার্থ হিসেবে পানি, পানির গঠন, পানির বিশ্লেষণ, উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসেবে পানি, দূষিত পানি, বিশুদ্ধ পানি, সুপেয় পানি, পানি দূষিত হওয়ার কারণ, পানি বিশুদ্ধ করার উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলোর সবই শিশু স্কুলে আসার পর শেখানো যেতে পারে। কিন্তু এর পরিসর কোনো শ্রেণিতে কতটা হবে তা নির্ধারণে ব্রুনারের বিকাশ তত্ত্ব বহুলাংশে কার্যকর। অর্থাৎ শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্ব। এটি শ্রেণি কার্যক্রমে উপকরণের ধরন নির্বাচনে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, রঙিন বা সাদা কালো, এর আকার, এর গতি বা স্থিরতা, একে ছুঁয়ে দেখার সুযোগও করে দেয়।

শিক্ষক যদি ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্বকে মাথায় রেখে তার শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশে ছন্দময়তা থাকবে এবং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটবে সুষমভাবে। একই সঙ্গে শিশু তার পরবর্তী শ্রেণি কার্যক্রমে মনোযোগী ও সক্রিয় থাকবে।

২.৫ : অসবেল-এর শিখন তত্ত্ব

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী **ডেভিড পল অসবেল** (David Paul Ausubel) ১৯১৮ সালের ২৫ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে (Brooklyn, New York City) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৮ সালের ৯ জুলাই নিউইয়র্কের হাইড পার্কে (Hyde Park, New York) মৃত্যুবরণ করেন।

David Paul Asubel

ডেভিড অসবেল শিক্ষণ ও শিখন সম্পর্কিত গবেষণা করেছেন প্রায় ২০ বছর ধরে। তিনি ১৯৫০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ধরনের গবেষণা কাজে সক্রিয় ছিলেন। ডেভিড পল অসবেল সুইজারল্যান্ডের জীববিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞান বিকাশে জীববৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে গবেষণা করেন।

অসবেল গবেষণা করে যে শিখন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন তা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষকের বাচনিক পাঠ থেকে অর্থপূর্ণভাবে শিক্ষা অর্জন করে তার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাঁর মতে, অর্থপূর্ণ শিখন তখনই হয় যখন শিক্ষার্থী নতুন তথ্যকে তার পূর্বে অর্জিত অভিজ্ঞতার সংগে সংযুক্ত করতে পারে। যদি শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী এই কাজে ব্যর্থ হয়, তাহলে অর্থপূর্ণ শিখন হবে না। সেক্ষেত্রে যে শিখন হবে তাকে আমরা যান্ত্রিক শিখন বা অর্থহীন শিখন (Rote learning) বলতে পারি। আর এই ধরনের যান্ত্রিক শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতার কোনো সংরক্ষণও হয় না। অসবেলের মতে অর্থপূর্ণ শিখনের তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যেমন–

১. শিক্ষার্থীকে অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর সম্মুখীন করতে হবে।
২. ওই অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সংগঠনের প্রয়োজনীয় ধারণা বা স্কিমা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ বৌদ্ধিক সংগঠনে নতুন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করার মত স্কিমা না থাকলে প্রকৃত শিখন সম্ভব নয়।
৩. অর্থপূর্ণ শিখনের উপযোগী শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা থাকতে হবে।

শিখনে অগ্রগামী সংগঠক একটি আধুনিক ধারণা। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর পুনর্গঠন এবং বৃদ্ধি এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীর শেখার ধারা এগিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে নতুন ধারণার জন্ম দেয়। ১৯৬০ সালে ডেভিড অসবেল অগ্রগামী সংগঠক (Advance Organizer) ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, সার্থক শিখন তখনই হয় যখন শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের স্তর থেকে শিখতে শুরু করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যখন কোনো নতুন জ্ঞান বা ধারণা তার নিজস্ব জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক ধারণার সাথে সচেতন এবং সম্পূর্ণভাবে মেলাতে পারে তখনই তার শেখা সার্থক হয়। অসবেলের এই তত্ত্বকে সমন্বয় তত্ত্ব বলা হয়। এ তত্ত্বে বলা হয় যে, শিক্ষক যে নতুন তথ্য উপস্থাপন করছেন শিক্ষার্থীর কাছে যদি তার অর্থ স্পষ্ট হয় তবে শেখার কাজটি সহজ হয় এবং তা দ্রুত এগিয়ে চলে। সে কারণে নতুন তথ্য এবং শিক্ষার্থীর পূর্বঅভিজ্ঞতার মধ্যে যদি যোগসূত্র স্থাপন করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে তথ্যটি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হয়। ফলে শিক্ষার্থী তা শিখতে পারে।

অগ্রগামী সংগঠক (Advance Organizer)

অগ্রগামী সংগঠক বলতে বোঝায়, পাঠের কিছু মৌলিক বিষয়বস্তু বা মূলভাব যা পাঠের উদ্দেশ্যের আলোকে শনাক্ত করা হয়। পাঠ বর্ণনা কিংবা পাঠের সারাংশ আদায় করা থেকে অগ্রগামী সংগঠক শনাক্ত করার কাজটি সম্পূর্ণ আলাদা। শিক্ষক যদি সার্থকভাবে পাঠের এই অগ্রগামী সংগঠক বা মূলভাবগুলোকে চিহ্নিত করতে পারেন তাহলে জ্ঞান কাঠামোতে নতুন তথ্য সংযোজনের কাজটি সহজ হয়। অগ্রগামী সংগঠকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সেতুবন্ধন তৈরি করা। নিচে অগ্রগামী সংগঠকের ২টি সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

১. Cognitive instructional strategy used to promote the learning and retention of new information (Ausubel, 1960).
২. It is a method of bridging and linking old information with something new.

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, অগ্রগামী সংগঠক একটি কৌশল এবং এ কৌশল ব্যবহার করে–

- নতুন তথ্যের সাথে পুরোনো তথ্যের সংযোগ ঘটে ও একটি যোগসূত্র রচিত হয়।
- নতুন তথ্য সংরক্ষিত হয় এবং শিখনে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়।
- প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয় ও একটি সামগ্রিক ধারণা গঠিত হয়।

অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীকে কোনো নতুন বিষয় শেখানোর জন্য শিক্ষকের একটি নির্দেশনা কৌশল হিসেবে কাজ করে। নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্যের যে সংগঠন করেন সেটাই অগ্রগামী সংগঠক। অগ্রগামী সংগঠকের কাঠামো নির্মাণের আগে নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে–

- জানা বিষয়টির পুনরুত্থাপন হবে।
- নতুন বিষয়টি সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ধারণা জন্মাবে।
- এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

তত্ত্বগতভাবে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, অগ্রগামী সংগঠকের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানকে অর্থবহ ও প্রয়োগযোগ্য করে তোলার জন্য পূর্বজ্ঞানের পুনর্গঠন ও সমন্বয় সংঘটিত হয়। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের পূনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করে তোলার জন্য অগ্রগামী সংগঠককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অগ্রগামী সংগঠক শিখন-শেখানোয় যেভাবে কাজ করে–

- শিক্ষার্থী আগেই বুঝতে পারে কী তথ্য তার কাছে আসছে।
- সে সম্পর্কে বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার আগেই একটি বিমূর্ত এবং অস্পষ্ট ধারণা তার মানসপটে চিত্রিত হয়ে আছে।
- অতএব নতুন ধারণাটি স্থাপন করার জন্য সে একটি জায়গা খুঁজে পায়।
- পূর্বজ্ঞানের আলোকে নতুন তথ্য তখন অর্থবহ হয়, স্পষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা মূর্তরূপে বিকাশলাভ করে।

অসবেলের বাচনিক শিখন তত্ত্বটি শিখনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন–

১. কীভাবে জ্ঞান সংগঠিত হয়?
২. নতুন তথ্য সংযুক্ত করে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে?
৩. শিক্ষক কীভাবে এ তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠদান করে শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করবেন?

অগ্রগামী সংগঠক প্রয়োগ করে মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের কাঠামোর পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে বক্তব্যের সাথে সাথে যখন চার্ট, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তখন সংগঠন আরও বেশি জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। শিখনের সম্পূর্ণতা আসার আগে সম্পূর্ণ জ্ঞান-কাঠামো ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন জ্ঞান গ্রহণ প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে শিক্ষার্থীর বর্তমান ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়। বর্তমান ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা মিলে যাওয়া অংশটুকু সে গ্রহণ করে, প্রয়োগযোগ্য হলে অর্থাৎ শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট হলে সে নতুন ধারণার অনুশীলন করে। ফলে পুরোনো ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজনের ধারণা নতুনভাবে গঠিত হয়। অনুশীলনের ফলে এই নতুন জ্ঞানে সে অভ্যস্ত হয়। বর্তমান ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের কোনো অসঙ্গত অংশ শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে না। নতুন নতুন তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর এভাবেই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিবিড় ও ধারাবাহিকভাবে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো ধারণা/তথ্যকে যখন একটি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত পরিসরে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন ধারণা/তথ্যগুলোর সামগ্রিক বিন্যাসকে অগ্রগামী সংগঠক বলে।

অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য

অগ্রগামী সংগঠক কোনো ধারণার সার্বিক রূপরেখা এবং সারাংশ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সামগ্রিকভাবে পুরোনো ধারণার সমন্বয়ে একটি সাধারণ ধারণার জন্ম দেওয়া ও বিমূর্ত জ্ঞানের বিকাশই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। সুতরাং অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীর নিজস্ব ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের জন্য যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর পুনর্গঠন এবং বৃদ্ধি এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

এখানে গেস্টাল্ট তত্ত্বে (Gestalt Theories) শিখনের মূলনীতি এবং স্কিমা (Schema) গঠনের সাথে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। এ তত্ত্বের সাথে ব্রুনারের স্পাইরাল মডেলেরও (Bruner's Spiral Learning Model) অনেক মিল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অসবেল তার সমন্বয় নীতিতে বর্তমান জ্ঞান স্তরের পুনর্গঠনের কথা বলেছেন, গঠনবাদীদের মতো সম্পূর্ণভাবে নতুন কাঠামো বিকাশের কথা বলেননি। অসবেল তার জ্ঞানীয় বিকাশের এই তত্ত্বে পিয়াঁজের (Piaget) মতামত দ্বারা অনেকটাই প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

শ্রেণিশিক্ষণে অগ্রগামী সংগঠকের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

শিক্ষার্থীকে নতুন কোনো বিষয় শেখাতে হলে সর্বাগ্রে যে দিকটিতে গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হলো নতুন তথ্যটির অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট কিনা এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কাঠামোর সাথে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। অসবেলের মতে, মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে নতুন কোনো তথ্য শেখানোর জন্য তথ্যের অস্পষ্টতা দূর করা প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীর তথ্য গ্রহণের সামর্থ্য অর্থাৎ তার পূর্বঅভিজ্ঞতা বিবেচনা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী যাতে পরিবেশিত তথ্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং সেইসাথে সে তার বৌদ্ধিক ভিত্তি উন্নত ও দৃঢ় করতে পারে, অগ্রগামী সংগঠক সেভাবেই কাজ করে।

শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষকের যাবতীয় কাজকে সমন্বিত করার জন্য অসবেল অগ্রগামী সংগঠকে নিম্নবর্ণিত দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন–

১. ক্রমবর্ধমান পৃথকীকরণ (Progressive Differentiation)
২. সমন্বিত সঙ্গতিবিধান (Integrated Reonciliation)

ক্রমবর্ধমান পৃথকীকরণ (Progressive Differentiation)

এ নীতি অনুসারে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংগঠন করতে হবে যেন জ্ঞানের সহজ থেকে কঠিন ক্ষেত্রে তা উপস্থাপিত হতে পারে। তথ্য ধীরে ধীরে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করবে এবং উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করবে।

সমন্বিত সঙ্গতিবিধান (Integrated Reonciliation)

এ নীতি অনুসারে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞানস্তরের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতি স্থাপিত হতে থাকবে।

পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন নিয়ে শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষক যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন শিক্ষাবিদ অসবেল সে দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, পাঠ্যপুস্তকে একটি বিষয়ের ধারাবাহিক উপস্থাপন না করে যদি একটি বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে তার বিভিন্ন দিকের ধারাবাহিক উপস্থাপন করা হয় তবে তা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ভিত্তি গঠনে অনেক বেশি সহায়ক হয়। ফলে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশের জন্য প্রতিক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতেই অগ্রসর হওয়া যায়। অগ্রগামী সংগঠক এভাবে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করে, যেখানে নতুন ও অজানা তথ্য শেখার জন্য শিক্ষার্থী তার পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে এগুলোক সমন্বিত করতে পারে। অসবেল বলেছেন, কোনো নতুন তথ্য বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক তথ্য যখন সংগঠিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করে, তখন তার প্রতিটি ক্ষেত্র স্পষ্ট, সহজবোধ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় এ সবকিছু উপস্থাপনের জন্য অগ্রগামী সংগঠক কার্যকর হয়।

শ্রেণিশিক্ষণে অগ্রগামী সংগঠক প্রয়োগ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য কতকগুলো প্রাসঙ্গিক তথ্যকে শুধুই তালিকাবদ্ধ করে উপস্থাপন না করা হয়। তালিকাবদ্ধ তথ্যগুলো শুধু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তই থাকবে না, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হতে হবে।

যেমন– একজন শিক্ষক অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় থেকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে কিছু মৌলিক ও বা বাস্তবসম্মত তথ্য শেখাবেন। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের আগে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবর্তন এই ধারণাটির সাথে সর্বাগ্রে পরিচিত হতে হবে। সেজন্য শিক্ষক চিত্র, চার্ট বা অন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।
শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগামী সংগঠকের কার্যকারিতাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়–

ধাপ– এক: অগ্রগামী সংগঠকের উপস্থাপন

- পাঠের লক্ষ্য বিশ্লেষণ।
- বর্তমান সংগঠক
  - নতুন তথ্য সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।
  - উদাহরণ বা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করা।
  - মূল বিষয়বস্তু থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বিবেচনা করা।
  - এসব কিছুর পুনরাবৃত্তি করা।
  - শিক্ষার্থীর পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষকের সর্বক্ষণ সচেতন থাকা।

ধাপ– দুই: শিখনের কার্যবিধি বা তথ্যসামগ্রী উপস্থাপন নীতি

- বর্তমান তথ্যসামগ্রী উপস্থাপন করা।
- তথ্য সামগ্রীর সুনির্দিষ্ট এবং যৌক্তিক বিন্যাস করা।
- তথ্যের সংগঠক উপস্থাপন করা।

ধাপ– তিন: জ্ঞানের শক্তিশালী পুনর্গঠন নীতি

- পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের নীতি প্রয়োগ করা।
- বিষয়বস্তুর সমস্যা সংক্রান্ত বা দুর্বোধ্য অংশগুলো ব্যাখ্যা করা।
- ধারণাগুলো বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা।
- সংগৃহীত জ্ঞান বা ধারণাসমূহ প্রয়োগ করা।

ডেভিড অসবেলের শিখন তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট হয় এবং এর মাধ্যমে তারা যে জ্ঞান অর্জন করে সেটা তাদের মস্তিষ্কের জ্ঞান কাঠামোতে সংযোজন সহজতর হয়।

২.৬ : সামাজিক গঠনবাদ (ভাইগোটস্কি), অসবর্ন ও উইট্রক-এর মতবাদ

ভাইগোটস্কি-এর সামাজিক গঠনবাদ

তৎকালীন সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানী **লেভ সিমায়োনোভিচ ভাইগোটস্কি** (Lev Semyonovich Vygotsky) সামাজিক গঠনবাদের প্রবক্তা। লেভ ভাইগোটস্কি ১৮৯৬ সালের ১৭ নভেম্বর বেলারুশের ওরশায় (Orsha, Belarus) জন্মগ্রহণ করেন এবং রাশিয়ার মস্কো (Moscow, Russia) শহরে ১৯৩৪ সালের ১১ জুন মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিখনের ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান সামাজিক গঠনবাদ (Social Constructivism) প্রকাশিত হয় ১৯২০ ও ৩০ এর দশকের দিকে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ব এর সাথে পরিচিতি লাভ করে ১৯৫০ এর দশকে। আমেরিকার নাসা (NASA- National Aeronautics and Space Administration) নামক অত্যাধুনিক মহাশূন্য গবেষণাগার আমেরিকানদের কাছে একটি গর্বের বিষয় ছিল এবং তারা চেষ্টা করেছিল সর্বপ্রথম মহাশূন্য জয় করবে। কিন্তু রাশিয়ার সর্বপ্রথম মহাশূন্যে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য জগতে আচমকা একটা ধাক্কা লাগে। যুক্তরাষ্ট্র তখন অনুধাবন করল যে, রাশিয়ানরা শুধু বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে নয় তারা উন্নত করেছে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রকেও।

Lev Semyonovich Vygotsky

ভাইগোটস্কি তার Throught and Language বইতে বলছেন, আমাদের ধারণার বিকাশ হয় যখন আমরা ভাষা দিয়ে পর্যবেক্ষিত বস্তুকে বর্ণনা করতে পারি। আমাদের ভাষাজ্ঞান যত বাড়ে ততই চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।

ভাইগোটস্কির শিখনের মূলতত্ত্ব হলো, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া জ্ঞানমূলক বা বৌদ্ধিক বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন শিশুর কৃষ্টিগত বিকাশের প্রতিটি কার্যাবলি ঘটে দুবার। একবার ঘটে তার সামাজিক অবস্থানের মধ্যে এবং আরেকবার ঘটে তার নিজের মধ্যে। প্রথমে ঘটে মানুষের সাথে এবং পরে ঘটে শিশুর অন্তর্মনে (Intrapsychologied)। এটা কোনো ধারণা সংগঠন, যৌক্তিক স্মৃতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত মনোসংযোগ সবক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সকল রকমের উচ্চ মাত্রার কার্যাবলি উৎপত্তি হয় বিভিন্ন একক ব্যক্তিত্বের প্রকৃত সম্পর্কের কারণে।

ভাইগোটস্কির দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে জ্ঞানমূলক বিকাশের ক্ষমতা নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। এটাকে তিনি Zone of Proximal Development (ZPD) বলেছেন। অর্থাৎ শিশুর বিকাশ শুরু হতে থাকে যখন সে সামাজিক আচরণে সম্পৃক্ত হয়। ZPD-এর পরিপূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে পরিপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগের উপর। সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বা বড়দের নির্দেশনার চেয়ে শিশুর জ্ঞান বিকাশ অনেক বেশি হয় তার একক প্রচেষ্টায়। ভাইগোটস্কির মতে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির সচেতনতার বিকাশ ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভাষার মাধ্যমে মানুষ তাদের সমবয়সীদের (Peer group) সাথে বা বড়দের সাথে যোগাযোগ রাখতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু একবার এ ব্যাপারে দক্ষ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে অন্তঃবোধগম্যতা তৈরি হয় এবং নিজের সাথে কথা বলতে পারে। জ্যাঁ পিয়াঁজে ও ব্রুনারের মতো জ্ঞানমূলক বিকাশ নিয়ে কথা বলেছেন ভাইগোটস্কি। তবে তার মতে, এ বিকাশ হয় ভাষা বিকাশের সাথে।

সামাজিক গঠনবাদের মূলনীতি

সামাজিক গঠনবাদের নিম্নবর্ণিত মূলনীতিগুলো লক্ষ্য করা যায়–

- যে কোনো বয়সে জ্ঞানমূলক বিকাশ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- পরিপূর্ণ জ্ঞানমূলক বিকাশের জন্য দরকার সামাজিক মিথস্ক্রিয়া।
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বাহন হচ্ছে ভাষা।

শিক্ষকের দায়িত্ব

একজন শিক্ষককে প্রথমে জানতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা সমাজ থেকে শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ধারণা নিয়ে আসে তার আলোকে পরবর্তীকালে যাতে যৌক্তিক দিকে গিয়ে সত্য ধারণা প্রতিস্থাপন করতে পারে শিক্ষক সে দিকে গুরুত্ব দেবেন।

সমসাময়িক শিখনতত্ত্বের মধ্যে অসবর্ন ও উইট্রকের শিখন তত্ত্ব মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োগ হয়ে আসছে। অসবর্ন ও উইট্রকের শিখনতত্ত্বের মূল কথা হলো, শিশু পূর্বার্জিত কিছু ধারণা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং সেই ধারণার সাথে নতুন তথ্যের সংযোগ ঘটিয়ে নতুন ধারণা গঠন করে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে, শিশুর এই পূর্বধারণা এবং নতুন ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বা সংযোগ তৈরি করে দেওয়া।

শিক্ষার্থীরা যেহেতু সমাজেরই সদস্য এবং তারা বিদ্যালয়ে আসে পড়ালেখা করার জন্য সেজন্য তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ধারণা ও চিন্তাভাবনা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। এ জন্য এসবের সাথে সম্পর্ক রেখে বিদ্যালয়ে যদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা বুঝতে সহজ হবে।

অসবর্ন ও উইট্রক এর মতবাদ

অসবর্ন এবং উইট্রক এই দুজন জ্ঞানমূলক গঠনবাদী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। এরা বিশ্বাস করেন যে, শিশুরা স্কুলে আসার আগেই অর্থাৎ স্কুল জীবনে পা রাখার পূর্বেই তারা তাদের চারপাশের পর্যবেক্ষণ থেকে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসে। শিক্ষকদের উচিত সেগুলো মূল্যায়ন করা অর্থাৎ বিবেচনায় আনা এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে আরও ২-৪টি ঘটনার উপস্থাপন করে সেগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যাওয়া যাতে শিশু তার অর্জিত ভ্রান্ত ধারণা সে নিজে বুঝতে পেরে সঠিকটাকে গ্রহণ করে নিজের ধারণার বিকাশ ঘটাতে পারে। যখন শিক্ষার্থী তার পূর্বার্জিত ধারণা দিয়ে নতুন ধরনের আরেকটি ধারণা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি দ্বন্দ্বে পৌঁছায় তখন সে সেখান থেকে একটি নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং পূর্বের ধারণা ভ্রান্ত হলে সে দ্বন্দ্বের যৌক্তিকতা দিয়ে তার পূর্বধারণার পুনঃসংগঠন করে।

অসবর্ন ও উইট্রকের মত অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে নতুন তথ্যের সংযোগ ঘটাতে গিয়ে সে যা কিছু অর্জন করে তাকেই বলা হয় নতুন ধারণা গঠন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখবে। দলগত কাজে অথবা সরবরাহকৃত সমস্যা সমাধানের আলোচনায় শিক্ষার্থীকে গভীর চিন্তা করতে হয় এবং পারস্পরিক মতের আদান-প্রদানের পর সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এভাবেই শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও যুক্তির বিকাশ সাধিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে যত বেশি দ্বন্দ্ব (conflict) তৈরি করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ততবেশি সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হবে। যখন কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখন তাদের ওই বিষয় সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তারপর সত্য-মিথ্যা যাচাই হওয়ার পর তাদের পূর্বজ্ঞান নতুন জ্ঞান দ্বারা পরিবর্তিত হয় অথবা পূর্বজ্ঞানের সহিত নতুন জ্ঞানের সমন্বয় হয়ে বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট ও স্থায়ী হয়। এ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের অর্জিত জ্ঞান এবং বিদ্যালয়ের জ্ঞান হয় পাশাপাশি অবস্থান করে অথবা দ্বন্দ্ব তৈরি করে। তারপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা যাচাই হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠে উদ্ভূত পরিস্থিতি অর্থাৎ সরবরাহকৃত সমস্যা সংবলিত বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে দৈনন্দিন জীবন থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগায় এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজনীয় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে অগ্রসর হয় এবং ধারণা স্পষ্ট করে। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে তার নিজের যুক্তি ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্তের সাথে সংযোগ করেন। এভাবেই পাঠে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়।

অসবর্ন ও উইট্রক বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার্থীদের ধারণায় পরিবর্তন তখনই আসে যখন তারা তাদের পূর্বজ্ঞানের সাথে নতুনভাবে অর্জিত তথ্যের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয় বা পুরাতন ও নতুন জ্ঞান একত্রিত করে বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করতে পারে।

২.৭: মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক গঠনবাদ ও জ্ঞান বিকাশ মতবাদের ভূমিকা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সামাজিক গঠনবাদের পরামর্শ

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া গঠনের ক্ষেত্রে Lev Vygotsky-র সামাজিক গাঠনিক মতবাদের পরামর্শ হলো, এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সামাজিক জ্ঞান কাজে লাগানো উচিত। ভাইগোটস্কির মতে, শিক্ষার্থীদের ধারণার বিকাশ হয় যখন তারা ভাষা দিয়ে পর্যবেক্ষিত বস্তুকে বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু যে কোনো ঘটনা যা তারা সমাজে ঘটতে দেখে তা তারা তাদের ভাষা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই সেই ঘটনা সংবলিত কিছু চিন্তা (thought) তারা বহন করে আনে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের করণীয় হলো, তার সেই চিন্তাকে ভাষায় রূপান্তর করা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও উদাহরণের মাধ্যমে তার ঘটনাটির স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এভাবে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান যত বাড়ে ততই তারা চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ধারণার বিকাশ লাভ করে।

ভাইগোটস্কির মতে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু শিখলে তার শেখাটা অনেক কার্যকর হয়, বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে এবং এর প্রভাবে জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিশুর কৃষ্টিগত বিকাশের প্রতিটি কার্যাবলি দুবার ঘটে। এটা ঘটে থাকে শিশুটি যে পরিবেশে বা যে সামাজিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করে সেখানে এবং আরেকবার ঘটে শিশুর নিজের মধ্যে। এটাকে বলা হয় শিশুর অন্তর্মন। অর্থাৎ এটা প্রথমে ঘটে সমাজের মানুষের সাথে পরে ঘটে তার অন্তর্মনে। এভাবে শিশুর মধ্যে যত রকমের উচ্চ মাত্রার চিন্তন শেখানো হোক না কেন তার সাথে সমাজের সম্পর্ক তৈরি করে শেখাতে হয়। শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে সামাজিক গঠনবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞানবিকাশ মতবাদ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এসব কার্যকারিতা বা প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ তত্ত্ব জানা থাকলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা যায়।

২. নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানকালে শিক্ষক লক্ষ্য রাখতে পারবেন পাঠ হৃদয়ঙ্গম করার মতো মানসিক পরিপক্বতা শিক্ষার্থীর আছে কিনা।

৩. জ্ঞান বিকাশ কেবল বয়সের উপরই নির্ভর করে না, পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে তৈরিতে যত্নবান হবেন।

৪. শ্রেণিকক্ষের সব শিশুর একই বিষয়ের ধারণা সমান থাকে না। শিক্ষকের দায়িত্ব সে অনুযায়ী দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদাভাবে যত্ন নেওয়া।

৫. পিয়াঁজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে সক্রিয় শিখন। শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ হয় তাই হলো তার প্রকৃত শিখন।

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রুনারের Theory of Instruction এর গুরুত্ব হলো, ব্রুনার মনে করেন, শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত থাকবে। শিখনের জন্য ইচ্ছা হলো সবচেয়ে বড় শর্ত। এখানে শিক্ষককে থর্নডাইকের প্রস্তুতির সূত্রের কথাও ভাবতে হবে। ব্রুনার মনে করেন, শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে শেখাতে হবে এবং শিখনের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। তা না হলে শিখন স্পষ্ট ও স্থায়ী কোনোটাই হবে না। ব্রুনারের এই কার্যক্রমের সাথে ভাইগোটস্কির জোন অব প্রক্সিম্যাল ডেভেলপমেন্ট (Zone of Proximal Development- ZPD) এর কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কেননা শিক্ষার্থী নিজ প্রচেষ্টায় শিখতে পারে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি পর্যন্ত। এই গণ্ডিও শিক্ষার্থীর মেধা-মনন ও পরিবেশভেদে আলাদা হয়। শিক্ষকের কাজ হলো, শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ তাকে নতুন আরেকটি পরিসীমায় পদার্পণ করানো।

৭. ব্রুনার আরও মনে করেন, কোনো কিছু শেখানোর জন্য পুরস্কার বা শাস্তি যাই দেওয়া হোক না কেন, তার প্রকৃতি এবং হার নির্দিষ্ট হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ব্রুনারের মতবাদ প্রয়োগ করে শিখন-শেখানোর ব্যবস্থা করলে শিখন অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে। স্কিনারও শিখনের জন্য বলবৃদ্ধিকরণ (re-inforcement) বা পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন।

৮. অসবেলের অর্থপূর্ণ বাচনিক শিখন মতবাদ অনুযায়ী শিখন হবে অর্থপূর্ণ। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মূলভাব স্পষ্ট করে এবং প্রকৃত অর্থ বুঝে শিক্ষালাভ করতে হবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধারণা স্পষ্ট করার উপর জোর দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সহিত সংযোগ করে নতুন জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় যা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

৯. অসবর্ন ও উইট্রকের মতে, পুরোনো জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে নতুন তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর নিজের প্রতি আস্থা বাড়বে। কিন্তু কখনও এমন হতে পারে যে তার পূর্বঅভিজ্ঞতা বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কিছুটা হোঁচট খেতে পারে, তৈরি হতে পারে দ্বন্দ্ব, সেক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হবে দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য বিষয়টির প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা অথবা শ্রেণিতে সহপাঠীদের সাথে দলগতভাবে আলোচনার ব্যবস্থা করা। যেহেতু একই শ্রেণিতে বিভিন্ন সমাজ ও পরিবেশের শিক্ষার্থী আসে সেজন্য তাদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দিলে শিক্ষার্থীরা তাদের পারস্পরিক আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় আসবে এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিষয়বস্তুটি তাদের দিয়ে উপস্থাপন করিয়ে তার নিজস্ব মতামত পেশ করবেন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শিখন হয় যুক্তিভিত্তিক। কেননা দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য তাকে অনেক তথ্য অর্জন করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীর শিখন হয় স্থায়ী এবং শিক্ষার্থী হয় উঠে জ্ঞানপিপাসু। সুতরাং শিক্ষক যুক্তিভিত্তিক দ্বন্দ্ব তৈরির মাধ্যমেও পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন।

১০. থর্নডাইকের সংযোজনবাদ অনুযায়ী শিখনের প্রধান ও গৌণ সূত্রগুলো অবশ্যই শিক্ষককে বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীর মনকে প্রথমেই শিখনের প্রতি ইতিবাচক করতে হবে। তা না হলে সকল চেষ্টাই বৃথা হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীর শিখন সফলতায় তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পুরস্কার পাওয়ার আশায় শিক্ষার্থীরা শিখবে। শিক্ষককে বিষয়বস্তু অনুসারে উদ্দীপক ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সাড়া তৈরির পরিবেশ গঠন করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শ্রেণিতে সক্রিয় রাখার মতো কার্যক্রম উপস্থাপন করবেন যা অবশ্যই পরিবেশ ও বয়সোপযোগী হবে।

১১. ভাইগোটস্কির মতে, ভাষা হচ্ছে শিখনের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষক যে অঞ্চলে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তাকে সে অঞ্চলের কিছু শব্দভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হতে হবে। কেননা শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় কখনও শিক্ষার্থীর পরিচিত শব্দের সাথে তুলনা করে বা পরিচিত শব্দ ব্যবহার করতে হতে পারে। কারণ কোনো বিষয়ে নতুন তথ্য বা জ্ঞান অর্জনে ভাষা হচ্ছে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সুতরাং শিক্ষককে শ্রেণি কার্যক্রমের পরিকল্পনা করার সময় এ কথাটি তার মাথায় রাখতে হবে। শিক্ষককে এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ভাষার একটি আদর্শমান আছে যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান মাধ্যমই হচ্ছেন শ্রেণি শিক্ষকগণ। এ ইউনিটে আলোচিত শিখনের কোনো তত্ত্ব এবং তথ্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, একজন শিক্ষকের জন্য প্রতিটি তত্ত্ব এবং তথ্য অনেক গুরুত্ব বহন করে। কোনো একটি তত্ত্ব বা তথ্যকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে পাঠদান করা বা পাঠদানের জন্য কোনো পরিকল্পনা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবে এ কথা ঠিক যে, সব শ্রেণিতে বা সব ধরনের বিষয়ে সবগুলো তত্ত্ব কার্যকর নাও হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলোচিত শিখন তত্ত্বগুলো শিক্ষকের ভিত শক্ত করতে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষক প্রতিদিনের শ্রেণি কার্যক্রম শেষে তাদের প্রতিফলনমূলক ডায়েরি লেখার সময় যদি এই তত্ত্বগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বা প্রভাবিত করেছে তা লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে অবশ্যই শিখন তত্ত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) সংযোজনবাদ কী?
(খ) সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ বলতে কী বোঝায়?

২. (ক) করণ শিখন কী?
(খ) মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াঁজে জ্ঞান বিকাশের স্তরকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং কী কী?

৩. (ক) ব্রুনারের জ্ঞান বিকাশের স্তর কয়টি ও কী কী?
(খ) ZPD বলতে কী বোঝায় এবং এর মূল কথা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদটি ব্যাখ্যা করুন।
(খ) শ্রেণি পাঠদানে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে মতামত দিন।
(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের প্রধান সূত্র তিনটির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. (ক) সংযোজনবাদের সাথে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের পার্থক্য নিরূপণ করুন?
(খ) শ্রেণিকক্ষে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ প্রয়োগে শিক্ষকের করণীয় দিকগুলোর বিবরণ দিন।

৩. (ক) করণ শিখন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য স্কিনারের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে লিখুন।
(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের করণ শিখন মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৪. (ক) জ্যাঁ পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশের স্তরগুলোর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
(খ) এই মতবাদ অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো লিখুন।
(গ) শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগিক দিকের বর্ণনা দিন।

৫. (ক) জেরোমি ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্বটি কী? ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্বের স্তরগুলো লিখুন।
(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক এ তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষকের করণীয় কী?

৬. (ক) অসবেলের অর্থপূর্ণ শিখন তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
(খ) শিক্ষায় এ তত্ত্বের তাৎপর্য কী?
(গ) অর্থপূর্ণ শিখন ও অগ্রগামী সংগঠকের আলোকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো লিখুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

রায়, সুশীল, শিক্ষা মনোবিদ্যা (১৯৯৯), ৮ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১।

হক, মোহাম্মদ নাজমুল ও জাহান, মনিরা, শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা: পিয়াঁজে তত্ত্ব (২০০২), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ শিখন সামগ্রী)–২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৭-৩৫ এবং ৫১ -৫৩, ৫৯, ৬০,৭১।

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

Scott, Psychology, Foresman and Company; page 83.

Hergenhahn, B.R.(1982), An Introduction to Theories of Learning, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632, USA.

ইউনিট ৩ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গঠনবাদী ধারণার প্রয়োগ

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৩.১: অংশগ্রহণমূলক ও সতীর্থ শিখন, দলগত কাজ–সম্মিলিত শিখন (জনসন এন্ড জনসন)

৩.২: বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত চেতনা, সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ ও কনসেপ্ট ম্যাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার।

ইউনিট ৩ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গঠনবাদী ধারণার প্রয়োগ

পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার মতো একটি জটিল প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ আবশ্যক। পাঠদান কার্যক্রম এখন আর একমুখী প্রক্রিয়া নয়, এটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। পাঠদানকে সফল ও কার্যকর করার জন্য শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বেশকিছু পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। পদ্ধতি হলো কোনো পাঠে সামগ্রিকভাবে ব্যবহৃত শিখন-শেখানোর উপায়। অপরদিকে কৌশল হলো একটি পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড। ক্ষেত্রবিশেষে কখনও পদ্ধতি কৌশল এবং কখনও কৌশল পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একই পাঠে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। আবার কোনো একটি পদ্ধতি সফল করার জন্য একাধিক কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে।

এই ইউনিটে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে–

৩.১: অংশগ্রহণমূলক ও সতীর্থ শিখন, দলগত কাজ–সম্মিলিত শিখন (জনসন এন্ড জনসন)

৩.২: বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত চেতনা, সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ ও কনসেপ্ট ম্যাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার।

৩.১ : অংশগ্রহণমূলক ও সতীর্থ শিখন, দলগত কাজ–সম্মিলিত শিখন (জনসন এন্ড জনসন)

অংশগ্রহণমূলক শিখন

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের যে শিখন হয় তাকেই অংশগ্রহণমূলক শিখন (Participatory Learning) বলে। অংশগ্রহণমূলক শিখনকে বলা হয়, The process of participation fosters mutual learning. অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। তবে এর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

নিম্নের ছকে কিছু পদ্ধতি ও কৌশলের উল্লেখ করা হলো যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণমূলক শিখন সম্পন্ন করতে পারে–

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি	অংশগ্রহণমূলক কৌশল
আলোচনা পদ্ধতি (Discussion method)	একক কাজ (Individual work)
সেমিনার (Seminar)	জোড়ায় কাজ (Pair work)
প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method)	সতীর্থ শিখন (Peer learning)
বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method)	দলগত কাজ (Group work)
অভিনয় পদ্ধতি (Modeling)	ভূমিকাভিনয় (Role playing)
সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving method)	এক্সপার্ট জিগ্‌স (Expert Jigsaw)
সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview)	পোস্টবক্স কৌশল (Postbox strategy)
পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental method)	মাইন্ড ম্যাপিং (Mind mapping)
ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি (Brainstorming method)	অণুশিক্ষণ (Microteaching)

একজন শিক্ষক যদি পাঠদান কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করেন তাহলে আশা করা যায় যে, শ্রেণি পাঠদান শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে এবং পঠন-পাঠন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এখানে

উল্লেখ্য, শ্রেণি পাঠদানে পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিখনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা। শ্রেণি পাঠদানে অনুসরণযোগ্য নিম্নবর্ণিত দুইটি পদ্ধতি ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি

এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলা হয় Brain Storming Method, যার বাংলা অর্থ করা হয়েছে মাথা খাটানো পদ্ধতি। মাথা খাটানো পদ্ধতি বলতে শ্রেণি পাঠদানের এমন এক পদ্ধতিকে বোঝায়, যে পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলগতভাবে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, মাথা খাটিয়ে উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক উপায়ে কয়েকটি দলে ভাগ করে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত সফলভাবে কর্মতৎপর রাখার জন্য মাথা খাটানো পদ্ধতি খুবই কার্যকর। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানোর জন্য বিভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা করার এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিকাশের সুযোগ পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠে কার্যকরভাবে সক্রিয় থাকে। শ্রেণি পাঠদানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দেয় এবং শ্রেণিতে কর্মতৎপর থাকে। পাঠের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে প্রতিটি দলকে পৃথক পৃথক পর্ব বা সমস্যা প্রদান করতে হয়। অতঃপর দলভিত্তিক প্রাপ্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে প্রাপ্ত সমস্যার সমাধান করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

- পাঠ সম্পর্কিত জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধিত হয়।
- পাঠের প্রতিটি পর্বেই শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মতৎপর থাকে।
- শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়।
- শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করা ও মাথা খাটানোর সুযোগ পায়।

প্রয়োগ কৌশল

- ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয়ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে হয়।
- দলীয়ভাবে প্রয়োগ করতে হলে নিয়মানুযায়ী দল গঠন করতে হবে।
- প্রতিটি দলের জন্য পৃথক পৃথক সমস্যা নির্বাচন ও বরাদ্দ করতে হবে।
- দলের প্রাপ্ত সমাধান/চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপনের জন্য খাতা/পোস্টার পেপার ব্যবহার করা যায়।
- একটি দলের চিহ্নিত সমাধান অন্য দলের সাথে বিনিময় করা উচিত।
- প্রতিটি দলের লিখিত মতামতের সাথে অন্যান্য দলও তাদের নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করতে পারেন।

অনুশিক্ষণ (Microteaching)

পাঠদানে এই কৌশলটি সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হয়। এই কৌশলটি অনুসরণের ক্ষেত্রে পাঠদানের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ও পাঠের বিষয়বস্তুকে কতকগুলো ছোট ছোট পাঠে ভাগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পাঠদানের এই ক্ষুদ্র বিষয়বস্তুর ওপর শ্রেণির অপর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পাঠদান করতে হয়। অন্য শিক্ষার্থীরা এই সময় ওই নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে পাঠদানে এই কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে ৫-৬ মিনিট সময় ধরে পাঠের একটি খণ্ডিত অংশ নিয়ে পাঠদানের একটি বিশেষ কৌশল উপস্থাপন করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এই কৌশল অনুশীলন করার সুযোগ লাভ করে। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষককে ওই পাঠ সম্পর্কে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে হবে। পাঠদানের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে এই কৌশলটি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে–

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠের একটি খণ্ডিত অংশ শ্রেণিতে স্বল্প সময়ে উপস্থাপন করার জন্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করতে হবে।
২. শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অণুশিক্ষণ অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত করবেন। শ্রেণিতে অণুশিক্ষণ অনুশীলন কীভাবে করতে হবে এ সম্পর্কে শিক্ষক আগেই একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

৩. কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ উপস্থাপনকালে শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ওই শ্রেণির শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করবে।
৪. শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে ওই পাঠের ওপর একটি গঠনমূলক ফলাবর্তন দেবেন।
৫. শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপিত পাঠের উপর শিক্ষকের ফলাবর্তনের পূর্বে অন্যান্য শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা মনোভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশের জন্য, স্বল্প সময়ে পাঠের লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অপরিহার্য। সর্বোপরি অমনোযোগী ও স্বল্প মেধার শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষককে শুধু জানলেই চলবে না, বরং তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে হবে। পাঠদানকে সফল ও কার্যকর করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে শিক্ষকের গুণগতমান অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাবে।

সতীর্থ শিখন (Peer Learning)

সতীর্থ শিখন বলতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা বোঝায়। অর্থাৎ একই শ্রেণির একই বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনকে সতীর্থ শিখন বলে।

Donnell এবং A. King (1999) তাদের Cognitive Perspectives on Peer Learning গ্রন্থে বলেন, æPeer learning is an educational practice in which students interact with other students to attain educational goals.”

সতীর্থ শিখনের প্রয়োজনীয়তা

সতীর্থ শিখনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শিখনে সহায়তা, শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণাবলি বিকাশ, একে অপরের সহিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও অল্প সময়ে করা সম্ভব হয়।

মিশ্র যোগ্যতার ক্ষেত্রে একজন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী অপরের সহায়তায় সহজে একটি বিষয় আয়ত্ত করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। ফলে পাঠদান কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়। এ ছাড়া সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্ব, সক্রিয়তা, ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা বেশ সার্থক হয়। কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারে। এ ছাড়া সতীর্থ শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জড়তা কেটে যায় এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সতীর্থ শিখন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দলগত কাজ- সম্মিলিত শিখন (জনসন এন্ড জনসন)

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা তখনই সবচেয়ে ভালো হয় যখন তারা সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে থাকে। যে কোনো শিক্ষণ পদ্ধতি অপেক্ষা ছোট ছোট দলে কাজ করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়বস্তু শিখানো হলে তা তারা ভালোভাবে শিখতে পারে এবং শিখন স্থায়ী হয়। এই প্রকার শিক্ষণকে একাধিক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন– সহযোগিতাপূর্ণ শিখন সম্পর্কিত শিখন, দলগত শিখন, দলগত কাজ (জনসন এন্ড জনসন এবং স্মিথ ১৯৯১)। শিখনের ক্ষেত্রে দলগত কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এমন অনেক বিষয় আছে যা শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করার চেয়ে সহপাঠীকে জিজ্ঞাসা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শ্রেণিতে কোনো বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনায় সময় শিক্ষার্থীকে পাঠ সংশ্লিষ্ট নানা রকম কাজ দিয়ে দলগতভাবে তাদেরকে ব্যস্ত রাখবেন। শিক্ষার্থী হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। যে পদ্ধতিতে একাধিক শিক্ষার্থী একত্রে দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা কিংবা হাতে-কলমের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জ্ঞান লাভের সুযোগ পায় তাকে দলগত কাজ বলে।

দলগত কাজের প্রয়োজনীয়তা

দলে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, মিথস্ক্রিয়া ও সহযোগিতা প্রদান করে শিক্ষা অর্জন করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, শ্রেণি কার্যক্রমে সকলে সক্রিয় হয় এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের ধৈর্য এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, অপরকে শ্রদ্ধাকরণ, সহনশীলতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলিও বিকশিত হয়। শ্রেণিকক্ষে কাজের মাধ্যমে শিখন ঘটে ফলে শিখন স্থায়ী ও আনন্দদায়ক হয়। সবার প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত হয় এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।

দল গঠনের শর্ত

দলগত কাজের সফলতা নির্ভর করে দলগঠনের উপর। দলগঠন যদি যথাযথ না হয় তাহলে দলগত কাজের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। দলগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু শর্ত থাকতে হবে। যেমন–

- মেধার সমন্বয় করে দল গঠন করতে হবে।
- দলে সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থীর মিশ্রণ থাকবে।
- ক্ষেত্রবিশেষে সমগোত্রীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করতে হয়।
- ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন গোত্রীয় শিক্ষার্থীদের মিশ্রণে দল গঠন করা যেতে পারে।
- দলে ভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয় থাকলে মিথস্ক্রিয়া বেশি হয়।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দলগত কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা এবং সমস্যাগুলো দূরীকরণের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বিরাজমান সমস্যা

- প্রায় ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস দলগত কাজের উপযোগী নয়।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।
- প্রশিক্ষণ আছে কিন্তু শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা।
- শ্রেণিতে স্থানের অপ্রতুলতা।
- কিছু শিক্ষক, কিছু সহকর্মী, কিছু স্কুল প্রশাসক, কিছু অভিভাবকের নেতিবাচক মনোভাব।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাবল শিফটের বিদ্যালয়গুলোতে পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ৩০-৪০ মিনিটি হয় যা দলগত কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।

সমস্যা দূরীকরণের পদক্ষেপ

বাংলাদেশের অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দলগত কাজের পরিবেশ না থাকলেও দলগঠনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যম দলগঠনের বিরাজমান সমস্যার সমাধান সম্ভব–

- স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক, অভিভাবকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির মাধ্যমে।
- সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে।
- সঠিকভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে।
- সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল ববহারের মাধ্যমে।
- TQI, SESIP, SEQAEP ইত্যাদি প্রজেক্ট ও BRAC কর্তৃক আয়োজিত In-service training programme এর মাধ্যমে।
- In-service প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে।
- বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে।
- বিএড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ধরনের দলগত কাজ করালে ধরে নেওয়া যায় যে পঠন-পাঠন শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ হবে।

৩.২ : বিমূর্ত জ্ঞানমূলক দক্ষতা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলীয় চেতনা, সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ ও কনসেপ্ট ম্যাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা (Metacognitive Skill)

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা বোঝার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রথমে বিমূর্ত বিষয়টি কী সে সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। শিক্ষা অভিধানে Abstract-কে বলা হয়েছে এভাবে– Abstract considered apart from any particular or concrete object, expressing a quality as independent of any particularly qualified object.

সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১১-১২ বছরের নীচের শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত চিন্তা বা কল্পনা করতে পুরোপুরি পারে না। ১১-১২ বছরের পর আস্তে আস্তে বিমূর্ত চিন্তাশক্তি অর্জন করতে শুরু করে। এ রকম জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকের বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতার প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানী মিচেল ও বেয়ার্ড এ রকম দক্ষতার প্রয়োগের কথা বলেছেন যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত চিন্তাকে বিকশিত করা সম্ভব।

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা বলতে এমন এক দক্ষতাকে বোঝায়, যে দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত চিন্তা করতে শেখায়, যে বিষয়বস্তুর কোনো মূর্ত রূপ নেই, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধু কল্পনায় তাকে বিশ্বাস করে নিতে হয়। এ রকম বিষয়বস্তুর শিখনে শিক্ষকের যে দক্ষতা সহায়তা করে তাকে বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা বলা হয়।

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতার রূপরেখা

যদি শিক্ষার্থীরা বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা প্রাপ্ত হয় অথবা তারা যদি তাদের পারগতা, আচরণকে সর্বোচ্চ কর্মসম্পাদনের জন্য পরিবর্তন করতে সমর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই অনেকগুলো কাজ করতে সমর্থ হবে। মনোবিজ্ঞানী Vockell-এর মতে, শিক্ষার্থীদের জন্য বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতার রূপরেখা নিম্নরূপ–

- তারা অবশ্যই তাদের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া মনিটর করার যোগ্য হবে।
- ভাসাভাসাভাবে কাজ শেষ হয়েছে মনে করার সঙ্গে সাদামাটা কৌশল ব্যবহার থেকে নিজেদের বিরত রাখার যোগ্য হবে।
- তাদের আবশ্যিকভাবে পর্যাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তি থাকবে।
- শিক্ষার্থীরা অবশ্যই একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং কিছু নিয়মকানুন আচরণ করবে যা জ্ঞানমূলক কৌশল ব্যবহারে সহায়ক হবে।
- নতুন পরিস্থিতিতে সঠিক কৌশল প্রয়োগের নিমিত্তে তাদের চিন্তন কৌশল স্থানান্তরের যোগ্যতা/মানসিকতা থাকবে।

বিমূর্ত শিখন

বিমূর্ত শিখন কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা সুনির্দিষ্ট কোনো অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত নয়। যে কোনো ধারণা বা প্রতীক সম্পর্কে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া (সূক্ষ্ম চিন্তনের মাধ্যমে) ব্যক্ত করার সাথে সম্পর্কিত।

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। ধাপগুলো হলো–

১. শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর সমগ্র পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা।
২. সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে চায়।
৩. শিক্ষার্থীরা সমস্যাটি সমাধানের জন্য এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। এটি হলো শিক্ষার্থীদের সংগঠনের প্রচেষ্টা।
৪. সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের কাছে যেগুলো অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। এ ধাপেই হঠাৎ করে তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হবে। বিমূর্ত জ্ঞানগুলো তাদের মূর্তরূপ নিয়ে ধরা দেবে এবং তারা তখন অন্য সকল প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে এর মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং তাদের শিখন অর্জিত হবে।

শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করবে। শিক্ষক তার বিমূর্ত জ্ঞানমূলক দক্ষতা দ্বারা শিক্ষার্থীদের কল্পনা করতে শেখাবে, বড় বড় মনীষী, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিজ্ঞানী অথবা দার্শনিকরা যে পরিবেশে চিন্তাভাবনা করে সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন সেই পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বিমূর্তজ্ঞান অর্জনে সহযোগিতা করবেন। কোনো বিষয়বস্তুর সারমর্ম শিক্ষক বলে দেবেন না। তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের পরিবেশ তৈরি করে দেবেন, যেই পরিবেশে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করে বিমূর্ত জ্ঞানের ধারণা স্পষ্ট করবে। এই দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেও শিখন পরিস্থিতির সক্রিয় অংশ হয়ে যায়।

বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতার উন্নয়ন

আত্মপরিবীক্ষণ জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার (Self-monitoring process) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। এটি যেভাবে করা যায়–

- শিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে তারা নোট নিতে পারে।
- অনলাইন বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভাবনা ও কার্যক্রমের উপর প্রতিফলন করতে পারে।
- নির্দিষ্ট মানদণ্ড সংবলিত তালিকা বা বিধান দ্বারা নিজেদের আচরণ ও কাজের এবং তাদের সমকক্ষ সহপাঠীদের (Peer) আচরণ ও কাজের তুলনা করতে পারে।

এ সমস্ত কাজের অনেকগুলো সহজেই শিখন পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের ও অন্যান্য কাজের সমালোচনা ও বিভিন্ন কৌশলের তুলনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে যাতে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের কাজ মানানসই বা তা ছাড়িয়ে গেছে কিনা তা খুঁজে বের করতে পারে।

বিমূর্তজ্ঞানমূলক চিন্তন দক্ষতার মডেল

বিমূর্তজ্ঞানমূলক চিন্তন দক্ষতার মডেল অনুযায়ী প্রথম স্তরে শিখনের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। কারণ শিখনের বৈশিষ্ট্যই হলো শিখন প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এ পর্যায়ে যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে তার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত শিখন কৌশল নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত শিখন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে পরিবীক্ষণের কৌশল ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এরপর ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং মূল্যায়ন কৌশলের ব্যবহার করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনে পুনরায় শিখনের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই চক্রটি এভাবেই চলতে থাকায় এটিকে বিমূর্তজ্ঞানমূলক চিন্তন দক্ষতার মডেল হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

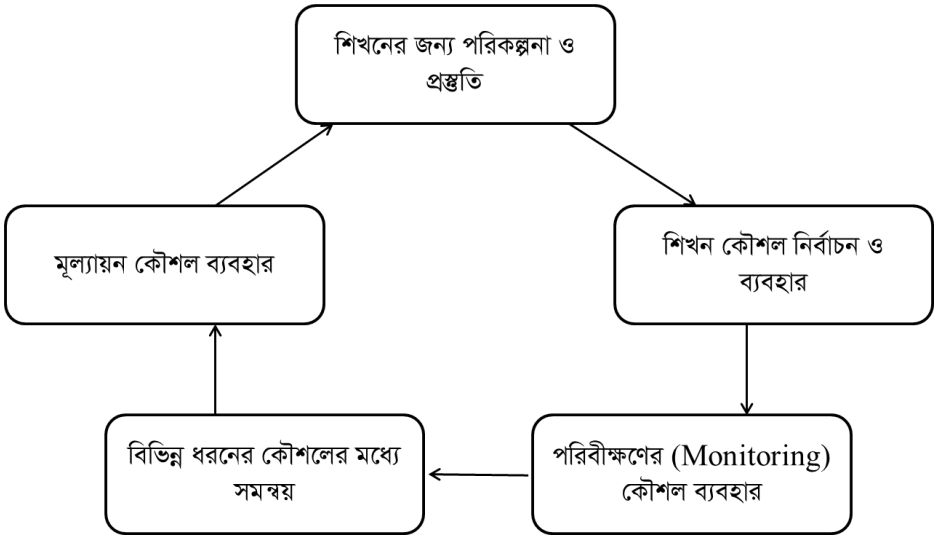

চিত্র : বিমূর্তজ্ঞানমূলক চিন্তন দক্ষতার মডেল

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে দলগত চেতনা, সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

শিক্ষার তাৎপর্য, শিক্ষাদান পদ্ধতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান পরিবর্তন হয়েছে শিক্ষার তাৎপর্যের সাথে সমতা রেখে। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর জোর করে তার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব চাপিয়ে দেবেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবেন শিক্ষার্থীর পাশে তার সহায়ক হিসেবে। শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের তা হলেই শিক্ষা কার্যক্রম সার্থক হবে। শিক্ষকের অবস্থানের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি তার দায়িত্বেরও পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষর্থীদের মধ্যে দলগত চেতনা গড়ে তুলতে হবে। অংগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত আলোচনা, সহযোগিতামূলক শিখন, সতীর্থ শিক্ষণ, অণুশিক্ষণ, ভূমিকাভিনয়, পোস্টবক্স, জিগ্‌স, অবিরাম পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

শিক্ষাদানের মতো একটি জটিল প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করা আবশ্যক। শ্রেণি পাঠদানকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যে কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন পাঠদানের নতুন নতুন ধারণা ও কলাকৌশল আয়ত্তকরণ। শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করেন যেগুলোকেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলা হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের সাফল্য ও কার্যকারিতা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। এ জন্য আগে থেকেই তিনি একটি পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনা মাফিক তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই পাঠদান কার্যক্রম সার্থক হবে এবং পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত চেতনা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি মর্যাদাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, ধৈর্যশীলতা জাগ্রত হবে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হলে পাঠদান আরও কার্যকর হয়ে ওঠে। পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আচরণিক উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা নির্ণয় করার জন্যও শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতি ও কলা-কৌশল অনুসরণ করা আবশ্যক। শ্রেণিতে শিক্ষক কী পড়াবেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কীভাবে পড়াবেন তাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পাঠ উপস্থাপন এমনভাবে হওয়া চাই যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হয় এবং পাঠের বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করে পাঠদানে আধুনিক পদ্ধতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কছে উপস্থাপন করা আবশ্যক। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একদিকে যেমন দলগত চেতনা বৃদ্ধিপায় অন্যদিকে তারা অপরের চিন্তার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়। একে অপরের পরিপূরক এই মনোভাবকে মাথায় রেখে তারা পাঠে অংশগ্রহণে সক্রিয় হয়।

বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ বা কনসেপ্ট ম্যাপের যথোপযুক্ত ব্যবহার

বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনের জন্য যেসব পদ্ধতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে সেগুলোর মধ্যে মাইন্ডম্যাপ বা কনসেপ্ট ম্যাপ পদ্ধতি অন্যতম। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যায় অন্যদিকে তাদের পঠন-পাঠনে সক্রিয় করেও রাখা সম্ভব। এ জন্যই এটি পঠন-পাঠন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাইন্ড ম্যাপিং

শ্রেণিকক্ষে শিখন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান পদ্ধতির কৌশল হিসেবে Mind mapping কৌশলটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করে তোলে এবং শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এই কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রেণি পাঠদানে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে এই কৌশলটি খুবই কার্যকর। এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার এক অনন্য সুযোগ লাভ করে। এই কৌশল প্রয়োগে শিক্ষক বোর্ডে বিভিন্ন 'শব্দ' লিখতে পারেন। অতঃপর লিখিত শব্দের সাথে অর্থবোধক সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য অন্যান্য 'শব্দ' বলার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। এ ছাড়া শিক্ষক এমন কোনো চিত্র বা ছবির অংশবিশেষ শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন যা দেখে শিক্ষার্থীরা ওই চিত্র বা ছবির সম্পূর্ণকরণ করার চেষ্টা করতে পারে। উল্লেখ্য 'শব্দ' 'চিত্র' 'ছবি' ইত্যাদি পাঠ সংশ্লিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিমূর্ত চিন্তনমূলক দক্ষতা অর্জনে মাইন্ডম্যাপ অন্যতম এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাইন্ডম্যাপের প্রকারভেদ

- পিকটোরিয়াল (Pictorial) বা চিত্রে প্রকাশিত ধারণা চিত্র।
- স্পাইডার বা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ রেখা সংবলিত ধারণা চিত্র।
- চেইন বা শিকলের ন্যায় ধারণা চিত্র।

মাইন্ডম্যাপের সুবিধাসমূহ

- শিখন স্থায়ী রূপ লাভ করে।
- বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট হয়।
- বিষয়বস্তু বিমূর্ত থেকে মূর্ত রূপ পায়।
- সকল শিক্ষার্থী এতে সক্রিয় থাকে।
- অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয়কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যায়।
- স্বল্প সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি শিখতে পারে।
- শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে।

মাইন্ডম্যাপের অসুবিধাসমূহ

- ভুল তথ্য আসতে পারে।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায় না।
- অনেক তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে এটি প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Participatory approaches) কী?
(খ) সতীর্থ শিখন বলতে কী বোঝায়?

২. (ক) মাইন্ড ম্যাপিং প্রয়োগের কৌশলগুলো লিখুন।
(গ) শ্রেণিকক্ষে ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিমূর্তজ্ঞানমূলক দক্ষতা বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন?
২. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে কীভাবে দলগত চেতনা সৃষ্টি করা যায় বর্ণনা করুন।
৩. সতীর্থদের চিন্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আপনি কোনো্ কোনো্ বিষয়ের প্রতি যত্নবান হবেন মতামত দিন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

রায়, সুশীল, মূল্যায়ন: নীতি ও কৌশল (১৯৯৫), সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ- ১১৯।

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৬১-৬৫।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ: শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল-১ ও ৩), টিকিউআই, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

ইউনিট ৪ : পরিমাপ, মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৪.১: পরিমাপ, শিখনযাচাই ও মূল্যায়নের ধারণা

৪.২: গাঠনিক (ধারাবাহিক) ও সামষ্টিক (প্রান্তিক) শিখনযাচাই

৪.৩: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই

৪.৪: আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের (ক্ষেত্র বিশেষে অভীক্ষা) নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য: স্বচ্ছতা, যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা।

ইউনিট ৪ : পরিমাপ, মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতির পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব। তাই এর সাহায্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, আবেগিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

এই ইউনিটে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে–

৪.১: পরিমাপ, শিখনযাচাই ও মূল্যায়নের ধারণা

৪.২: গাঠনিক (ধারাবাহিক) ও সামষ্টিক (প্রান্তিক) শিখনযাচাই

৪.৩: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই

৪.৪: আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের (ক্ষেত্র বিশেষে অভীক্ষা) নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য: স্বচ্ছতা, যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা।

৪.১ : পরিমাপ, শিখনযাচাই ও মূল্যায়নের ধারণা

পরিমাপ (Measurement)

পরিমাপ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো 'কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা' কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞানে ইংরেজি Measurement শব্দটির অর্থ Quantification of test result. অর্থাৎ অভীক্ষার ফলের পরিমাণগত প্রকাশ। শিক্ষায় পরিমাপ বলতে শিক্ষার্থীর কোনো অর্জিত জ্ঞান বা কোনো বিশেষ দক্ষতা বা কোনো শক্তির বিশেষ দিকটির পরিমাপ বোঝায়। যেমন একজন শিক্ষার্থী গণিতে ৮৫ নম্বর পেল। এই যে নম্বর প্রদানের প্রক্রিয়া এটি পরিমাপ। সাধারণ অর্থে পরিমাপ হলো যে কোনো ঘটনাবলিতে অর্থপূর্ণ এবং সঙ্গতরূপে সাংকেতিক চিহ্ন বা সংখ্যামূলক সংকেত প্রদান করার প্রক্রিয়া। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানিগণ বিভিন্নভাবে পরিমাপকে সংজ্ঞায়িত করেছেন পরিমাপ সম্পর্কিত কয়েকজন মনীষীর প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

হেলমস্টেডটর (Helmstadter) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপ্তির সংখ্যামূলক বর্ণনার প্রক্রিয়াকে পরিমাপ বলে।' (Measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing processes characteristic)।

আর.এন. প্যাটেল (R.N. Patel) এর মতে, 'পরিমাপ হলো, একটি ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া যা যে কোনো মূল্য আরোপের বেলায় একটি সংখ্যাসূচক জড়িত করে।' (Measurement is an act or process that involves the assignment of the numerical index to whatever is being assessed)।

এস.এস. স্টিভেন্স (S.S. Stevens) বলেন, 'কোনো নিশ্চিত স্বীকৃত নিয়মাবলি অনুসারে বস্তুগুলোকে সংখ্যা প্রদানের প্রক্রিয়া হলো পরিমাপ।' (Measurement is the process of assigning numbers to objects according to certain agreed rules)।

শিক্ষায় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে পরিমাপ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিমাপের ব্যবহার করা হয়ে থাকে গুরুত্বের সঙ্গে। যদিও পরিমাপের বেশ কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার কতকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যা শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবর্তন আনে, এ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য যদি ক্রমাগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সঠিকভাবে অর্জিত হয় না। নিচে পরিমাপের কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো–

- **শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য পরিমাপ :** বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে পরিমাপ তা জানতে সাহায্য করে।
- **শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের তুলনা :** এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সাথে সমপর্যায়ভুক্ত অন্য শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের তুলনা করা যায়।
- **শিক্ষার্থীর নিজস্ব উন্নতি সম্পর্কে অবহিতকরণ :** পরিমাপ দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব উন্নতি বা অবনতি সম্পর্কে অবহিত করা যায়।
- **শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিমাপ :** শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কতটা অর্জিত হলো তা পরিমাপের সাহায্যে জানা যায় ।
- **মূল্যায়নে সহায়তা :** পরিমাপ মূল্যায়নের একটি স্তর বিশেষ। এটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

শিখনযাচাই (Assessment)

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হলো শিখনযাচাই। বিভিন্ন ধরনের শিখনযাচাই কৌশল যেমন– নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট প্রদান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন-শেখানোর অগ্রগতি যাচাই করা হয়। কোনো শিক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে কী শিখল তা যাচাই করার জন্য শিখনযাচাই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি যথার্থ ধারণা গঠনে সমর্থ হন। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর শিখনের নানা ধরনের সমস্যা বা অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে থাকেন। এ কারণে শিখনযাচাই শিক্ষার্থীর শিখনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

শিখন যাচাইয়ের বিবেচ্য দিক

শিখন যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে–

- নিয়মিত হাজিরা পর্যালোচনা।
- যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা।
- হাতের সুন্দর লেখা।
- উচ্চতর চিন্তন ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ।
- সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।
- মৌখিক প্রশ্নোত্তর।
- বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা যাচাই।
- দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।
- শারীরিক-মানসিক-সামাজিক বিকাশ।

শিখন যাচাইয়ের ফলাফলের ব্যবহার

পাঠদানের ক্ষেত্রে–

- শিক্ষকের পাঠদান কার্যকর করা।
- শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান পরিকল্পনা করা।
- অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক পাঠদান করা।

পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে–

- শিক্ষার্থীকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া।
- অকৃতকার্যতার সংখ্যা হ্রাস করা।
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে–

- পূর্বসময়ের সাথে তুলনা করা।
- প্রতিবেশি স্কুলের সাথে তুলনা করা।
- নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ।
- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর দলগঠন করার ভিত্তি।
- শিক্ষাক্রম পুনঃপ্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রাপ্তি।

শিখন যাচাইয়ের নির্ধারক (হাতিয়ার)
শিখন যাচাইয়ের নির্ধারকগুলো নিম্নরূপ–

• কাগজ-কলমে পরীক্ষা	• স্ব-মূল্যায়ন
• বিশেষ পরীক্ষা	• শারীরিক ইতিহাস
• শারীরিক পরীক্ষা	• পর্যবেক্ষণ
• কেইস স্টাডি	• সাক্ষাৎকার
• শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দ্রব্য	• প্রশ্নোত্তর
• কর্ম অভিজ্ঞতা	• পারিবারিক সম্পর্ক
• শিক্ষার্থীর নিজস্ব রচনা ও সাহিত্য	• শ্রেণি রেকর্ড
• যাচাই তালিকা	• পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্য
• ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড	• উপস্থিত রেকর্ড
• বিশেষ ঘটনার রেকর্ড	• আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া

শিখন-শেখানোয় শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা
শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর কয়েকটি গুরুত্ব তুলে ধরা হলো–

- শিখন যাচাইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সামর্থ্য ও দক্ষতা আবিষ্কার করা যায় এবং কী ধরনের শিক্ষা বা কাজ তার পক্ষে উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।
- উপযুক্ত শিখনযাচাই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির পরিমাপ করা যায় এবং তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয়।
- বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দুর্বলতা যাচাই করা যায় এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।
- এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।
- শিখনযাচাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

মূল্যায়ন শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা। (Act of placing value on something)। বিভিন্ন শিক্ষাবিজ্ঞানী মূল্যায়নকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন। যেমন–

টাকম্যান (Tukman) বলেছেন, যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো কার্যক্রমে বিবৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে বা মানের উৎকর্ষতা অনুযায়ী কার্যক্রমটির কার্যপ্রক্রিয়া বা ফল কতটুকু সন্তোষজনক তা পরীক্ষা করা যায় তাকে মূল্যায়ন বলে।
স্টাফল্‌বিম (Stufflebeam) বলেছেন, মূল্যায়ন হলো সিদ্ধান্তের বিকল্প সমূহের বিচার বা বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যলাভ, বর্ণনা ও তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া। (Evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives).
সুশীল রায় বলেছেন, 'যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্য ও পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা বিচার করা হয় তাই হলো মূল্যায়ন।'

মূল্যায়নের স্বরূপ (Nature of Evaluation)
কুইলেন (Quillen) ও হান্না (Hanna)-এর মতে মূল্যায়নের স্বরূপ হলো–

- মূল্যায়ন শিশুর আচরণ সম্যকভাবে নির্ণয় করে।
- মূল্যায়ন শিশুর নিয়ত পরিবর্তনশীল বুদ্ধির পরিমাপ করে।
- এটি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নততর করে।
- মূল্যায়ন একদিকে বিবরণবহুল এবং অন্যদিকে সংখ্যামানে প্রকাশ করে।
- এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Evaluation)

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। পরিমাপের তুলনায় এর পরিধি ব্যাপক এবং উদ্দেশ্যও বহুবিধ। মূল্যায়নের কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো–

- শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষামূলক সুপরিচালনা।
- বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা।
- ব্যক্তিগত সুপরিচালনা।
- বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মসূচির কার্যকারিতা বিচার করা।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করা।

মূল্যায়নের মৌলিক নীতি (Basic Principles of Evaluation)

মূল্যায়ন একটি বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া। এর কার্যকারিতা কতকগুলো মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো–

- মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করা।
- মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব পরিমাপের প্রাসঙ্গিক হবে।
- বিভিন্ন রকম মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
- মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

শিক্ষায় মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতির পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব। তাই এর সাহায্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক, আবেগিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল উদ্ভাবন সম্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক নিচে দেওয়া হলো–

- শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সাহায্য করা।
- পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন।
- পদ্ধতির অগ্রগতির তুলনা।
- শিক্ষামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা।
- শিক্ষাক্রম সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা।
- শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধান।
- সংস্কারমূলক শিক্ষণ পরিকল্পনা।
- পরিমাপ কৌশলের কার্যকারিতা বিচার।

মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ

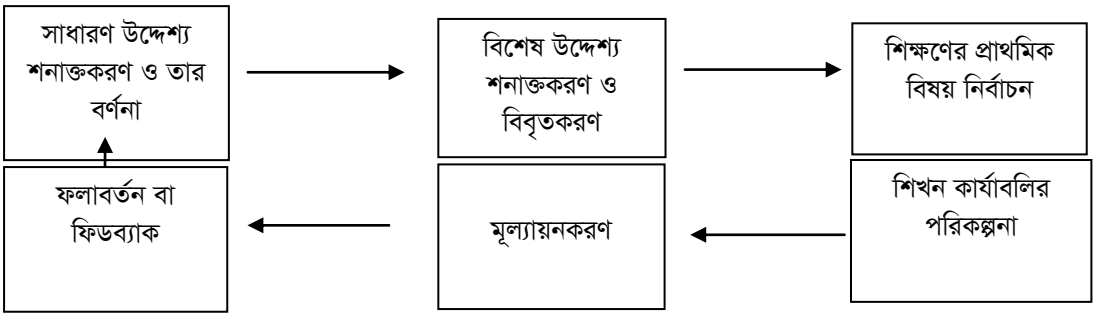

মূল্যায়ন একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া

শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। মূল্যায়নেরও বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। সে জন্য বলা হয়, মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই জটিল প্রক্রিয়া অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করার জন্য শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করা হয়। আর এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ফলাফলের মান বিচারকরণের জন্য সার্বিক গুণসম্পন্ন কৌশল প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে Benjamin Bloom বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন কৌশল এই তিনটি হলো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক।' তিনি এই তিনটি উপাদানকে একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুতে কল্পনা করেছেন। এই ত্রিভুজের শীর্ষ কোণে রয়েছে উদ্দেশ্য এবং অপর দুটি কৌণিক বিন্দুর একটিতে আছে শিখন অভিজ্ঞতা ও অন্যটিতে আছে মূল্যায়ন কৌশল। একে বলা হয় মূল্যায়নের ত্রিভুজ (Triangle of Evaluation)।

চিত্র : মূল্যায়নের ত্রিভুজ

মূল্যায়ন একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে–

- শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- শ্রেণিকক্ষে কতটা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করা উচিত তার সীমানা নির্দেশ করা যায়।
- শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু সফল হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়।

৪.২ : গাঠনিক (ধারাবাহিক) ও সামষ্টিক (প্রান্তিক) শিখনযাচাই

গাঠনিক (ধারাবাহিক) মূল্যায়ন

শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল উপাদান, পদ্ধতি, কৌশল ও এর কার্যকারিতা যাচাই করে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার জন্য যে যাচাই করা হয়, তাকে গাঠনিক (ধারাবাহিক) মূল্যায়ন বলে। এই ধরনের যাচাই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত চলবে।

Page & Thomas তাদের International Dictionary of Education-এ গঠনকালীন মূল্যায়ন সম্পর্কে বলেছেন, "যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তন বা ফিডব্যাকের মাধ্যমে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাকে উন্নত করতে চায় যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম, তাকে গঠনকালীন মূল্যায়ন বা গাঠনিক মূল্যায়ন বলা হয়।" (Assessment which seeks to improve the learning/teaching system by feedback of information from test results which can illustrate the effectiveness of teaching methods or highest learning difficulties). এ ধরনের মূল্যায়নকে ধারাবাহিক মূল্যায়নও বলা হয়ে থাকে।

Ruth Sutton তার æAssessment: A Frame work for Teachers" গ্রন্থে বলেছেন, গঠনকালীন মূল্যায়ন হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় অথবা কোনো নির্দিষ্ট কাজকে পরিচালনা করা যায়। (Formative assessment is an on going process, conducted both formally and informally, by which information and evidence about a child's learning is absorbed and used to plan the next step, or guide through a given task).

John W Best & James V Kahn তাঁদের 'Research in Education' গ্রন্থে বলেছেন, "গঠনকালীন মূল্যায়ন হলো, একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনকালীন পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, কোনো নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হলো, তার মাত্রা নিরূপণ এবং পূর্ণ ও সফল শিখন ঘটাতে কতটুকু বাকি থাকল তা সুনির্দিষ্টকরণ।" (Formative evaluation is an on going continuous process. The main purpose of formative evaluation is to determine the degree of mastery of a given learning task and to pinpoint the part of the task not mastered.)

গঠনকালীন মূল্যায়নের শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণিকক্ষে একজন ব্যস্ত শিক্ষক তার পেশাগত সক্রিয়তা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং শিক্ষণ উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করার জন্য প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। একজন শিক্ষক গঠনকালীন মূল্যায়নকে নানাভাবে বিভক্ত করতে পারেন, যেমন–

- শ্রেণির কাজ (Class work);
- শ্রেণি অভীক্ষা (Class test);
- শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন (Oral question in classroom);
- ষান্মাষিক পরীক্ষা (Six monthly test);
- অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment);
- টার্ম পেপার (Term paper)।

এছাড়াও শিক্ষক প্রতিনিয়ত ফলাবর্তন বা Feedback-এর মাধ্যমে নানা ধরনের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে পারেন। এটি নির্ভর করবে একজন দক্ষ শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির উপর।

ধারাবাহিক/গঠনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব

গঠনকালীন মূল্যায়ন শিক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন–

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠনকালীন মূল্যায়ন সাহায্য করে।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।
- এটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলে। গঠনকালীন মূল্যায়ন ব্যতীত শিক্ষক কার্যকরভাবে তার শিক্ষণকর্ম পরিচালনা করতে পারেন না।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিস্তৃত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হন যা সামষ্টিক মূল্যায়নের সহায়ক।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচিকে পরিচালনা করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

গঠনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর অনেক ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন–

- শিক্ষক যদি খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হন এবং প্রাত্যহিক ফলাবর্তনকে পরিমাপ করতে সক্ষম না হন তাহলে এ ধরনের মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও অনেক সময় পিতামাতা ও অভিভাবকগণ এ ধরনের মূল্যায়নের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না।
- অনেক সময় শিক্ষকের আস্থাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণেও এটি কার্যকর হয় না।

শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন

শ্রেণিকক্ষে একজন ব্যস্ত শিক্ষক প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে তিনি অনেক তথ্য সঞ্চয় করতে পারেন যা তাকে তার পেশাগত সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদানকালে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষার্থীদের নানাভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। তিনি প্রয়োজনবোধে প্রাক-মূল্যায়নও করতে পারেন। প্রাক-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান পরিমাপ করে সেই অনুসারে শিক্ষণ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন কতটা সাধিত হলো তা পরিমাপের উদ্দেশ্যে শিক্ষক এই ধরনের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি, তার জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষমতা পরিমাপের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন করেন।

শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের গুরুত্ব

শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–

- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মসক্রিয় করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের আগ্রহ জন্মে।
- এর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও অসুবিধা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি নির্ণয় করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শনাক্তকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সংস্কার সাধন করা যায়।
- এটি শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগায়।

সামষ্টিক (প্রান্তিক) মূল্যায়ন

শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে কার্যক্রমের সামগ্রিক ফলাফল, প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয়, তাকে সামষ্টিক বা প্রান্তিক (Summative Evaluation) বলে।

Page & Thomas তাঁদের International Dictionary of Education-এ সামষ্টিক মূল্যায়ন এর সংজ্ঞায় বলেছেন, 'কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা বা কর্মকাণ্ডের শেষে এর কার্যকারিতা যাচাইয়ের মূল্যায়নকে সামষ্টিক বা প্রান্তিক মূল্যায়ন বলে।' (Evaluation at the conclusion of any educational plan of activity to determine the effectiveness of the activity).

R.N. Pattel বলেছেন, 'কোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ মূল্যায়ন বা সিদ্ধান্তকে সামষ্টিক মূল্যায়ন বলে।' (Making overall assessment or decision with the programme is a summative evaluation).

Best & Kahn তাদের Research in Education গ্রন্থে বলেছেন, "অধিকাংশ লোক মূল্যায়ন বলতে সামষ্টিক মূল্যায়নের কথাই বিবেচনা করেন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ হলো, গ্রেড নির্ণয়, শিক্ষণ দক্ষতার বিচার ও শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা।" (Summative evaluation is what most people think of when they consider evaluation. Its primary purposes are to determine grades, judge teaching competence and compare curriculum).

সামষ্টিক মূল্যায়নের শ্রেণিবিভাগ

সামষ্টিক মূল্যায়ন নানা ধরনের হতে পারে, যেমন–

- লিখিত পরীক্ষা (Written test)
- মৌখিক পরীক্ষা (Oral test)

লিখিত পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষা আবার দুই রকমের হতে পারে, যথা :

- রচনামূলক (Essay type) এবং
- নৈর্ব্যক্তিক (Objective type)

রচনামূলক অভীক্ষা হতে পারে দুই রকম, যেমন–

- সংক্ষিপ্ত রচনামূলক
- দীর্ঘ রচনামূলক

মৌখিক পরীক্ষা

ভর্তি পরীক্ষা বা এ ধরনের অন্য কোনো পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদিতে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ান্তে অ্যাসাইনমেন্ট অথবা টার্ম পেপারও সামষ্টিক মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।

সামষ্টিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

সামষ্টিক মূল্যায়নের নিম্নরূপ গুরুত্ব রয়েছে–

- কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে তার নির্দেশনা পাওয়া যায়।

- ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় কার্যকর পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি সহায়ক।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি বিবরণী অভিভাবকদের প্রদান করা যায়।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে, শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা কতটুকু এবং শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা এই সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে করা সম্ভব।

সামষ্টিক মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

যদিও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকাণ্ডের একটা সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়, তবুও এর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, যেমন–

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষককে অনেক দক্ষ হতে হয়। তা না হলে সামষ্টিক মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।
- কখনও কখনও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সন্তোষজনক হয় না। অনেক সময় শিক্ষার্থী গঠনকালীন মূল্যায়নে ভালো ফল করলেও সামষ্টিক মূল্যায়নে এসে খারাপ করতে পারে।
- শিক্ষককে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। তা না হলে তিনি সামষ্টিক মূল্যায়নে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতে পারেন।

গঠনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য

গঠনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যায়ন	সামষ্টিক (প্রান্তিক) মূল্যায়ন
• এটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। • শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে। • আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুভাবেই সম্পন্ন হয়। • এ ধরনের মূল্যায়ন সারা বছর ধরেই চলে। • এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ সংশোধনের সুযোগ থাকে। • এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না।	• এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে বা পর্বশেষে বা সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থার মূল্যায়ন করে। • এটি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও অধিকতর উন্নত কার্যক্রম গ্রহণের পথ নির্দেশ করে। • এটি প্রধানত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। • এ ধরনের মূল্যায়ন বছর শেষে একবারই করা হয়। • এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পাঠ সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না। • এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

৪.৩ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, বিরাজিত সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানের উপযুক্ত পথ শনাক্ত করা যায়। এছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ চিত্র সংগ্রহ করার জন্যও নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি করা প্রয়োজন। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে এর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার গুণগত মানের উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে কিনা সেটা জানার জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগত মানের নিয়মিত যাচাই বা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে পড়ালেখার কাজ পরিচালনা করছে তার জন্য প্রতিষ্ঠনাটির তত্ত্বাবধান করা দরকার। আর এ উদ্দেশ্যে শিখনযাচাই করা জরুরি।

সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান (Supervision) বলতে যত্নমূলক বা সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কোনো কাজ তদারক করাকে বোঝায়। শ্রেণি কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট উপায়ে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার অসঙ্গতি ইত্যাদি চিহ্নিত করে সেগুলোর সযত্ন সামাধানের জন্য সহযোগিতামূলক পরামর্শ প্রদান করা যায়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক। শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাময়িক পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করা হয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মুখস্থনির্ভরতা নয় বরং অন্যান্য গুণাবলি অর্জনের মাত্রা যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের শিখন যাচাই করা হয়। নবম ও দশম শ্রেণির শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে শিখনযাচাই করা হয়। তবে এসএসসি পরীক্ষার (পাবলিক) ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক ও সৃজনশীল পরীক্ষার জন্য পৃথক নম্বর বরাদ্দ থাকে। বর্তমানে নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৩০ এবং সৃজনশীল অংশে ৭০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। ব্যবহারিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ও সৃজনশীল পরীক্ষার জন্যও আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ থাকে এবং এর মধ্যে ২৫ নম্বর থাকে ব্যবহারিক কাজের জন্য। আর বহুনির্বাচনি/নৈর্ব্যক্তিক অংশে ২৫ ও সৃজনশীল অংশে ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে অর্জিত কোনো কৃতিত্বের ফল যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সুতরাং শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর বিশেষ দক্ষতা যেগুলো সমাজের সুনাগরিক হিসেবে অর্জন করা অপরিহার্য সেগুলো যাচাই করার পদক্ষেপ নেওয়া। তা ছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আগ্রহ, মনোভাব, সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ, সমস্যা সমাধানে আগ্রহ, কোনো বিষয়ে চিন্তন ক্ষমতা, লেখার স্বকীয়তা বা সৃজনশীলতা, অন্যকে নিজের বোধগম্যতায় স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকাশ ক্ষমতা ইত্যাদি দক্ষতার পরিমাপের উদ্দেশ্যেও শিখনযাচাই করা প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়সমূহ তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই অপরিহার্য।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক স্তরে শিখন যাচাইয়ের (ধারাবাহিক) জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অনুসরণ করা দরকার–

- চিন্তন দক্ষতার বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ গঠন, উদ্ভাবনী ক্ষমতার বৃদ্ধি, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান দক্ষতা তৈরি, নেতৃত্বের বিকাশ, নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনে অভ্যস্ত করে তোলা।

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দশটি পরিমাপক হচ্ছে–

১. ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ।
২. অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি।
৩. শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন।
৪. বক্তব্য উপস্থাপন।
৫. নিয়মানুবর্তিতা।
৬. খেলাধুলায় কৃতিত্ব।
৭. আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা।
৮. নেতৃত্বের গুণাবলি।
৯. বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞান।
১০. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

এই পরিমাপকসমূহকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শিখনক্ষেত্রের ছয়টি দক্ষতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে–

শিখনক্ষেত্র	**দক্ষতা**
শিখনক্ষেত্র-১	• চিন্তন দক্ষতা • সমস্যা সমাধানে দক্ষতা
শিখনক্ষেত্র-২	• ব্যক্তিক দক্ষতা • যোগাযোগ দক্ষতা
শিখনক্ষেত্র-৩	• সহযোগিতামূলক দক্ষতা • সামাজিক দক্ষতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই অত্যন্ত জরুরি। একজন শিক্ষার্থীর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার বাইরে আরও নানা ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন– সমস্যা সমাধানে দক্ষতা, ব্যক্তিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা ইত্যাদি। এ জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। অথচ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে production হয় সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন হয় না।

এর ফলে গুণগত ও মানসম্মত production না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা তদারকি/তত্ত্বাবধানের জন্য শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রিভিসের (Reavis) উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, æThe purpose of supervision is important of institution through direction guidance and training of teachers".

শিখন প্রচেষ্টার উন্নতি সাধন করে বিদ্যালয়ের সার্বিক উদ্দেশ্যকে সফল করতে এবং শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেমন শিখনযাচাই প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তত্ত্বাবধানের। সঠিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনেও তত্ত্বাবধান একটি জরুরি বিষয়। শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যাবলির যথার্থতা নিরূপণ, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ, শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি ও কার্যকর শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় অবলম্বনে শিখনযাচাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি এবং তা অক্ষুণ্ন রেখে ধীরে ধীরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে আধুনিক তত্ত্বাবধানের জন্য শিখন যাচাইয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিখন-শেখানো পরিবেশকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধানের জন্য শিখনযাচাই এতটা গুরুত্ব বহন করে যে এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাণসঞ্চার করে থাকে।

৪.৪ : আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের (ক্ষেত্র বিশেষে অভীক্ষা) নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য : স্বচ্ছতা, যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা

আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের (ক্ষেত্র বিশেষে অভীক্ষা) নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের অন্যতম কৌশল হলো অভীক্ষা। কোনো শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের যথার্থতা নির্ভর করে এর পরিমাপ কৌশলের উপর। তাই অভীক্ষাকে মূল্যায়নের কাজে লাগানোর আগে তার পরিমাপ ক্ষমতা বিচার করা আবশ্যক, অন্যথায় তাকে ব্যবহার করা যাবে না।

যেসব কারণ বা উপাদান কিংবা শর্তের উপর যে কোনো অভীক্ষার পরিমাপ ক্ষমতা কার্যকরভাবে নির্ভর করে তাদের সু-অভীক্ষা/উত্তম শিখন যাচাইয়ের নীতিমালা বা বৈশিষ্ট্য বলে।

সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–

- অভীক্ষার ত্রুটিহীনতাজনিত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং
- অভীক্ষার ব্যবহারিক দিক সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলি।

অভীক্ষার ত্রুটিহীনতাজনিত বৈশিষ্ট্যাবলি

একটি সু-অভীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার ত্রুটিহীনতা। কিন্তু সব সময় একটি অভীক্ষা যে ত্রুটিহীন হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অভীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাপে সাধারণত চার ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো–

১. স্থায়ী বা ধ্রুব ত্রুটি (Constant Error)

যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে, অভীক্ষাটি যদি শুধু তা সঠিকভাবে পরিমাপ না করে একই সঙ্গে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিমাপ করে তাহলে পরিমাপে যে ত্রুটি দেখা যায়, তাকে স্থায়ী বা ধ্রুব ত্রুটি বলে। যেমন– ইতিহাসের অভীক্ষাতে ইতিহাসের জ্ঞান বা উপলব্ধি পরিমাপ করা প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাসের অভীক্ষাতে বানান ভুল বা খারাপ হাতের লেখার জন্য নম্বর কাটা হলে ইতিহাসের সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা যথাযথ নম্বর পাচ্ছে না। এটি এ অভীক্ষার স্থায়ী ত্রুটি।

২. অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল ত্রুটি (Variable Error)

একই অভীক্ষা যদি একদল শিক্ষার্থীর উপর বারবার প্রয়োগ করা হয় এবং সময়ের পরিবর্তনের দরুন যদি অভীক্ষার ফলাফল প্রায়ই ভিন্ন হয়, তাহলে অভীক্ষার এ ধরনের ত্রুটিকে বলা হয় অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল ত্রুটি। অবশ্য এ ধরনের ত্রুটি অভীক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক ভিন্নতা ইত্যাদি কারণে দেখা দিতে পারে।

৩. পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি (Observational Error)

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ পরীক্ষকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিমাপের এ জাতীয় ত্রুটিকে বলা হয় পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি। সু-অভীক্ষার এ ধরনের ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে পারলে অভীক্ষাটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

৪. তাৎপর্য নির্ণয় সংক্রান্ত ত্রুটি (Error of Interpretation)

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের স্কেলে কোনো শূন্য বিন্দু নেই। এ ছাড়া এককগুলো সমদূরত্বে অবস্থিত কিনা সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। এ কারণে প্রাপ্ত স্কোর বা নম্বরের তাৎপর্য নির্ণয়ে ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত একই স্কোরের মান ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিমাপের এ ধরনের ত্রুটিকে তাৎপর্য নির্ণয় সংক্রান্ত ত্রুটি বলে।

অভীক্ষার ব্যবহারিক দিক সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলি

কোনো অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করার পূর্বে তার ব্যবহারিক অসুবিধাগুলোর কথা বিবেচনা করেই তা নির্বাচন করা উচিত। অভীক্ষার ব্যবহারিক দিক সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

প্রয়োগশীলতা

কোনো অভীক্ষার প্রয়োগ সম্পর্কিত কাজ যদি সহজ, সরল ও ত্রুটিমুক্ত হয় তাহলে বলা চলে যে, অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা আছে। অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা যাচাইয়ের জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। যথা :

- অভীক্ষার কারিগরি সংগঠন (Mechanical make up of the test)
- অভীক্ষার প্রয়োগ পদ্ধতি (Method of administering the test)
- উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান পদ্ধতি (Method of Scoring the answer scripts)
- প্রাপ্ত নম্বরের তাৎপর্য নির্ণয় (Interpreting the score)

পরিমিততা (Economy)

স্বল্প ব্যয়ে, সীমিত সময়ে এবং পরিমিত পরিশ্রমে যদি অভীক্ষা প্রণয়ন, প্রয়োগ, উত্তরপত্র যাচাই এবং প্রাপ্ত নম্বরের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়, তাহলে বলা যায় অভীক্ষাটির পরিমিততা রয়েছে।

সম্পূর্ণতা (Adequacy)

কোনো অভীক্ষার প্রয়োগ ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করা, স্কোরগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা ও তুলনীয়তাকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করা যায়, তাহলে বলা চলে অভীক্ষাটির সম্পূর্ণতা রয়েছে।

সুতরাং সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা চলে যে, অভীক্ষা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যথা :

- অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test)
- অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of test)
- অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of test)
- অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardization of test)
- অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা (Administrability of test)
- অভীক্ষার পরিমিততা (Economy of the test)
- অভীক্ষার সম্পূর্ণতা (Adequacy of the test)
- অভীক্ষার মান নির্ণয়ের সরলতা (Ease of scoring of test)

অভীক্ষার স্বচ্ছতা

অভীক্ষার স্বচ্ছতা বলতে বোঝায় স্পষ্টতা। আর কোনো কিছুর স্পষ্টতা বলতে বোঝায় সুস্পষ্টতা। সুস্পষ্টতা বলতে এখানে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রয়োগ, মূল্যায়ন, পরীক্ষক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যেককেই বোঝানো হয়ে থাকে। এসব কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই একটি নীতির মধ্যে থাকবেন এবং এর মধ্যে যুক্তিহীনতা, একঘেয়েমিতা, আবেগ থাকবে না। অভীক্ষা হবে সুস্পষ্ট। অভীক্ষা শুরুর পূর্বে ও পরে এর নীতিতে যেন কোনো পার্থক্য না থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অভীক্ষা হবে সহজবোধ্য, নির্ভুল, পরিমিত ও সন্দেহহীন।

অভীক্ষার স্বচ্ছতার উপায়

কোনো অভীক্ষা স্বচ্ছ কিনা তা যাচাই করে প্রয়োগ করা উচিত। এ জন্য নিম্নবর্ণিত দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে–

- অভীক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।
- বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী অভীক্ষার কাঠিন্যের মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান।
- অভীক্ষার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।
- মূল্যায়ন নীতিমালা অনুযায়ী মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
- অভীক্ষা তৈরিকারীর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
- মূল্যায়নের নীতিমালা জানা থাকতে হবে।
- অভীক্ষার প্রশ্ন সহজ থেকে কঠিনের দিকে নিয়ে যাওয়া।
- অভীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্নের মান নির্ধারণ করা।
- অভীক্ষা নির্ভুল হতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় উপযোগী অভীক্ষা তৈরি করতে হবে।

অভীক্ষার যথার্থতা

কোনো একটি অভীক্ষার দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাওয়া হয়েছে, অভীক্ষাটি যদি তাই পরিমাপ করে, তবে বলা যায় অভীক্ষাটি যথার্থ। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অভীক্ষাটি কতটা তা পরিমাপ করে, তার মাত্রাই হলো অভীক্ষার যথার্থতার বৈশিষ্ট্য।

- যথার্থতা অভীক্ষার বিশেষ গুণ। একে অভীক্ষার যথার্থতা না বলে প্রাপ্ত পরিমাপের যথার্থতা বলাই যুক্তিসঙ্গত।
- এটি মাত্রাসাপেক্ষ। কোনো অভীক্ষাকে পুরোপুরি যথার্থ বা যথার্থ নয় এ কথা বলা সঠিক নয়। শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চমানের যথার্থতা, মধ্যমানের যথার্থতা, নিম্নমানের যথার্থতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এ যথার্থতার মাত্রা বোঝানোর জন্য ০ থেকে ১ এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যামান ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষামূলক অভীক্ষার যথার্থতা বিচার করার সময় তার উপযোগিতা বা প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়।
- কোনো অভীক্ষার যথার্থতা অভীক্ষাটির উপরও নির্ভরশীল। অর্থাৎ যথার্থতা অভীক্ষার্থীদের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক।

শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থতার তাৎপর্য সঠিকভাবে বিচার করতে হলে এ সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

অভীক্ষার যথার্থতার হ্রাসের কারণ

অভীক্ষার যথার্থতার নানাবিধ কারণে হ্রাস পেতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো–

অভীক্ষার ত্রুটির কারণে যথার্থতা হ্রাস

- **ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশ :** কোনো অভীক্ষার নির্দেশপত্র যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় বা কীভাবে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে হবে তা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়।
- **ত্রুটিপূর্ণ ভাষা :** অভীক্ষায় ব্যবহৃত ত্রুটিপূর্ণ ভাষার কারণেও যথার্থতা হ্রাস পায়। প্রশ্নপত্রে এমন ভাষা ব্যবহার করা হলো যার অর্থ শিক্ষার্থীদের জানা নেই। এসব ক্ষেত্রে যথার্থতা হ্রাস পায়।
- **প্রশ্নের কাঠিন্যের তারতম্য :** অভীক্ষায় ব্যবহৃত সমস্যাগুলো যদি খুব সহজ বা খুব কঠিন হয়, তাহলে যথার্থতা হ্রাস পায়। তাই কাঠিন্যমান অনুযায়ী প্রশ্ন অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সাংগঠনিক ত্রুটি

কোনো অভীক্ষায় সাংগঠনিক ত্রুটি থাকলে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলোতেই উত্তর সংকেত দেওয়া থাকলে সেসব ক্ষেত্রে যথার্থতা হ্রাস পায়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান পরিমাপের চেয়ে মানসিক সতর্কতাই পরিমাপ করা হয়।

প্রশ্নাবলির বিষয়বস্তুর প্রকৃতির দরুন যথার্থতা হ্রাস

উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে না পারলে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়। পঠিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বোধগম্যতার স্তর, জ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্যসমূহের সঠিক বিচারকরণের অভাবে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়।

শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার কারণে যথার্থতা হ্রাস

- **মানসিক অবস্থা :** শিক্ষার্থীরা অভীক্ষা গ্রহণের সময় প্রাক্ষোভিক দিক থেকে বিচলিত হয়ে পড়লে অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাস পায়।
- **প্রতিক্রিয়া প্রবণতা :** শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে গিয়ে একটি বিশেষ প্রবণতার বশবর্তী হয়ে কাজ করে। সঠিক উত্তর যখন তাদের জানা না থাকে, তখন তারাও এ বিশেষ প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয়। একে প্রতিক্রিয়া প্রবণতা বলে।

অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণ দূরীকরণের উপায়

- **সুস্পষ্ট নির্দেশনা :** অভীক্ষার নির্দেশনা হতে হবে সুস্পষ্ট যেন পরীক্ষার্থী তা পড়েই বুঝতে পারে কীভাবে সে উত্তর দেবে।
- **সহজবোধ্য ভাষা :** প্রশ্নের ভাষা হতে হবে পরীক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী। বাক্যের গঠন হবে সরল এবং অজানা বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- **খুব সহজ অথবা খুব কঠিন প্রশ্ন বাতিল :** অভীক্ষার জন্য খুব সহজ এবং খুব কঠিন প্রশ্ন বাতিল করতে হবে।
- **সমগ্র পাঠ্যসূচি ও শিক্ষণের উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন :** সমগ্র পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে হবে।
- **পরীক্ষাভীতি দূরীকরণ ও মানসিকভাবে প্রস্তুতকরণ :** পরীক্ষার্থীদের মন থেকে অযথা পরীক্ষাভীতি দূর করতে হবে এবং অভীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এ কারণে মাঝে মাঝে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
- **সন্তোষজনক আসন ব্যবস্থা :** পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- **দূষণমুক্ত পরিবেশ :** পরীক্ষার্থীরা যে পরিবেশে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেখানকার পরিবেশ শব্দ বা বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

যথার্থতার শ্রেণিবিভাগ

কোনো অভীক্ষার স্থায়ী ত্রুটি থাকলে তা দূর করার জন্য অভীক্ষাটির যথার্থতার গুণটি একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত চার ধরনের যথার্থতা নির্ণয় করা হয়। এ চার ধরনের যথার্থতার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় এবং কীভাবে এগুলো নির্ণয় করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

- বাহ্যিক যথার্থতা (Face validity)
- বিষয়গত যথার্থতা (Content validity)
- ভবিষ্যতের ইঙ্গিতমূলক যথার্থতা (Predictive validity)
- সংগঠনমূলক যথার্থতা (Construct validity)

বাহ্যিক যথার্থতা

অভীক্ষার বাহ্যিক যথার্থতা বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটি যে বৈশিষ্ট্য বা শক্তি পরিমাপের জন্য গঠিত অভীক্ষাটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটা সে বৈশিষ্ট্য বা শক্তির সামঞ্জস্য আছে। এ ধরনের যথার্থতার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো যে এটি সত্যিকারের নৈর্ব্যক্তিক নয় এবং তার ফলে বৈজ্ঞানিক কাজে এটির প্রয়োগ করা যায় না। বাহ্যিক যথার্থতার ক্ষেত্রে অভীক্ষা রচয়িতা তার ব্যক্তিগত ধারণার সাহায্যে নির্ণয় করেন অভীক্ষাটির বিষয়বস্তু কতটা পরিমেয় বৈশিষ্ট্য বা শক্তির পরিমাপ করল। তিনি অভীক্ষাটি ভালো করে পড়ে বিচার করেন যে অভীক্ষার পদগুলো কতটা ওই বৈশিষ্ট্য বা শক্তিটি পরিমাপ করেছে। এ ধরনের বাহ্যিক যথার্থায়ন মোটেই বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

বিষয়গত যথার্থতা

কোনো অভীক্ষার বিষয়গত যথার্থতা বলতে বোঝায় যে, অভীক্ষাটি কতটা ব্যাপক হারে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান এবং বিষয়বস্তু পাঠের উদ্দেশ্যগুলো পরিমাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। অভীক্ষার প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রশ্নগুলো সমগ্র পাঠের মধ্য থেকে হয়। আবার প্রশ্নগুলো এমন হতে হবে যাতে শিখনের উদ্দেশ্যগুলো পরিমাপ করতে পারে। এ জন্য যে বিষয়ের অভীক্ষা তৈরি করতে হবে সে বিষয়ের সমগ্র পাঠ্যসূচিকে কয়েকটি এককে ভাগ করতে হবে। পরে শিখনের উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করতে হবে। মনে করা যাক, শিখনের উদ্দেশ্য বিষয়-জ্ঞান বৃদ্ধি, ধারণা গঠন এবং জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতা বিকাশ। তাহলে প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য কোনো এককে প্রশ্ন থাকবে তাও ঠিক করে নিতে হবে।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিতমূলক যথার্থতা

একটি অভীক্ষা কতটা সঠিকভাবে কোনো ভবিষ্যৎ পারদর্শিতা বিচার করতে পারে, তা বোঝানোর জন্য অভীক্ষা বা অভীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের যে যথার্থতা নির্ণয় করা হয় তাকে বলে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতমূলক যথার্থতা। এ জাতীয় যথার্থতা নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য সফলতা বা ব্যর্থতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সংগঠনমূলক যথার্থতা

সংগঠন বা Construct কথাটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন কোনো মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয় তখন মনে রাখতে হবে সেই মানসিক বৈশিষ্ট্যটি একটি Construct বা সংগঠন বিশেষ। যন্ত্রমূলক শক্তি, সঙ্গীতমূলক শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক বা মানবীয় বৈশিষ্ট্য। ওই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করবে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা এই সংগঠনের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত থাকে। সে জন্য কোনো অভীক্ষার সংগঠনমূলক যথার্থতা নির্ণয় করা একটু জটিল এবং এর পদ্ধতিটিও অত্যন্ত বিস্তৃত।

কোনো একটি অভীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলকে যে হারে কোনো একটি মনোবৈজ্ঞানিক সংগঠনের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে, তাকে বলা হবে সংগঠনমূলক যথার্থতা। সংগঠনমূলক যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কর্নব্যাক ও মিহল নিম্নলিখিত স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন–

- অভীক্ষাটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
- ওই বৈশিষ্ট্য থাকলে ব্যক্তি কী রকম আচরণ করে তা নির্ধারণ করা হয়।
- অভীক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির আচরণের কতটা মিল আছে তা নির্ধারণ করা হয়।
- ব্যক্তির আচরণ ও অভীক্ষার মধ্যে একটা উচ্চ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে অভীক্ষাটির সংগঠনমূলক যথার্থতা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা

কোনো একটি অভীক্ষা যা পরিমাপ করে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণভাবে করে তার মাত্রাকে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলে।

বৈশিষ্ট্য

- সাধারণ অর্থে নির্ভরযোগ্যতা হলো অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা। প্রকৃত অর্থে এটা বিচার করা হয় না।
- নির্ভরযোগ্যতার ধারণা স্থির নয়। তাই এর তাৎপর্য বিভিন্ন রকম।
- অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা যথার্থতার মতো যুক্তিনির্ভর ও গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় না।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

- অভীক্ষা নির্ভর কারণ।
- পরীক্ষার্থী নির্ভর কারণ।
- পরীক্ষক নির্ভর কারণ।

অভীক্ষা নির্ভর কারণ

সাংগঠনিক ত্রুটির কারণে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। যেমন–

- **অভীক্ষার দৈর্ঘ্য :** অভীক্ষার দৈর্ঘ্য কম বা বেশি হলে এটা হ্রাস পায়। প্রশ্নের সংখ্যা কম হলে ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। প্রশ্ন সংখ্যা বেশি হলে পরীক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তি ঘটে।
- **অসামঞ্জস্য অভীক্ষা পদ :** প্রশ্ন খুব বেশি সহজ বা কঠিন হলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়। কারণ সহজ প্রশ্নের উত্তর সবাই দিতে পারে এবং অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। ফলে অভীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
- **উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন :** উদ্দেশ্যহীন প্রশ্নের কারণে পরীক্ষার্থীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :** অভীক্ষার মধ্যে যদি ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকে যা পরীক্ষার্থীকে প্রাক্ষোভিক দিক থেকে থেকে বিচলিত করে তোলে, তাহলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **অনুমানযোগ্য অভীক্ষাপদ :** প্রশ্নগুলো যদি অনুমানের উপর নির্ভর করে আংশিক উত্তর দেওয়া যায়, তবে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

পরীক্ষা নির্ভর কারণ

অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর নানা ধরনের ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। যেমন–

- **প্রস্তুতির অভাব :** মানসিক প্রস্তুতির অভাব থাকলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **মানসিক অস্থিরতা :** অভীক্ষা প্রয়োগকালে পরীক্ষার্থীর মানসিক চঞ্চলতার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **নির্দেশনা না বোঝা :** অভীক্ষার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার কৌশল ও প্রশ্নপত্রের নির্দেশ না বোঝার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **দৈহিক অসুস্থতা :** পরীক্ষার্থীর দৈহিক অসুস্থতার কারণে অনেক সময় নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

পরীক্ষক নির্ভর কারণ

পরীক্ষকের কিছু ত্রুটির কারণে নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। যেমন–

- **ব্যক্তিগত প্রভাব :** পরীক্ষক যদি তার ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দকে উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের জন্য আরোপ করেন তবে নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।
- **অভিজ্ঞতার প্রভাব :** অনেক সময় অভীক্ষাটি প্রয়োগের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকায় পরীক্ষক অভীক্ষাটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না।
- **পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব :** কোনো অভীক্ষা প্রয়োগের পূর্বে যদি পরীক্ষার্থীদের সাথে কোনোরূপ মানসিক বন্ধন স্থাপন করা না যায় তাহলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

অভীক্ষা নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ দূরীকরণের উপায়

- **অভীক্ষার দৈর্ঘ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা :** প্রশ্নের দৈর্ঘ্য যেন পর্যাপ্ত হয় অর্থাৎ কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন যেন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্ন না ঘটায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- **প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা নির্ণয় :** প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন যেন খুব বেশি কঠিন কিংবা খুব বেশি সহজ না হয়।
- **একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না ঘটে :** ভাষা বা গঠনের কারণে যাতে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- **পরীক্ষার্থীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা :** অভীক্ষা গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষার্থীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।
- **পরীক্ষকের নিরপেক্ষতা :** পরীক্ষকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং কারও প্রতি বিশেষ সহানুভূতির কারণে উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান যেন প্রভাবিত না হয়।
- **উপযুক্ত পরীক্ষক নিয়োগ :** উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরীক্ষককে উত্তরপত্র পরীক্ষণের দায়িত্ব দিতে হবে।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

- পুনঃনিরীক্ষা পদ্ধতি।
- সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি।
- খণ্ডিতার্ধ পদ্ধতি।
- অন্তর্পদীয় সঙ্গতিমূলক পদ্ধতি।

পুনঃনিরীক্ষা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর অল্পদিনের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করে যে দুগুচ্ছ স্কোর পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অনুবন্ধ (Correlation) নির্ণয় করা হয়। এ অনুবন্ধের মাধ্যমে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রকাশ করা হয়।

এ পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের খুব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে অভীক্ষা দুবার প্রয়োগের ফলে প্রথমবারের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বারের নম্বরে প্রভাব ফেলে। যদি অভীক্ষা দুবার প্রয়োগের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে তাহলে মধ্যবর্তী সময়ে নতুন শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বারের নম্বরকে প্রভাবিত করে।

সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একই সঙ্গে দুটি অভীক্ষা তৈরি করা হয় যার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, কাঠিন্য ও বিন্যাসের দিক থেকে সদৃশ্য ও সমান্তরাল থাকে এবং এ অভীক্ষা দুটিকে একদল শিক্ষার্থীর উপর দুবার প্রয়োগ করা হয়। অভীক্ষা দুটি থেকে প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক বা অনুবন্ধ সহগ নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত মান সমান্তরাল দুটি অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রকাশ করে। ১৯৩৭ সালে স্ট্যানফোর্ড সংস্করণে বুদ্ধি অভীক্ষায় এ রকম দুটি সমান্তরাল অভীক্ষা গঠন করে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়েছিল।

এ পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতে প্রথম অভীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বারের নম্বরের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

খণ্ডিতার্ধ পদ্ধতি

পুনঃপরীক্ষণ পদ্ধতি এবং সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করলে যে সকল ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, তা আসলে অভীক্ষাটি দুইবার প্রয়োগের ফলে হয়ে থাকে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে খণ্ডিতার্ধ পদ্ধতি বলে।

অন্তর্পদীয় সঙ্গতিমূলক পদ্ধতি

খণ্ডিতার্ধ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অভীক্ষাটি দুভাগে ভাগ করা প্রকৃতপক্ষে একটি কঠিন সমস্যা। এ অসুবিধা দূর করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে অন্তর্পদীয় সঙ্গতিমূলক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে বাস্তবে অভীক্ষাটিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় না। যুক্তিনির্ভর গাণিতিক পদ্ধতিতে অর্ধদ্বিখণ্ডের অনুমানে খণ্ডাংশের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যায়।

অভীক্ষকের ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা

অভীক্ষা ব্যবস্থাপক অভীক্ষা ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে যে দক্ষতাগুলো প্রয়োগ করেন সেগুলোকেই ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা বলে। একজন অভীক্ষকের ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভালো মূল্যযাচাইয়ের জন্য অভীক্ষকের পূর্বপরিকল্পনা থাকতে হবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অভীক্ষা প্রণয়নের কাজ কে করবে, কে তদারকি করবে এবং কাজটি শেষ হওয়ার পর এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যবস্থাপককে ভাবতে হবে। কীভাবে কাজটিকে ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেটা নিয়েও অভীক্ষার ব্যবস্থাপককে ভাবতে হবে।

অভীক্ষকের ব্যবস্থাপনাগত গুণাবলি

- কর্মদক্ষতা
- সময়ানুবর্তিতা
- ধৈর্যশীল
- কাজের অভিজ্ঞতা
- বিষয়গত জ্ঞান
- সহনশীল
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ
- কাজের আগ্রহ
- প্রশিক্ষণ।

অভীক্ষকের ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা

- নির্দেশনা যোগ্যতা
- যোগাযোগের যোগ্যতা
- নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা
- সংগঠনের যোগ্যতা
- পরিকল্পনা প্রণয়নের যোগ্যতা
- সমন্বয়ের যোগ্যতা
- অভীক্ষা প্রণয়ন ও প্রয়োগের যোগ্যতা
- প্রয়োগবিধি সহজ ও স্পষ্ট করার যোগ্যতা
- মূল্যায়নের যোগ্যতা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তির আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন। এই পরিবর্তন কতটা সাধিত হয়েছে তা জানতে হলে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মূল্যায়নের সাথে পরীক্ষা, অভীক্ষা, পরিমাপ ইত্যাদি শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) পরিমাপ বলতে কী বোঝায়?
(খ) মূল্যায়নের সংজ্ঞা লিখুন।
(গ) শিখন যাচাইয়ের ধারণা দিন।

২. (ক) গঠনকালীন (ধারাবাহিক) ও সামষ্টিক (প্রান্তিক) শিখনযাচাই কী?
(খ) গঠনকালীন শিখন যাচাইয়ের শ্রেণিবিভাগ করুন।
(গ) গঠনকালীন ও সামষ্টিক শিখন যাচাইয়ের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখুন।

৩. (ক) সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
(খ) অভীক্ষার যথার্থতা কী?
(গ) অভীক্ষার যথার্থতার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) আদর্শ/উত্তম শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নীতিমালাগুলোর বর্ণনা দিন।
(খ) অভীক্ষকের ব্যবস্থাপনাগত গুণাবলি ও যোগ্যতাগুলো লিখুন।

২. (ক) অভীক্ষার যথার্থতার শ্রেণিবিভাগ করুন।
(খ) অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণগুলো শনাক্ত করে এদের প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন।

৩. (ক) অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?
(খ) অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
(গ) অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণগুলো শনাক্ত করে এসবের প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

রায়, সুশীল, মূল্যায়ন : নীতি ও কৌশল (১৯৯৫), সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ- ১১৯।

তপন, ডঃ শাহজাহান ও অন্যান্য, শিক্ষা মূল্যায়ন : নীতি ও ব্যবহারিক দিক, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ১৯৯৭ পৃ- ১০৮।

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৬১-৬৫।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ : শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল-১ ও ৩), টিকিউআই, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

Page and Thomas, International Dictionary of Education, Kogan Page, London/ Nichols Publishing Company, New York 1978.

Patel R.N Education, Theory and Practice, Himalaya Publishing House, Bombay, Delhi, Nagpur, 1992, Page- 176.

Best, John W & Kahn, James V, Research in Education (Seventh Edition, 2001), Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi.

ইউনিট ৫ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিরাজমান শিখনযাচাই কার্যক্রম

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৫.১ : জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা

৫.২ : শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই এবং শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতার শিখনযাচাই

৫.৩ : শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তনের শিখনযাচাই

৫.৪ : পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক নির্দেশনা বা কৌশলের মাধ্যমে শিখনযাচাই

৫.৫ : মানদণ্ডভিত্তিক শিখনযাচাই– একটি বিকল্প পন্থা

৫.৬ : শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নত করার জন্য শিখনযাচাই।

ইউনিট ৫ : বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিরাজমান শিখনযাচাই কার্যক্রম

অনুষ্ঠিতব্য যে কোনো পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে দুটি বিষয় অবশ্যই বুঝে নেওয়া দরকার। তা হলো পরীক্ষা কী এবং পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়।

এই ইউনিটে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে–

৫.১: জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা
৫.২: শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই এবং শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতার শিখনযাচাই
৫.৩: শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তনের শিখনযাচাই
৫.৪: পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক নির্দেশনা বা কৌশলের মাধ্যমে শিখনযাচাই
৫.৫: মানদণ্ডভিত্তিক শিখনযাচাই– একটি বিকল্প পন্থা
৫.৬: শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নত করার জন্য শিখনযাচাই।

৫.১ : জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা

জেএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা

শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন-শেখানো (Teaching-learning) প্রক্রিয়া শেষে শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্য অর্জনে অর্থাৎ কৃতিত্ব, সাফল্য ও যোগ্যতার মান ও পরিমাপগত বিবেচনায় কতটা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে তা নির্ধারণের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিই হলো পরীক্ষা।

পরীক্ষার নানা রকম সময়, পদ্ধতি ও ভিন্নতা রয়েছে। মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন পরীক্ষা পদ্ধতির দুটি অপরিহার্য দিক। কার্যপরিসর ও বৈশিষ্ট্য ভিন্নতায় এ দুটির একেকটি একেক রকম।

প্রচলিত ধারা ও সীমাবদ্ধ অর্থে পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা হয়। সে অর্থে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রচলিত কৌশল বা প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিকে সাধারণত পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রচলিত পদ্ধতিই পরীক্ষা।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কৃতিত্ব যাচাই ও পরিমাপের জন্য পরীক্ষা অন্যতম মানদণ্ড বা পরিমাপক হিসেবে কাজ করে থাকে। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পরীক্ষার মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যায়। এমনকি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা অর্থাৎ শ্রেণি কার্যক্রমের মান বোঝা যায়।

যে কোনো কর্মপ্রবাহের মতো পরীক্ষা মাত্রই কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আমাদের মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাগুলোরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্য হলো কোনো কিছুর কর্মগুণ। কর্মসম্পাদনের শক্তি যোগ্যতা এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে একটি কর্মসম্পাদনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্যের যথার্থতাই প্রক্রিয়া হিসেবে পরীক্ষার ভালো-মন্দ যোগ্যতার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এ দিক থেকে বলা যায়, পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য যে কোনো অর্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জন এবং কার্যকারিতায় সাফল্য ও পিছিয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হলো শিক্ষাক্রম। পরীক্ষা তার মান ও ব্যবহারে যত আধুনিক, প্রশংসনীয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্নই হোক না কেন মাঠ পর্যায়ের কাজে তা কতটা ব্যবহারযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও লাগসই সেটাই প্রধান বিবেচ্য দিক।

২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। এর ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমেও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ২০১২ সালে সম্পূর্ণ নতুন করে সাজানো হয়েছে এ শিক্ষাক্রম।

বর্তমানে প্রচলিত ২০১২ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং দশম শ্রেণি শেষে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু রয়েছে। এ দুটি পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়ে থাকে। অপরদিকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা শেষে গ্রহণ করা হয় উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা। এটিও পাবলিক পরীক্ষা।

যে কোনো কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে ওই কার্যক্রম সম্পর্কে যথোচিত পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ পূর্বপরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন এ রকম একটি কর্মচক্র একাধিকবার সম্পাদন করে তবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজ করতে হয়। শিক্ষাক্রমকে এক ধরনের instrument বলা যায় যা কাজে লাগালেই এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কাজ করবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা থেকে ফল প্রকাশ এবং ফলাফল বৈশিষ্ট্য পুরো পরিবৃত্তটি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমের প্রধানতম একটি মাপদণ্ড বা প্যারামিটার। এককভাবে হলেও পরীক্ষার ফলাফল এ প্রেক্ষাপটে ব্যর্থ ও সফলতার অনেক অর্থবহ বার্তা দিয়ে থাকে। জেএসসি পরীক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

- অষ্টম শ্রেণি শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে এটিকে জেএসসি পরীক্ষা বলা হয়।
- শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এটি একটি পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পরিচালিত হয়।
- এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বেই শিক্ষার্থীদের জন্য এটি প্রথম পাবলিক পরীক্ষা।
- নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৭টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। যার আলোকে জেএসসি পরীক্ষায় মোট দশটি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- যেসব বিষয়ে জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো– বাংলা-১ম পত্র, বাংলা-২য় পত্র, ইংরেজি-১ম পত্র, ইংরেজি-২য় পত্র, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, গণিত, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/পালি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।
- পরীক্ষার্থীদের সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনি উভয় ধরনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে হয়।
- জেএসসি পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি (MCQ) অংশে ৩০ নম্বর এবং সৃজনশীল (CQ) অংশে ৭০ নম্বরের পরীক্ষা হয়।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের নম্বরপত্রে উল্লেখ থাকবে।
- এই পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।
- এই পরীক্ষা পাসের সনদপত্রে লিখিত জন্মতারিখ শিক্ষার্থীর পরবর্তী শিক্ষাসহ সবক্ষেত্রে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এই পরীক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- এ পরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হয়।
- পরবর্তী পরীক্ষার সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি হ্রাস করায় জেএসসি পরীক্ষা অত্যন্ত কার্যকর।
- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে সহায়ক।
- এই পরীক্ষা পাশের পর শিক্ষার্থীরা সাধারণ কাজ করার উপযোগী হিসেবে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার গুণগত মান যাচাই করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে কী শিখে এসেছে তা যাচাই করা যায়।
- এই পরীক্ষার সনদপত্র যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।
- জেএসসি পরীক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার (Gateway to Professional Life) হিসেবে বর্ণনা করা যায়।
- এই পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জেএসসি পরীক্ষার এসব বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাক্রম গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এই পরীক্ষাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেএসসি পরীক্ষা চালুর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে পড়ালেখার বিষয়বস্তু মুখস্থ করার অভ্যাস গড়ে না উঠে বরং তারা যাতে কিছু করার মাধ্যমে শিখতে পারে সেভাবেই এই পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করা হয়।

এসএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলির পর্যালোচনা

বাংলাদেশে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে চিরকাল বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ এটি শিক্ষার্থীদের পরবর্তী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে কেবল তারাই পরবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। এই পরীক্ষার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়–

- দশ বছরব্যাপী শিক্ষা সমাপনান্তে অর্থাৎ দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে এটি প্রথম পরীক্ষা।
- এই পরীক্ষা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়।
- এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষার্থীদের স্কুল পর্যায়ে গৃহীত নির্বাচনি বা টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।
- এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়।
- মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি শাখায় এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রত্যেক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলো হলো, বাংলা ১ম ও ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র, গণিত, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্যারিয়ার শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা।
- বিজ্ঞান শাখার জন্য যেসব বিষয় আবশ্যিক সেগুলো হলো, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।
- মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলো হলো, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ভূগোল ও পরিবেশ, অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা, বিজ্ঞান।
- ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলো হলো, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, বিজ্ঞান।
- মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট বিষয়গুলো থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করতে পারে।
- এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত না করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা হবে। এই বৈশিষ্ট্যটি ২০১৮ সালের পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে।
- ২০১৮ সালের এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণির ১ম সাময়িক ও প্রাক্-নির্বাচনি পরীক্ষায় ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বরের গড় শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।
- ২০১৯ সাল থেকে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নবম শ্রেণিতে ১ম ও ২য় সাময়িক এবং দশম শ্রেণির ১ম সাময়িক ও প্রাক্-নির্বাচনি পরীক্ষাসহ মোট ৪ বার রেকর্ড সংরক্ষণ করে তার গড় নম্বর শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।
- বহুনির্বাচনি (MCQ) এবং সৃজনশীল/রচনামূলক (CQ) প্রশ্নপদ্ধতির মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- বহুনির্বাচনি/নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) অংশের জন্য ৩০ নম্বর এবং সৃজনশীল/রচনামূলক (CQ) অংশের জন্য ৭০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। তবে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর, বহুনির্বাচনি অংশে ২৫ নম্বর এবং সৃজনশীল অংশের জন্য ৫০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।
- একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়), বহুনির্বাচনি ও ব্যবহারিক অংশে পৃথকভাবে পাস করতে হয়।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।
- এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরবর্তী উচ্চশিক্ষা নির্বাচন নির্ভরশীল।
- পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে।
- নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী নবম থেকে দশম শ্রেণির ২৭টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। যার আলোকে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণদের শিক্ষাবোর্ড থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যা পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রদর্শন করতে হয়।

এইচএসসি পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বর্তমানে দশম শ্রেণির শিক্ষা শেষে শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণে যে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালিত হয় তা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষা হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে। একইভাবে এসএসসি পরবর্তী দুই বছরব্যাপী অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সেটি হলো উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা এইচএসসি পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটিও দেশব্যাপী শিক্ষাবোর্ডের অধীনে একযোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিচে এইচএসসি পরীক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

- এটি একটি পাবলিক পরীক্ষা।
- এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর শিক্ষার্থীরা পরবর্তী দুই বছরব্যাপী পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার পর এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় গমনের সুযোগ ঘটে।
- বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল/রচনামূলক প্রশ্নপদ্ধতির মাধ্যমে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- মানবিক, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি শাখায় বিষয়ভিত্তিক এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৩০ নম্বরের বহুনির্বাচনি (MCQ) পরীক্ষার ক্ষেত্রে সময় ৩০ মিনিট এবং ৭০ নম্বরের সৃজনশীল (CQ) পরীক্ষার ক্ষেত্রে সময় বরাদ্দ থাকে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
- ব্যবহারিক বিষয় সম্বলিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২৫ নম্বরের বহুনির্বাচনি (MCQ) অংশের জন্য ২৫ মিনিট এবং ৫০ নম্বরের সৃজনশীল (CQ) অংশের জন্য ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকে।
- পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে।
- এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পেশামুখী উচ্চশিক্ষা নির্বাচন করতে পারে। যেমন– তারা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষি শিক্ষাসহ আরও নানামুখী পেশাগত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে। একই সঙ্গে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে সব ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।
- এই পরীক্ষা পাসের সনদপত্রের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

৫.২ : শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই ও শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতার শিখনযাচাই

শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই

ব্যক্তিসত্তায় প্রচুর মেধাসম্ভাবনা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এ পৃথিবীতে আসে। এ সম্ভাবনা ব্যক্তির মাথা, মন ও দেহে সুপ্ত (latent) অবস্থায় থাকে। মেধাসম্ভাবনা মাথারটি বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক; মনেরটি আবেগীয় এবং দেহেরটি হলো কৌশলবিষয়ক। এগুলোকে 3H দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। এখানে জ্ঞানমূলক হলো Head, আবেগীয় হলো Heart আর মনোপেশীজ বলতে Hand বোঝানো হয়েছে। অবস্থান বিবেচনায় মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সম্ভাবনাকে ৩টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)
২. আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective Domain) এবং
৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)।

যে কোনো পরিবর্তন অপরিহার্যভাবে কোনো না কোনো প্রক্রিয়া, প্রভাব ও পরিচর্যামূলক কর্মকাণ্ডের পরিণতি। বীজ থেকে অংকুর, অংকুর থেকে বিশাল বৃক্ষ, স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতা, সুপ্ততা থেকে বিকাশন যে পরিবর্তনই হোক সেখানে আড়ালে হলেও অব্যাহত ও অগ্রসরমান কোনো প্রচেষ্টা চলমান থাকে। প্রচেষ্টা ও ফসল (process & product) বলে একটি সিদ্ধ বাক্যই রয়েছে। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষার প্রক্রিয়াগত প্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা শিখনফল (Learning outcome) হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে ইংরেজি Education শব্দের উৎপত্তি। Education শব্দের অর্থই হলো মেধার সম্ভাবনা বা সুপ্ত অবস্থাকে পরিচর্যা ও লালন করে বাস্তবতায় রূপান্তর করা।

শিখন একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মস্তিষ্ক খাটিয়ে কোনো কিছু শিখতে হয়। শিক্ষার্থীদের শেখানোর ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় শিখনের। বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওই বিষয়বস্তুকে তার নিজস্ব বিশেষ কৌশল বা পদ্ধতিতে (Mechanism) প্রক্রিয়াজাত করে ফেলে। বিষয়বস্তুর এ প্রক্রিয়াজাত উৎপাদনটিই (Product) হলো এক কথায় শিখন (Learning)। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

বিষয়বস্তু ⟶ মস্তিষ্ক ⟶ শিখন

(কাঁচাসামগ্রী) প্র ক্রি য়া (উৎপাদন)

এ প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের কাজ বা সক্রিয়তা যত বেশি শিখনও তত দ্রুত একটি মজবুত, স্থায়ী ও যথার্থ রূপ গঠন করে। সুইজারল্যান্ডের জীববিজ্ঞানী (পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত) জ্যাঁ পিয়াঁজে (Jean Piaget) তার জ্ঞান বিকাশ মতবাদে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন– 'শিক্ষার্থী সচেষ্ট হলে চিন্তাশক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাকে মস্তিষ্ক ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করে।' শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট এ মানসিক প্রতিক্রিয়ার বাধ্যবাধকতায় ওই শিক্ষার্থীর মাঝে জন্ম নেয় বিষয়বস্তুর একটি নির্দিষ্ট রূপকাঠামো বা প্যাটার্ন। পিয়াঁজে এ প্যাটার্নকে স্কিমা (Schema) বলেছেন। স্কিমা হলো বিষয়বস্তুর শিখনরূপ। অর্থাৎ এটাকে মানসিক আদল বলা যেতে পারে।

বেঞ্জামিন এস ব্লুম (Benjamin Samuel Bloom) বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র অর্থাৎ মস্তিষ্কের সক্রিয়তায় সৃষ্ট শিখনকে তার ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং কার্যকারিতার বিচারে ছয়টি স্তরে ভাগ করেছেন। ব্লুম এ শিখনস্তরকে ব্লুম'স ট্যাক্সোনমি (Bloom's Taxonomy of Educational Objectives) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ব্লুম বর্ণিত শিখনের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের পর্যায়ক্রমিক স্তরগুলো হলো–

১. জ্ঞান (Knowledge)
২. অনুধাবন (Comprehension)
৩. প্রয়োগ (Application)
৪. বিশ্লেষণ (Analysis)
৫. সংশ্লেষণ (Synthesis)
৬. মূল্যায়ন (Evaluation)।

শিখনের প্রধান ২টি বৈশিষ্ট্যের একটি হলো শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন সাধনের সামর্থ্য। শিক্ষার্থী যা শিখবে তা যেন সে লিখতে, বলতে, অন্যকে বোঝাতে, ব্যাখ্যা ইত্যাদি করতে সমর্থ হয় সেভাবেই তার শিখনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো, অর্জিত শিখন অবশ্যই পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যা শিখবে তার বিভিন্নভাবে পরিমাপ ও যাচাই করার উপযোগিতা থাকতে হবে। এটাই হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই। আবার শিক্ষা ও জ্ঞানের স্তর ভিন্নতায় শিখন যাচাইয়ের উপায়, পদ্ধতি বা কৌশলও ভিন্ন হয়ে থাকে। বিস্তৃত পরিসরে এ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

জ্ঞান (Knowledge)

জ্ঞান হলো শিক্ষার্থীর এক ধরনের মানসিক ক্ষমতা যে ক্ষমতার বলে শিক্ষার্থী পূর্বের শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে।

অনুধাবন বা উপলব্ধি (Comprehension)

কোনো বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অনুবাদ ও সংব্যাখ্যান বা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। যেমন– আকাশে কীভাবে মেঘের সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগ (Application)

কোনো ধারণার বিমূর্তকরণে নির্দিষ্ট ও মূর্ত অবস্থায় ব্যবহার বা অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলো প্রয়োগ। যেমন– শিক্ষার্থীরা বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখাতে পারবে। একই সঙ্গে তার পরিমাণও বের করতে পারবে।

এই তিনটি স্তর জ্ঞানমূলক দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী তিনটি অর্থাৎ বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর। এ জন্য এ তিনটি স্তর সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক বলয়ের ৬টি স্তরের প্রথমটি হলো জ্ঞানমূলক বলয়। এই জ্ঞানমূলক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত শেখানোর উদ্দেশ্যগুলো হলো–

- জ্ঞানের স্মরণ;
- চেনা বা শনাক্তকরণ;
- বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ও দক্ষতা;
- কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বা প্যাটার্ন (pattern) এবং সেটিং (setting) স্মরণকরণ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞান হলো শিক্ষার্থীর এমন এক মানসিক ক্ষমতা যে ক্ষমতার বলে শিক্ষার্থী পূর্বের শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে। এই জ্ঞানমূলক বলয়ে থাকে–

- কোনো ঘটনা বা পরিভাষা বা পদ সম্পর্কিত জ্ঞান;
- কোনো নীতি, গতি ও ধারাবাহিকতা শ্রেণিকরণ বা বিভক্তকরণ, কোনো বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান;
- তত্ত্ব ও কাঠামোর নীতি এবং সাধারণীকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান।

শ্রেণিতে শেখানো অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ছবি, তত্ত্ব ও তথ্য, সারণি ইত্যাদি শিক্ষার্থী তার স্মৃতি থেকে বলতে, লিখতে ও বুঝতে পারবে। যেমন– কোনো মনীষীর ছবি, পোর্ট্রেট (portrait) শনাক্ত ও পুরাতাত্ত্বিক কোনো নিদর্শনের মডেল ও নমুনা শনাক্ত করতে পারবে।

জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই

সাধারণত যে সকল কার্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো–

১. শ্রেণির কাজ
২. শ্রেণি অভীক্ষা
৩. বাড়ির কাজ।

শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত সব কাজই শ্রেণির কাজ। এ জন্য শিক্ষকের উচিত প্রতিটি কাজের জন্য নম্বর বরাদ্দ করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক দক্ষতার যাচাই কাজে হাত দেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে যাচাই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

শ্রেণির কাজ

শিখন-শেখানোর কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর সব কাজই শ্রেণির কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত প্রতিটি কাজের নিম্নরূপ উদ্দেশ্য থাকে–

(ক) শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিচার সাধন এবং
(খ) শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

শ্রেণিকক্ষে নিজের পরিচালনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক ও দলগতভাবে নানা ধরনের কাজ করাবেন। এ কাজগুলো হতে পারে–

- কোনো প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা।
- কোনো কিছু উদ্ভাবন (চিত্র, ছবি, মানচিত্র অংকন ইত্যাদি)।
- পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- বিতর্কে অংশগ্রহণ ও প্রদর্শনমূলক কোনো কিছু তৈরি করা।
- ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন।

শিক্ষাক্রমের শিখন–শেখানো কার্যক্রম কলামের শ্রেণির কাজের তালিকা থেকে অবস্থা বিবেচনায় কিছু কাজ নেওয়া যেতে পারে। যেমন–

- শ্রেণিশিক্ষক কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন।
- নানাভাবে উৎসাহ জাগিয়ে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের আচরণের অবস্থা বুঝে শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।
- অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি তাই একই দিনে সবাইকে যাচাই কাজ শেষ না করে বিভিন্ন দিনে সুবিধানুযায়ী যাচাই করবেন।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে এবং শেষে নির্ধারিত পাঠদান উদ্দেশ্য কতটা সফল হলো তা শিক্ষক যাচাই করবেন। সাময়িক পরীক্ষা, মডেল টেস্ট ইত্যাদি কোনো ধরনের অভীক্ষা থাকলে প্রতিটি বিষয়ে নম্বর রেকর্ডভুক্ত করতে হবে। আবার ব্যবহারিক কাজ না থাকলে শ্রেণির কাজে বা শিক্ষার্থীদের বলা, কোনো এবং পড়ার মান বা দক্ষতা যাচাই এবং প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার্থে নির্ধারিত ছক ব্যবহার করবেন। ব্যবহারিক কাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার সময় সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব সারণি এবং বিষয়বস্তু কতটা স্মরণ ও কাজে লাগতে পারছে শিক্ষককে তা যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।

বাড়ির কাজ

পাঠ্যবিষয় সংশ্লিষ্ট শিখনফল কতটা অর্জিত হচ্ছে সেটি যাচাইয়ের জন্যই বাড়ির কাজ করানোর প্রধান লক্ষ্য থাকে। বাড়ির কাজ এমনভাবে দিতে হয় যাতে তা শিক্ষার্থীর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাড়ির কাজ কী হবে তার তালিকা শিক্ষাক্রম থেকে পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা ভালো। কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিশ্চিত হতে চেষ্টা করবেন যে শিক্ষার্থী যাতে নিজে একাই প্রদত্ত বাড়ির কাজটি সম্পন্ন করেছে।

পাঠ্যবিষয়ের শিখনফল অনুযায়ী বাড়ির কাজ দেওয়া উচিত। তবে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ মুখস্থ করায় উৎসাহিত না হয়। শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে যে, শিক্ষার্থী নিজের চিন্তাভাবনা খাটিয়ে বাড়ির কাজটি করে। কারণ এতে জ্ঞানের একটু বাড়তি চর্চা এবং সম্ভাবনামূলক সুযোগ থাকে। শিক্ষককে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থী যেন বাড়ির কাজটি ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারে সে রকম উপযোগী হতে হবে। অর্থাৎ বাড়ির কাজ একটি বা খুব বেশি হলে দুটি কাজ দেওয়া যেতে পারে। তবে কাজের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন সেক্ষেত্রে সময় বিবেচনা করতে হবে। বাড়ির কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা ও অন্যান্য দিকগুলোর সীমাবদ্ধতা শিক্ষককে অবশ্যই শিখন-শেখানোর প্রতি ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতার শিখনযাচাই

গঠনকালীন শিখনের ৬টি স্তরের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই ৩টি স্তর নিয়ে উচ্চতর শিখন-যোগ্যতা গঠিত। এখানে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট শিখন দক্ষতাগুলো আলোচনা করা হলো।

বিশ্লেষণ (Analysis)

কোনো সমগ্র বিষয় বা বস্তুকে বা কোনো একটি সম্পূর্ণ অংশকে তার বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলার ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ বলে।

কোনো একজন শিক্ষার্থী একটি প্রবন্ধ, গল্প, বিষয়বস্তু অথবা ঘটনা শেখার পর যদি এর অংশবিশেষের ভিত্তিতে তা বর্ণনা করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে ওই শিক্ষার্থী বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা অর্জন করেছে।

সংশ্লেষণ (Synthesis)

পূর্ণাঙ্গ কোনো বিষয় বা বস্তু বিশ্লেষণের পর ওই বিষয় বা বস্তুটির পরিপূর্ণ ধারণা কাঠামো তৈরি করার মানসিক সামর্থ্যকে সংশ্লেষণ বলে। পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি সংশ্লেষণ জ্ঞান স্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাশক্তির বিকাশলাভ ঘটে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে অথবা এ বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে শিখন অর্জনের পর শিক্ষার্থী যদি আবহাওয়া বিষয়ক একটি সামগ্রিক ধারণা অথবা একটি মানচিত্র তৈরি করার যোগ্যতা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে বলা যাবে তার সংশ্লেষণ ক্ষমতা বা দক্ষতা হয়েছে।

সংশ্লেষণ স্তরের শিখন অভিজ্ঞতা উচ্চতর শিখন অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে বেশ দৃঢ় ও স্থায়ী। এটি অনুধাবন স্তরের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এবং এটি অনুশীলনের জন্য শক্তিশালী মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

বিশ্লেষণ শিখন স্তরের চেয়েও সংশ্লেষণ স্তরে একত্রে সমস্যা সমাধানে অধিকমাত্রায় মস্তিষ্কের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলা, চিত্র অংকন করতে দেওয়া এ ধরনের নানা রকম কাজের মাধ্যমে সংশ্লেষণ স্তরের শিখন কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা সম্ভব।

মূল্যায়ন (Evaluation)

অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর কোনো কিছুর কতটা বিচারে কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা বা পদ্ধতির বিচার বিবেচনার জ্ঞান মূল্যায়ন শিখনস্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মূল্যায়নকে মূল্যবিচারও বলা যেতে পারে। মূল্যায়ন স্তরে শিখন-শেখানো অর্থাৎ পাঠদান প্রক্রিয়ার পর শিক্ষার্থী এতদসম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ এবং বৈশিষ্ট্যের চুলচেরা ও যথার্থ বিশ্লেষণ করে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করেছে সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়।

মূল্যায়নের শিখন উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ত বিচার করা এবং এসবের মধ্যে কোনোরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা বিচার করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের যদি আবহাওয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠদান করা হয় তাহলে তারা আবহাওয়ার উপাত্তের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ততা বিচার করতে পারবে। এটাই হলো মূল্যায়নের শিখন উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, তারা পাঠদানের বিষয়বস্তুর উপর সূচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক এই দুই ধরনের প্রশ্নের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে কোনোটি উত্তম তার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

এ কারণে বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং চিন্তন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা শিক্ষক নিজেই তৈরি করবেন। সমস্যা সমাধানের তথ্য সংগ্রহ ও কাজের মান যাচাইয়ে পর্যবেক্ষণ দক্ষতা যাচাই ছক, প্রশ্নমালা, সিডিউল ইত্যাদি আগে থেকেই শিক্ষককে প্রস্তুত করে নিতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাজের মান যাচাই করে রেকর্ডভুক্ত করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর শিক্ষার্থীর সাফল্য কতটা এবং কোনো পর্যায়ে তা বের হয়ে আসবে। মোট কথা, শিখনের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করার জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।

৫.৩ : শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তনের শিখনযাচাই

বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে ৩টি বলয় বা Domain এর একটি হলো আবেগিক বা আবেগীয় বলয়। অবশ্য Attitude বা দৃষ্টিভঙ্গি বলয় হিসেবে অধিকাংশ সময় এটিকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

আবেগিক বলয়ের শিখন উদ্দেশ্যসমূহ–

- আগ্রহ (Interest), মনোভাব (Attitude), মূল্যবোধের পরিবর্তন, অনুভূতি, প্রশংসা করার ক্ষমতা ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিকতার বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

এ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিবর্তনের (Attitude change) শিখনমান যাচাই। মনোভাব পরিবর্তনের শিখনযাচাই আলোচনার পূর্বে মনোভাব কী তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মনোভাব

মনোভাব হলো–

- একটি মানসিক অবস্থা।
- কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের মনের পছন্দ, অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি।
- পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়া করার জন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুসংগঠিত হয়ে থাকে।
- কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশের পূর্বপ্রস্তুতি।

এ ছাড়াও মনোভাবকে আরও বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন–

মনোভাব কেবল এক প্রকার মানসিক অবস্থাই নয়, বলা যায় এক ধরনের প্রবণতাও। যে প্রবণতার প্রভাবে ব্যক্তি কোনো বিশেষ উদ্দীপকের মুখোমুখি হলে সে উদ্দীপক অভিমুখী অথবা তার বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। মনোভাবের এই আচরণমুখিতা তার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন– কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনার প্রতি সব সময় আকর্ষণ দেখাতে পারে অথবা অনীহামূলক আচরণও করতে পারে। আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার মাত্রাগত তীব্রতা কমবেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির দিক থেকেও মনোভাবের তারতম্য হতে পারে। এমনকি কোনো বিষয় বা বিষয়বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মনোভাবের পার্থক্য হতে পারে। উদ্দীপকমুখিতার মতো এ মাত্রাগুলোও পরিমাপযোগ্য।

পর্যবেক্ষণ মনোভাব পরিমাপের একটি প্রাচীন ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়।

মনোবিদদের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে মনোভাব ঠিকমতো বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ একটি ভালো পথ। অবশ্য ব্যক্তিগত বিবরণের জন্য শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভর করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকে যায়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত মনোভাব পরিমাপে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ–কৌশল বা পদ্ধতি অধিক নির্ভরযোগ্য। এ ধরনের পর্যবেক্ষণের দ্বারা মনোভাবের গুণগত দিকের পরিমাপ পাওয়া যায়। মনোভাবকে পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপের জন্য মনোভাব অভীক্ষার প্রয়োজন। এসব অভীক্ষায় স্কোর হিসেবে সংখ্যামান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

মনোভাব অভীক্ষায় প্রধানত ৩টি মনোভাব স্কেল ব্যবহার করা হয় যেমন–

- লিকার্টের মনোভাব স্কেল (Likert's Attitude Scale)
- থার্স্টন মনোভাব স্কেল (Thurston Attitude Scale)
- গাটম্যান স্কেল (Guttman Scale)

মনোভাব গঠনের উপাদান

মনোভাব গঠনের উপদান হচ্ছে মানুষ যখন তার সীমাবদ্ধ পরিসরে একই বস্তুর সঙ্গে বারবার খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তখন তার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্মপ্রবণতা এই তিনটি উপাদানই একত্রিত ও সুসংঘবদ্ধ হয়ে একটি মনোদৈহিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাকে বলে মনোভাব। অতএব, ব্যক্তির মনোভাবের উপাদান তিনটি, যথা :

১. জ্ঞান (Knowledge);
২. অনুভূতি (Feelings);
৩. কর্মপ্রবণতা বা ক্রিয়াশীলতা (Action tendency)।

মনোভাবের উপাদানগুলো কীভাবে শিক্ষার্থীদের মনোভাব গঠনে ক্রিয়া করে

ধরা যাক, কোনো শিক্ষকের প্রতি একজন শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এই মনোভাবের জ্ঞানমূলক উপাদানের মধ্যে শিক্ষকের জ্ঞান, বিষয়বস্তু বোঝানোর ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুভূতি সংক্রান্ত দিক হলো ওই শিক্ষক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ভালোলাগা বা পছন্দের দিকটি। এই জ্ঞান আর অনুভূতির প্রভাবে শিক্ষার্থী যদি কখনও তার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষক সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করে তাহলে শিক্ষক তা খণ্ডন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। অথবা শিক্ষক যদি কখনও কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে শিক্ষার্থী তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। এগুলো মনোভাবের ক্রিয়াগত দিক। ঠিক এমনিভাবে মনোভাবের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়াগত উপাদানের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

মনোভাবের জ্ঞানগত উপাদান হলো কোনো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধারণার সমষ্টি। যেমন ধনতন্ত্র সম্পর্কে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হলো ধনতন্ত্রের মৌলনীতিগুলো সম্বন্ধে তার জ্ঞান, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের ইতিহাস, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অগ্রগতি বা অবনতির ধারণা, বৈদেশিক অর্থনীতির জ্ঞান ইত্যাদির সমষ্টি। মনোভাবের অনুভূতিমূলক উপাদান হলো উক্ত বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির মানসিক ভাব বা আবেদন। ব্যক্তি কোনো বিষয়কে ভালো মনে করে না খারাপ মনে করে, আনন্দদায়ক মনে করে না বেদনাদায়ক মনে করে এই অনুভূতি থেকেই কোনো বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির কর্মপ্রবণতা তৈরি হয়। ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তাহলে সে বস্তুটিকে অর্জন করতে চাইবে, অর্জনের জন্য সাহায্য করতে চাইবে, সমর্থন করতে চাইবে। বিপরীত দিকে, কোনো বিষয়ের প্রতি একজনের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ওই ব্যক্তি বস্তুটিকে এড়িয়ে যেতে চাইবে বা ধ্বংস করতে চাইবে। এভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে পড়ালেখাসহ সৃজনশীল কাজকর্মের মনোভাব গঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য মনোভাব জানার উপযোগিতা

ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে মনোভাবের গুরুত্ব অত্যধিক। কোনো কিছু শেখার জন্য তার ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন। নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির শেখার কোনো আগ্রহ থাকে না। ফলে তার পেছনে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা শিক্ষার্থী শিখবে তার নিজের ইচ্ছায়। ইচ্ছা তখনই আসে যখন তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনমত ও জনগণের মনোভাবের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ– এ রকম আরও বহু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফলতার জন্য জনগণের মনোভাব গঠনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের জনসংখ্যার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর এবং তারা প্রাচীন বা চিরাচরিত মনোভাবের অধিকারী। যে কোনো সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যদি তাদের পুরাতন মনোভাবের বিরোধ দেখা দেয় তাহলে সমাজের ওই নতুন কর্মসূচির প্রবর্তন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেজন্য সমাজের মানুষের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো এসব কর্মসূচির সফলতার জন্য অপরিহার্য। তাই যে কোনো কর্মসূচি প্রবর্তনের পূর্বে জনমত এবং মনোভাব যাচাই করে দেখা হয়। উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের যাচাই খুবই জরুরি।

ঠিক একইভাবে শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য এবং তার সার্বিক বিকাশের জন্য যে কোনো কর্মসূচি প্রবর্তনের পূর্বে তারা কী চায়, কীভাবে শিখতে চায় তা যাচাই করে জেনে নিতে হয়। তা না হলে শিখনের সকল প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। তাই শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর যথাযথ মনোভাব গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়।

শিক্ষায় মনোভাবের গুরুত্ব

যখন কারও ব্যক্তিসত্তার বিচার করার প্রয়োজন পড়ে তখন প্রকৃতপক্ষে যেসব মনোভাব তার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তখন সেগুলোর উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। যেমন– যখন বলা হয়, এই শিক্ষার্থীটি পড়াশোনায় মনোযোগী বা বেশ বিনয়ী কিংবা সে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করেছে বা অপরকে সহযোগিতা করে তখন প্রকৃতপক্ষে তা কতকগুলো অভিব্যক্তি বা মনোভাবের কথাই উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এ দিয়ে পড়াশোনার প্রতি তার মনোভাব, বয়স্কদের প্রতি তার মনোভাব বা সহকর্মীদের প্রতি তার মনোভাবকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তেমনি যখন বলা হয়, ওই শিক্ষার্থীটি অসামাজিক বা স্বার্থপর বা পড়াশোনায় অমনোযোগী তখনও একইভাবে তার কতকগুলো মনোভাবের কথাই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বাঞ্ছিত ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দরকার তার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গঠন। অধিকাংশ মনোভাবই গড়ে ওঠে শৈশবে ও যৌবনকালে। শিশুর চারপাশের বস্তু ও ব্যক্তিদের প্রতি জ্ঞাতসারে যে বাঞ্ছিত মনোভাব গড়ে ওঠে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাসূচি ও পরিবেশের সুনিয়ন্ত্রণ দরকার। শিশু যাতে তার বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে, বয়স্কদের সাথে যাতে সে সঙ্গত আচরণ করতে পারে এবং স্কুল, শিক্ষক, পাঠ্যবিষয় প্রভৃতির প্রতি যাতে তার ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে, নিজের জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে যাতে তার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ মনোভাব অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। অতএব সুচিন্তিত শিক্ষাসূচির মধ্য দিয়ে যদি শিশুর অভিজ্ঞতাগুলোকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে ওই শিশুর মধ্যে কাম্য মনোভাবগুলো তৈরি হবে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ সাধিত হবে।

শিক্ষাগত মূল্যায়নে মনোভাবের অভীক্ষার উপযোগিতা

শিক্ষার্থীর যথাযথ মনোভাব গঠন আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পিত কার্য পরিচালনার পর শিক্ষার্থীর মনোভাবগত পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। তা ছাড়া মনোভাব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূল্যায়ন যেহেতু সার্বিক প্রক্রিয়া, সেহেতু শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিমাপকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নতি বা অগ্রগতি বিচার করা সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনোভাবের অভীক্ষাগুলো একান্তভাবে জানা প্রয়োজন।

এছাড়া মনোভাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান। সেটি হলো যথোপযুক্ত ইতিবাচক মনোভাব শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই শিক্ষার্থীর মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারলে শিক্ষক নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

১. শিক্ষাক্ষেত্রের যে কোনো অংশের প্রতি শিক্ষার্থীর নেতিবাচক মনোভাব থাকলে তার পারদর্শিতার হার কমে যায়। ফলে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনোভাবের প্রকৃতি জানতে পারেন তাহলে তা থেকে তিনি তার অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

২. বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়গুলোর এমন কিছু অংশ আছে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত সামাজিক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। পাঠ্যক্রমের অংশগুলো কখনই পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় না। যেসব ক্ষেত্রে তাদের যথার্থ মনোভাবের ঘাটতি আছে সেসব ক্ষেত্রে যথাযোগ্য বিষয় নির্বাচন করলে অনেক বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। মনোভাবের অভীক্ষাগুলো উদ্দেশ্যমুখী পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিক্ষককে সহায়তা করে।

৩. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবিষয়বস্তুর জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিসত্তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। কিন্তু যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা কখনই প্রভাবিত হতে পারে না। তাই শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব কিরূপ তা জানার জন্য উপযুক্ত মনোভাবের অভীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ মনোভাবের অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং নিজেকে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশি উপযোগী করে তুলতে পারেন।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলো সামাজিক ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গঠন করাও অনেক জরুরি। সামাজিক প্রভাবের দরুন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কতকগুলো সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের যদি এই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হয় তবে তাদের মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষককে জানতে হবে। মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে এ কাজে সহায়তা করে।

৫. মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে শ্রেণি পরিচালনা এবং শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থীর মনোভাবের সাদৃশ্য আছে তারা একেকটি উপদল গঠন করে। এই উপদলগুলো অনেক সময় শিক্ষাদান কাজের সহায়ক হয়, আবার অনেক সময় সুষ্ঠু শিক্ষাদানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি কিরূপ মনোভাব আছে তা জানতে পারলে শিক্ষক ধনাত্মক বা ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে পাঠদান করতে পারেন। তাতে পাঠদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যারা ঋণাত্মক মনোভাব সম্পন্ন তাদের একত্রিত করে উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন অর্থাৎ মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে শ্রেণিবিন্যাস ও শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

এসব কারণে মনোভাবের অভীক্ষাগুলো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য অভীক্ষা গঠনের ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মনোভাব পরিমাপক স্কেল

যে স্কেল বা পরিমাপক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ পরিমাপ করা যায় তাকে সাধারণভাবে মনোভাব পরিমাপক স্কেল বলে। মনোভাব সব সময় ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ব্যক্তি কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তার মনোভাব সরাসরি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারে আবার নাও পারে। তাছাড়া কোনো বিষয়ের প্রতি একজনের মনোভাব সরাসরি জানতে চাইলে ব্যক্তি বর্তমানের হালচাল বা ফ্যাশন অনুসারে একটি পছন্দ মাফিক জবাব দেয় যা হয়তো উক্ত বিষয়ের প্রতি তার সত্যিকারের মনোভাব প্রকাশ করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেকেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিবার, ধর্ম, রাজনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা যেমন– জনসংখ্যা, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রতি নিজেদের মনোভাবকে অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার বলে মনে করেন। সাধারণত এটা কাউকে জানতে দিতে চান না। সুতরাং খুব সরাসরি প্রশ্ন হলে কেউ কেউ খেয়াল খুশিমতো জবাব দেন অথবা কৌশলে এড়িয়ে যান। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করা হলে সাধারণত অনেকেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এ কারণেই মনোভাব পরিমাপক স্কেলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে মনোভাব পরিমাপের জন্য একজনের কাছ থেকে যে আচরণ প্রত্যাশা করা হয় বাস্তবে সে তা করে না। সুতরাং মনোভাব পরিমাপক স্কেলে এমনভাবে প্রশ্ন বা বিবৃতি সাজানো হয় যাতে কোনো প্রশ্ন বা বিবৃতি সঠিক না হলে তার পক্ষে কোনো কোনো বিবৃতি বা প্রশ্নের সপক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে বা এড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

যে কোনো ধরনের কাজের মতো শিক্ষামূলক কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এই মানসিক প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মনোভাব। শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব তার বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এটি কতটুকু গড়ে উঠেছে তা যাচাইয়ের জন্য যথাযোগ্য অভীক্ষা গঠন বা স্কেল গঠন করা অপরিহার্য।

মনোভাব অভীক্ষা হলো এক ধরনের আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির বিশেষ বস্তুর ধারণা, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রতি কী পরিমাণ ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে তা পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে আমরা মনোভাবকে গুণগত দিক থেকে পরিমাপ করে থাকি। কিন্তু মনোভাবের অভীক্ষায় মনোভাবকে পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এসব অভীক্ষায় স্কোর হিসেবে সংখ্যামান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মনোভাব পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান অসুবিধা আছে, যার জন্য কোনো মনোভাবের অভীক্ষা সার্বজনীন হতে পারে না। কেননা পরিস্থিতি পরিবর্তনে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তাই কোনো আদর্শায়িত মনোভাবের স্কেল দ্বারা যে কোনো পরিস্থিতিতে মনোভাব পরিমাপ করা যায় না। মনোভাব পরিমাপের ৩টি পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তাদের গঠন পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

লিকার্টের মনোভাব-স্কেল গঠনের পদ্ধতি (Likert's method of Construction of Attitude Scale)

মনোভাব পরিমাপের জন্য মনোবিদ লিকার্ট (Likert) যে অভীক্ষা তৈরি করেন সেগুলোতে তিনি একটি বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় লিকার্টের পদ্ধতি (Likert's method)। এই পদ্ধতিতে স্কোরমানগুলো পর্যায়ক্রমে ক্রমোচ্চমানের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই মান সমষ্টিমূলক। তাই এই পদ্ধতিকে অনেক সময় সমষ্টিমূলক রেটিং পদ্ধতি (Method of summated rating) বলা হয়। লিকার্ট (Likert) প্রবর্তিত এই পদ্ধতি থার্স্টনের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক সহজ। এখানে বিবৃতিগুলোকে বিচারকের দ্বারা পরীক্ষা করতে হয় না। ফলে এই ধরনের অভীক্ষা গঠন করতে হলে নিম্নরূপ পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য সম্ভাব্য উত্তরগুলো গঠন করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৫টি করে উত্তর নির্বাচন করা হয়। এই ৫টি উত্তর একটি পাঁচ একক স্কেলের উপর থাকে যার মধ্যবিন্দুটি নিরপেক্ষ উত্তরের পরিচায়ক হিসেবে কাজ করে। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

	বিবৃতি ↓	নিশ্চয়ই	হ্যাঁ	বলা যায় না	না	আদৌ না
	বিদ্যালয় একটি আনন্দের জায়গা					

প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য এরূপ উত্তরের বিবৃতি নির্ধারণ করে মূল বিবৃতিটির নিচে অথবা পাশে লেখা হয় এমনভাবে যাতে অভীক্ষা ফর্ম বা তালিকাটি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়ে যায়। এটিই হলো মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষা।

তৃতীয়ত লিকার্টের পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য একত্রে স্কোরমান থাকে না। প্রত্যেকটি বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত পাঁচ একক স্কেলের বিবৃতিগুলোর জন্য পৃথক পৃথক স্কোরমান ধরা হয়। প্রথমত লিকার্ট যে পদ্ধতির প্রচলন করেন তা হলো পাঁচটি বিবৃতির জন্য ক্রমোচ্চ হারে ১, ২, ৩, ৪, ৫ স্কোর মান ধরা। অর্থাৎ বিবৃতিটি যখন ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে তখন সবচেয়ে বেশি সমর্থনযোগ্য সেই বিন্দুটির জন্য ৫ স্কোর মান ধরা হয় এবং যে বিন্দুতে তীব্রতমভাবে বিবৃতিটি বর্জন করা হয়েছে তার জন্য ১ স্কোরমান ধরা হয়। আবার মূল বিবৃতিটি যদি ঋণাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক হয় তবে চরম ঋণাত্মক বিন্দুতে স্কোরমান ৫ ধরা হয় এবং চরম ধনাত্মক বিন্দুতে ১ স্কোরমান ধরা হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

	বিবৃতি	৫	৪	৩	২	১
		নিশ্চয়ই	হ্যাঁ	বলা যায় না	না	আদৌ না

	বিবৃতি স্কেল মান	৫	৪	৩	২	১
		আদৌ না	না	বলা মুশকিল	সত্য	অত্যন্ত সত্য
	বিদ্যালয়ে যাওয়া মানেই সময় নষ্ট। (ঋণাত্মক বিবৃতি)					

সুতরাং দেখা যাচ্ছে লিকার্টের পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিবৃতির স্কোরমান নির্ণয় করাও অনেক সহজ। অবশ্য বর্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে । আরও সঠিক স্কোরমান পাওয়ার জন্য বর্তমানে উন্নত গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমত অভীক্ষাটিকে একটি নমুনা দলের উপর প্রয়োগ করা হয়। এরপর নমুনাদলের উত্তরগুলোকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই রীতির স্কোর করা হয় এবং পরে প্রত্যেকটি বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ৫টি উত্তর উপশ্রেণির বা ৫টি বিন্দুর মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্কোর বণ্টন বিচার করা হয় স্বাভাবিক বণ্টনের অনুমানে। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সংখ্যা যেভাবে ৫টি বিন্দুর মধ্যে বিস্তৃত তার ভিত্তিতে ওই বিন্দুর স্কোর মাপের কাজের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য অভীক্ষা গঠন করতে গিয়ে এই ধরনের জটিল প্রক্রিয়া ব্যবহার না করলেও চলে। ফলে স্কোরমান নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতিটি বাদ দিলে লিকার্টের পদ্ধতিতে মনোভাবের অভীক্ষা গঠনের কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার পর স্কোরমান ১, ২, ৩, ৪, ৫ নিয়মে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য নির্ণয় করা সহজ। অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার পর এই আংশিক স্কোরগুলো যোগ করলে শিক্ষার্থীর মোট স্কোর পাওয়া যায়। এই একক সংখ্যামান দ্বারা শিক্ষার্থীর মনোভাবকে প্রকাশ করা হয়।

থার্স্টনের মনোভাব-স্কেল গঠনের পদ্ধতি (Thurston's method of Construction of Attitude Scale)

থার্স্টন মনোভাব পরিমাপের জন্য প্রায় ত্রিশটি অভীক্ষা বা স্কেল তৈরি করেন। এই সব অভীক্ষার দ্বারা কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতি কী ধরনের মনোভাব আছে তা পরিমাপ করা যায়। যেমন চার্চ বা ধর্মীয় সংস্থার প্রতি মনোভাব পরিমাপের জন্য একটি স্কেল ইত্যাদি। এসব স্কেল বা অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে থার্স্টন এক বিশেষ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। মনোভাবের অভীক্ষা গঠনের এই কৌশলকে বলা হয় থার্স্টনের পদ্ধতি। এই অভীক্ষা গঠনের সময় এই পদ্ধতিকে আপাত সমপার্থক্যের পদ্ধতি বলা হয়ে থকে। এই পদ্ধতিতে মনোভাবের অভীক্ষা গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়–

১. বিবৃতি গঠন

প্রথমত যে বিষয় বা জানার পরিপ্রেক্ষিতে মনোভাব পরিমাপ করতে হবে, তার ভিত্তিতে এমন কতকগুলো বিবৃতি নির্বাচন করতে হবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করা যায়। যত রকম ভাষার এবং যেভাবে মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব সবগুলোই লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিবৃতির সংখ্যা যত বেশি হয় ততই ভলো। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক বা পরীক্ষক এ ব্যাপারে অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। যেমন– বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব কিরূপ তা যদি পরিমাপ করতে চাওয়া হয় তাহলে প্রথমত ওই মনোভাবজ্ঞাপক বিবৃতি সংগ্রহ করতে হবে। বিবৃতিগুলো হতে পারে নিম্নরূপ–

- বিদ্যালয় খুব আনন্দের জায়গা;
- বিদ্যালয়ে আসতে আমি খুব আগ্রহী;
- বিদ্যালয়ে এসে সময় নষ্ট হয়।

এই কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিবৃতি চাইতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন ধরনের মনোভাবের প্রকাশ করা বিবৃতিগুলো প্রথমত একটি তালিকায় লিখতে হবে।

২. বিবৃতির সম্পাদনা

বিবৃতিগুলো হয়ে যাওয়ার পর সেগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনোগুলো ধনাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক এবং কোনোগুলো ঋণাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক তা বিচার করে দেখতে হবে। কতকগুলো ধনাত্মক বিবৃতি আছে এবং কোনো ঋণাত্মক বিবৃতি আছে কিনা তাও দেখতে হবে। তা ছাড়া যদি কোনো বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় তবে সেটিকে বাদ দিতে হবে। সম্ভব হলে মনোভাব প্রকাশের এই বিবৃতি সম্পাদনার পর যে বিবৃতিগুলো অবশিষ্ট থাকবে সেগুলোকে অভীক্ষাপদ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এই বিবৃতিগুলোকে পৃথকভাবে একেকটি কাগজের ফালিতে লিখতে হবে। একেকটি বিবৃতি অন্ততঃপক্ষে ত্রিশবার ৩০টি কাগজে লিখতে হবে।

৩. বিচারকরণ

বিবৃতি লেখা কাগজের ফালিগুলোর একেকটি সেট একেকজন বিচারককে দিতে হবে। অর্থাৎ ৩০ জন বিচারককে ৩০টি বিবৃতির সেট দেওয়া হবে। প্রত্যেক বিচারককে এই বিবৃতিগুলোকে ১১টি শ্রেণিতে ভাগ করতে বলা হবে। অর্থাৎ যেখানে অভীক্ষার উচ্চমান বেশি ধনাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক হবে সেখানে সবচেয়ে বেশি ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলোকে রাখা হবে। এই শ্রেণিটির ক্রমিক নম্বর হবে ১১, অন্যদিকে ১ নম্বর শ্রেণিতে থাকবে সবচেয়ে তীব্র ঋণাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো।

স্বাভাবিকভাবে ৬ নম্বর শ্রেণিটিতে এমন বিবৃতিগুলো রাখতে বলা হবে যেগুলো ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোনো ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এই যে ১১টি শ্রেণিতে বিবৃতিগুলোকে বিভক্ত করার জন্য বিচারকদের বলা হবে, তার মধ্যে ৫টিতে থাকবে ঋণাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো এবং অপর পাঁচটিতে থাকবে ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো। আর মাঝখানে থাকবে নিরপেক্ষ বিবৃতিগুলো। প্রত্যেক বিচারককে এই কাজ বিচার বিবেচনা করতে বলা হবে। শিক্ষক তাঁদের সচেতন করে দেবেন, তাঁরা যেন এই শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ হিসেবে মনে রাখেন। বিচারক হিসেবে কাজ করার জন্য অন্যান্য শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অনুরোধ করা যেতে পারে।

গাটম্যান স্কেল (Guttman Scale)

থার্স্টন ও লিকার্ট পদ্ধতিতে প্রণীত মানক সম্পর্কে যে প্রশ্নটি প্রায়ই উত্থাপিত হয় সেটা হলো উক্ত মানক একটি মাত্র মনোভাব পরিমাপ করে কী? উভয় কৌশলেই অনেকগুলো উক্তি নিয়ে মানক প্রণয়নের সূচনা হয়। এসব উক্তি বিভিন্ন মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চূড়ান্ত উক্তি যাচাই পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন মনোভাবের এই মাত্রাগত বিভিন্নতা থেকে যায়।

মনোভাবের একটিমাত্র মাত্রা নির্ধারণের জন্য যে সকল মানক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে গাটম্যানের ক্রমবর্ধিষ্ণু মানক পদ্ধতি অন্যতম। একটি মাত্র মনোভাব পরিমাপ করে বলে একে একমাত্রা বিশিষ্ট মানকও বলা হয়। গাটম্যান বলেন, ওইসব উক্তি বা পদকেই আমরা একটি মানক বলব যার একটি উক্তিতে একজন ব্যক্তি অন্যদের চেয়ে উচ্চ সাফল্যাঙ্ক পেলে অন্যসব উক্তিতেও সে একই রকম উচ্চ সাফল্যাঙ্ক পাবে এমন নিশ্চয়তা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ওজন সম্পর্কিত সর্বোৎকৃষ্ট গাটম্যান মানকের পদগুলো হবে– আমার ওজন ১০০ পাউন্ডের বেশি, আমার ওজন ১২০ পাউন্ডের বেশি, আমার ওজন ১৪০ পাউন্ডের বেশি ইত্যাদি। এই মানকের ৩ নম্বর উক্তিতে যে ইতিবাচক উত্তর দেবে ১ ও ২ নং উক্তিতেও তার ইতিবাচক উত্তর হবে। বলা বাহুল্য, এই মানকটি কেবল একটি বিষয়ে দৈহিক ওজন পরিমাপ করতে অর্থাৎ এটি একটি একমাত্রা বিশিষ্ট মানক। এ ধরনের মানক দিয়ে ব্যক্তির মোট সাফল্যাঙ্ক জানা থাকলে তা থেকে প্রতিটি উক্তিতে তার উত্তরের ধরন সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। যেমন– মনে করা যাক, উপরের উদাহরণে প্রত্যেকটি ইতিবাচক উত্তরের জন্য ১ এবং নেতিবাচক উত্তরের জন্য ০ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হবে। কাজেই কোনো ব্যক্তির মোট সাফল্যাঙ্ক যদি ২ হয় তাহলে তা থেকে বোঝা যাবে যে সে ১ ও ২ নম্বর উক্তিতে হ্যাঁ বলেছে এবং ৩ নম্বর উক্তিতে না বলেছে। একইভাবে কেউ যদি ৩ সাফল্যাঙ্ক পায় তাহলে বুঝতে হবে সে ১, ২ ও ৩ নম্বর উক্তিতে হ্যাঁ বলেছে। মোট সাফল্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন উক্তিতে ব্যক্তির উত্তরের ধরন জানতে পারাকে পুনরুৎপাদন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ওজনের মতো মনোভাবের ক্ষেত্রে পুনরুৎপাদন সম্পূর্ণ সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। কিছু ভ্রান্তি সব সময়ই দেখা যাবে। পুনরুৎপাদনের সহসম্পর্ক বা অনুবন্ধসহগ নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। মোট সাফল্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন উক্তির উত্তর প্রতি উত্তর কতটুকু সঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করা যাবে পুনরুৎপাদন সহসম্পর্ক সহগ তারই নির্দেশ করে থাকে। গাটম্যানের মতে, এই সহসম্পর্ক সহগ কমপক্ষে ·৯০। অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্চমানও হওয়া আবশ্যক।

গাটম্যান মানকের প্রাথমিক উক্তি নির্বাচনকে অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ উক্তিগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে এই মানক পদ্ধতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। এই বিষয়ে গাটম্যানের বক্তব্য হলো উত্তর নির্বাচন প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কাজেই এই মানকের বিষয়বস্তুগত যথার্থতা (Content validity) পরিমাপ অসম্ভব।

অধিকাংশ মনোভাব অভিজ্ঞতার ফসল। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে মনোভাব গড়ে ওঠে। একই সাথে শিক্ষার্থীর শিখন মনোভাব গঠনে বিস্তৃত, গভীর ও সুদূরপ্রসারী কার্যকর ভূমিকা রাখে। কোনোকিছুর শেখার জন্য ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন। নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে শেখা যায় না, শেখায় কোনো আগ্রহ থাকে না। আগ্রহ, উৎসাহ, ইচ্ছা নেই শেখানোর এ রকম সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে হলে মনের দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। যদি এমন হয় যে, শিক্ষার্থীর সত্তায় মন নেই, তাহলে বলা যাবে পুরো মানুষটি নেই। অর্থাৎ কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া নেই। তাই বলা যাবে শিখনও নেই। কারণ শিখন মানসিক প্রতিক্রিয়ার অর্জন বা ফল।

মনের অবস্থার গঠন, গড়ন ও পরিবর্তনে অর্জিত শিখন ভীষণ শক্তিশালী একটি উদ্দীপক। প্রত্যাশিত মনোভাব তৈরিতে সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত শেখানো শিখন কর্মসূচি থাকবে তবে তা অবশ্যই পরিবর্তনশীল হতে হবে। পরিবর্তিত বাস্তবতার ও প্রেক্ষাপটে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার অবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে তা শিক্ষককে মাথায় রাখতে হবে। মনোভাব পরিবর্তন নির্ধারণে তাই অবশ্যই শিখনযাচাই প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে।

৫.৪ : পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক নির্দেশনা বা কৌশলের মাধ্যমে শিখনযাচাই

কোনো কিছু হালকাভাবে না দেখে মনোযোগ সহকারে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন দিক তীক্ষ্ণভাবে দেখাই হলো পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীর বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার মানস প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচরণের মধ্যে। তাই ব্যক্তির প্রতিটি চিন্তাভাবনা, আগ্রহ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষককে যত্নসহকারে লিখে রাখতে হবে। ব্যক্তি আচরণের এই ধারাবাহিক লিখিতরূপেই পর্যবেক্ষণ। সকল ব্যক্তির আচরণগত সমস্যা এক রকম নয়। সে জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ হিসেবে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ণনামূলক গবেষণায় এর বিশেষ অবদান রয়েছে। মূলত পর্যবেক্ষণ সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি। একে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের একটি প্রধান সোপানও বলা যায়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি যখন কোনো গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খলভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়, এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্য যখন সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা নির্ধারণের জন্য যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখনই পর্যবেক্ষণকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ বস্তু বা বিষয় গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এই দুই প্রকারে করা যায়। কোনো কোনো তথ্য প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রহ করা যায়। যেমন– কোনো তথ্য কোনো বাস্তব বিষয় থেকে সংগ্রহ করতে হলে তা সহজসাধ্য হয়। অনেক সময় গণনা এবং পরিমাপের সাহায্যে বাস্তব বিষয় থেকে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কোনো একটি স্কুল দালানের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে হলে দালানটি কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, কয়টি কামরা আছে, কামরাগুলোর আকৃতি কী ধরনের এবং দালানে সংরক্ষিত আসবাবপত্রের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভবপর। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সাধারণত গণনা ও পরিমাপের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের আচরণ জটিল ও পরিবর্তনশীল। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানুষের আচার-আচরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হলে অনেক সময় পরোক্ষভাবে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, লাইট মিটার, স্টপ ওয়াচ, টেপ রেকর্ডার, চলচ্চিত্রের ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ফটোগ্রাফি, অডিও মিটার ইত্যাদির প্রচলনও অত্যধিক।

পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য

- পর্যবেক্ষণ খুবই ধারাবাহিক ও সুনির্ধারিত।
- সংগৃহীত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব পরিমাণগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র থেকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা যুক্তিসঙ্গত।
- ক্ষেত্র বিস্তৃত হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এই উপায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।
- পর্যবেক্ষণের পর পরই তথ্যাদির রেকর্ড করা বা নোট গ্রহণ করা সমীচীন।
- স্মরণশক্তির উপর নির্ভর না করে যতদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।
- সময়ের ব্যবধানে তথ্যাদির নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

পর্যবেক্ষণের শ্রেণিবিভাগ

গবেষণার তথ্য সংগ্রহকারীর উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন–

১. সংগঠিত পর্যবেক্ষণ;
২. অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ;
৩. নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ;
৪. অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ।

এসব শ্রেণিবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. সংগঠিত পর্যবেক্ষণ

এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষণার পূর্বেই একটি সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষক সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং গবেষণার উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র, পরিধি ও আবশ্যকীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকেন। এই পর্যবেক্ষণকে বিশেষ কোনো ঘটনা, বিষয় বা আচার-আচরণের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। কার্যকারণ সম্পর্কিত অনুমান যাচাই বা বর্ণনা করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ

এতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত গবেষক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। এটি সংগঠিত পর্যবেক্ষণের মতো ধারাবাহিক বা সুশৃঙ্খল নয়। সাধারণত কোনো দল, জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে এই শ্রেণির লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হয় ও তাদের সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করতে হয়। এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ সীমিত আকারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিস্তৃত এলাকায় এর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

৩. নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

এই পদ্ধতিতে একটি নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং মানুষ এই পরিবেশে কী প্রকার আচরণ করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় না। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ শিশুদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য অধিক প্রযোজ্য। পরীক্ষণ পদ্ধতির পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ধরনের পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

৪. অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

স্বাভাবিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারেই অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ করা যায়।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা

- সকল স্তরের ব্যক্তির বিশেষত শিশুদের আচার-আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষক যদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন তাহলে সংগৃহীত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হয়ে থাকে।
- শিক্ষা গবেষণায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।
- বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের গুণগত ও পরিমাণগত দিক উদ্ঘাটন করা যায়। নানাবিধ দোষত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ক্ষেত্র বিশেষে কম খরচে ও কম সময়ে পরিচালনা করা যায়।

পর্যবেক্ষণের অসুবিধা

- কখনও কখনও প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের তুলনায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বিশেষত নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যখন পরিমেয় তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আধুনিক পরিমাপক যন্ত্রপাতি যেমন– গতিবিধি লিপিবদ্ধকারক যন্ত্র, ফিল্ম, শব্দধারক যন্ত্র, ক্যাসেট, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
- ঘটনার স্থায়িত্বের উপর গবেষককে অত্যধিক নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে স্বল্পকাল স্থায়ী ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়।
- এই পদ্ধতি সকল প্রকার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।
- সরাসরি পর্যবেক্ষণ অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয় এবং পূর্ণ সহযোগিতার অভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথ সুগম করা যায়।
- আচরণের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের পক্ষে পদ্ধতি নির্বচন করা সহজ হয়।
- শিক্ষণ কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিক বাড়ন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা জানা যায়।
- যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
- পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করে তা জানা যায়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল (Observation Methods/Techniques)

ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ কাজটি বেশ জটিল। কোনো ব্যক্তিকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা নির্ভর করে তার সমস্যার উপর। শিক্ষক ব্যক্তির কোন্ দিকটি অবলোকন করতে চান তার উপর নির্ভর করে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ কৌশল নির্ধারণ। তাই ব্যক্তিভেদে পর্যবেক্ষণ কৌশলও ভিন্নতর হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

১. সাক্ষাৎকার

এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর মুখোমুখি বসে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তার আচরণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন। এ পদ্ধতির ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উপর। এই সম্পর্ক যদি খুব মধুর ও স্বাভাবিক হয় তাহলে শিক্ষকের প্রতিটি কাজে শিক্ষার্থী সহযোগিতা করবে। এতে শিক্ষক সহজেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। আর যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালো না হয় কিংবা শিক্ষার্থী যদি তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যায় না।

২. গল্প বলা

এ পদ্ধতি অনুসরণের পূর্বে শিক্ষককে গল্প বলার যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাহলে স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় শিক্ষার্থী গল্প বলতে সক্ষম হবে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার পছন্দমতো যে কোনো গল্প বলতে বলেন। এই গল্প থেকেই শিক্ষক তার মনের যাবতীয় গোপন রহস্য জানতে পারেন।

৩. চিত্রাঙ্কন

শিক্ষার্থীর ইচ্ছা অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে শিক্ষক তার অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৪. গৃহ ও সমাজের আর্থিক অবস্থা নির্ণয়

শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক মান নির্ণয় করার মানসে কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীর গৃহ ও সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার খোঁজখবর সংগ্রহ করে থাকেন।

৫. শিশুর পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা

এ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ধারণা, তার সামাজিক বিশ্বাস ও নৈতিকতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পিতামাতার সঙ্গে আলোচনার সময় তারা তাদের শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী আশা পোষণ করেন শিক্ষক তা কৌশলে জেনে নেন। শিশু কিসে আনন্দ ও দুঃখ পায় সে সম্পর্কেও তথ্য জেনে নেন।

৬. আগ্রহের তালিকা গঠন

শিক্ষার্থী কী ধরনের কাজ করতে ভালোবাসে, শিক্ষক তার একটি তালিকা গঠন করেন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে নিতে পারেন। কখনও কখনও শিক্ষার্থীকে সপ্তাহকাল ধরে তার দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ লিখে রাখতে বলে শিক্ষক তা থেকে তার জীবন ধারার প্রকৃতি জেনে নিতে পারেন।

৭. অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী নিজেকে খুব সংযত রাখে। তাই শ্রেণিকক্ষে সব সময় তার স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায় না। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিক্ষক মাঝেমধ্যে খেলার মাঠে, পথে-ঘাটে, প্রতিবেশির সাথে আলাপরত অবস্থায় তাকে অবলোকন করে থাকেন। এরূপ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থী যখন স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল আচরণ করে তখন তাকে পর্যবেক্ষণ করলে তার স্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অর্জন এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়।

৮. বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ

বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থী কেমন আর বিদ্যালয়ের ভেতরের পরিবেশে তার আচরণ কেমন শিক্ষক তা নজরে রাখবেন। দুটি পরিবেশে তার আচরণ পর্যলোচনা করে শিক্ষক তার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হবেন।

৯. প্রশ্নাবলি পদ্ধতি

শিক্ষার্থীকে তার বয়সের উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্ন করে দেখা যেতে পারে যে সে কীভাবে এবং কতদূর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এসব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানের গুণগত দিক যাচাই করা সম্ভব।

১০. সমস্যা নির্ণায়ক পদ্ধতি

শিশু সর্বদাই তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে। অনেক সময় তাকে এর ব্যতিক্রম আচরণ করতে লক্ষ্য করা যায়। আর তখনই তার দুর্বলতা, আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব, কাজের প্রতি অনীহার ভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে এরূপ আচরণ প্রকাশ পেলে সমস্যা নির্ণায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। পরে তা বিশ্লেষণ করে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১১. জীবন ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি

কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায় হয়ে থাকলে শিক্ষক এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। এ পদ্ধতির লক্ষ্য হলো কোনো ঘটনার ইতিহাস পর্যালোচনা করা। শিক্ষার্থীর মনের বর্তমান অবস্থা জানতে হলে তার অতীতকে জানা প্রয়োজন। এ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম ধাপে আসে শিক্ষার্থীর লক্ষ্য, ঠিকানা, বয়স, লিঙ্গ, ক্লাস, সম্প্রদায় এবং ধর্ম। এর পরবর্তী পর্যায়ে শিশুর বিশেষ অবস্থাটি উল্লেখ করে তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা কী হতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১২. ক্রমপুঞ্জিগত রেকর্ড বিশ্লেষণ

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্থায়ী উপাত্তগুলো নথিভুক্ত করে সহজলভ্য করা হয়। এ উপাত্তগুলো শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সৎ গুণাবলি এবং ত্রুটি সম্পর্কে বিচার করতে সহায়তা করে। শিক্ষক যদি এই উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করেন তাহলে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে জানতে সক্ষম হবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নথিপত্র তার পাঠের প্রতি অনুরাগ, পূর্ববর্তী ক্লাসের ফলাফল, শারীরিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও এর ব্যবস্থার সাহায্যে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্য বিষয়ে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় আছে যা অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। এসব বিষয় যেমন– শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে কাজ, সৃজনশীল কাজ, কোনো যন্ত্রপাতি তৈরি বা দক্ষতা পরিমাপের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে পর্যবেক্ষণ কৌশল বলে। পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো–

১. অ্যানেকডোটাল রেকর্ড (Anecdotal record)
২. চেকলিস্ট (Check list)
৩. রেটিং স্কেল (Rating scale)
৪. সমাজমিতিমূলক কৌশল (Sociometric technique)
৫. পরিস্থিতি নির্ভর অভীক্ষা (Situation based test)।

এসব কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. **অ্যানেকডোটাল রেকর্ড (Anecdotal record) :** এই কৌশল প্রয়োগের দ্বারা কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো ঘটনার সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনে প্রকৃত ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে যাচাই করা হয়।

২. **চেকলিস্ট (Check list) :** চেকলিস্টের সাহয্যে কোনো বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তির পরিমাপ করা সম্ভব। যেমন–একজন মানুষ, মানুষ হিসেবে কতটা ভালো অথবা মন্দ এ বিষয়টা যাচাই করার জন্য ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করার সময় ব্যক্তির কী কী যোগ্যতা পরীক্ষা করা হবে এবং এর জন্য কী কী পরিমাপক রয়েছে সেগুলো একটি ছকের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিমাপক সেট করার উপায় হচ্ছে চেক লিস্ট।

৩. **রেটিং স্কেল (Rating scale) :** এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বসহ অন্যান্য গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করে পরিমাপ করা হয়। পর্যবেক্ষণ দুই প্রকার। যথা– বহিঃপর্যবেক্ষণ ও অন্তঃপর্যবেক্ষণ। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ও অন্তঃপর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতাকে সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ করার কৌশলকে রেটিং স্কেল বলে। মূলত রেটিং স্কেল অনেকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সেট যা পরিমাপ করতে হবে। এটা বেশ কয়েক ধরনের মাত্রা নির্দেশক স্কেল যা সকল বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা সম্ভব। অনেক সময় ব্যক্তি নিজেই নিজের রেটিং স্কেল করতে পারেন। একে বলে সেল্ফ রেটিং (Self rating)। এ স্কেল কতকগুলো পয়েন্টে বিভক্ত। যেমন– তিন, পাঁচ, সাত বা দশ পয়েন্টের হতে পারে। উদাহরণ– সৃষ্টি, উৎস, সূচনা, সাগর ও শুভ কতটুকু সামাজিক?

৫ পয়েন্টের স্কেল				
নাম	বেশ সামাজিক	সামাজিক	মোটামুটি সামাজিক	সামাজিক নয়
সৃষ্টি	√			
উৎস		√		
সূচনা			√	
সাগর				√
শুভ	√			

৪. **সমাজমিতিমূলক কৌশল (Sociometric technique) :** এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে কোনো সদস্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করা সম্ভব। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী জে.এল. মনেরো (J.L. Monero) এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি একটি চিত্রের মাধ্যমে একটি বিশেষ দলের বিভিন্ন সদস্যের সম্পর্কটিকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এ চিত্রটিকে বলা হয় সোসিওগ্রাম (Sociogram) এবং পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি।

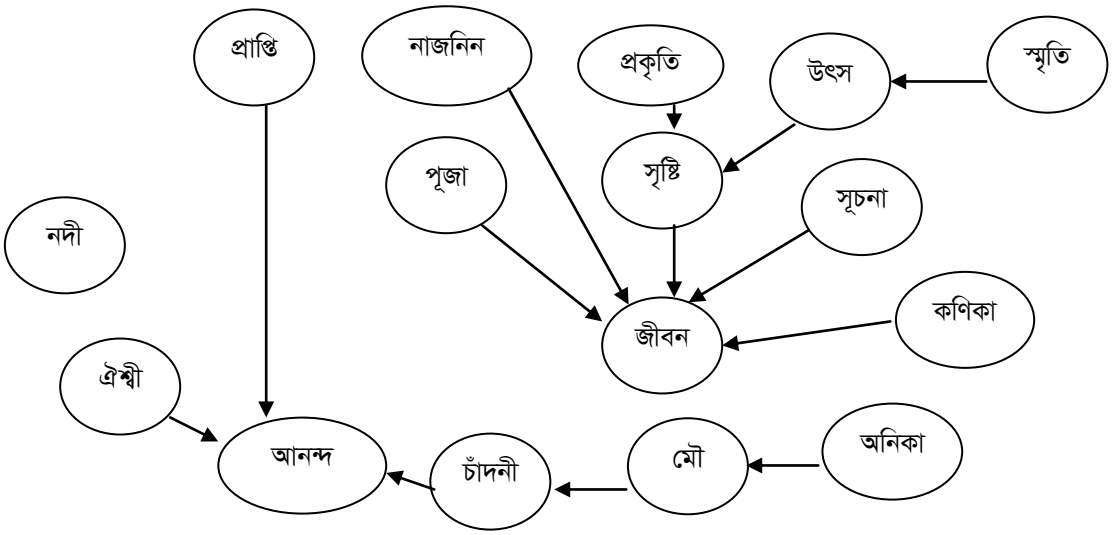

চিত্র: সোসিওগ্রাম

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন– উদয়ন বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বলা হলো, "তোমরা তোমাদের শ্রেণির যাকে সবচেয়ে দায়িত্বশীল ও যোগ্য মনে কর তাকে Class Captain নির্বাচন করবে। এ জন্য যাকে নেতৃত্ব দেওয়া যাবে তা তোমরা নিজেরা ঠিক কর। একটি মাত্র গোপন ভোটের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের মতামত জানাও। ভোটপত্রগুলো পাওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নামগুলোকে চকবোর্ডে কিংবা হোয়াইট বোর্ডে লিখবেন এবং কে কাকে ভোট দিয়েছে তা তীর চিহ্ন দ্বারা দেখাবেন।

উপরের চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, জীবন সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে এবং নদী একেবারেই ভোট পায়নি। আবার আনন্দ ৩টি ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবনের মধ্যে নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি সর্বাপেক্ষা বেশি আছে, আনন্দের মধ্যে কিছুটা আছে, আর নদী একেবারেই রিক্ত।

৫. **পরিস্থিতি নির্ভর অভীক্ষা (Situation based test) :** পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষার্থীর মনোভাব এবং গুণাবলি পরিমাপের আরেকটি কৌশলের নাম হচ্ছে পরিস্থিতি নির্ভর অভীক্ষা। এর মাধ্যমে বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষার্থীকে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা যাচাই করা হয়।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির নির্ভুল লিপিবদ্ধকরণ

পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়–

১. **হ্যাঁ-না তালিকা :** অনেকগুলো পূর্বনির্ধারিত পদ বা উক্তির সমন্বয়ে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকায় কোনো একটি বিশেষ উক্তি উল্লিখিত বা অনুল্লেখিত রয়েছে তা হ্যাঁ অথবা না-সূচক শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই তালিকায় কোনো একটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দেওয়া থাকে। পর্যবেক্ষক গবেষণার সাথে বিষয়ীর কাছ থেকে প্রতিটি উক্তি বা বৈশিষ্ট্যের পক্ষে হ্যাঁ অথবা না এর মাধ্যমে জবাব সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

২. **স্কোর কার্ড :** বিস্তৃত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন– লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা অথবা বিদ্যালয়ের কামরার সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করে স্কোর কার্ড ব্যবহার করা হয়।

৩. **স্কেলড স্পেসিমেন :** নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির হাতের লেখার সাথে অন্য হাতের লেখা পরীক্ষা করার জন্য স্কেলড স্পেসিমেন (scaled specimen) ব্যবহার করা হয়। এতে নির্দিষ্ট ওই ব্যক্তির হাতের লেখা specimen-এর সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করা হয়।

৪. **রেটিং স্কেল :** কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে সুসংহতভাবে প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ব্যক্তির যে কোনো একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এটাই হলো স্কেল। এই স্কেল পর্যবেক্ষণ করে স্কেলে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যেমন– অধিকতর শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, মোটামুটি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ নয় ইত্যাদি মাত্রানুযায়ী কোনো ব্যক্তির গুণাবলির পাঁচ মাত্রা স্কেল প্রস্তুত করা যায়। এই স্কেলে তিন মাত্রা বা সাত মাত্রারও হতে পারে। রেটিং স্কেলের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য নির্ভরযোগ্য করার উদ্দেশ্যে মাত্র একজন পর্যবেক্ষকের রেটিং-এর উপর নির্ভর না করে একের অধিক পর্যবেক্ষণ নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাদের গড় বের করে লব্ধ ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য করা যেতে পারে।

৫. **দলিল বিশ্লেষণ :** ধারাবাহিকভাবে দলিলপত্রের বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ করা যায়।

৬. **তালিকা প্রস্তুতকরণ :** পর্যবেক্ষিত তথ্যাদি থেকে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংগৃহীত তথ্যের একটি অনুসূচি বা তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

৭. **চিত্রগ্রহণ ও মানচিত্র প্রস্তুতকরণ :** সংগৃহীত তথ্যাদি বর্ণনা করার সময় প্রয়োজন অনুসারে বর্ণিত বিষয়ের চিত্র দেওয়া যেতে পারে। চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, প্রাণবন্ত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো একটি বিশেষ দল বা এলাকা থেকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে সে এলাকা বা দলটির অবস্থানের একটি ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। যার সাহায্যে এলাকা বা দলটি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়।

এ ছাড়া নির্ভুল লিপিবদ্ধকরণের জন্য পর্যবেক্ষণের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি গবেষক সজাগ থাকবেন। যেমন–

- সুনির্ধারিত ও ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা।
- সংগৃহীত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব পরিমাণগত হওয়া।
- পর্যবেক্ষণের পরপরই তথ্যাদির রেকর্ড বা নোট গ্রহণ করা।

মৌখিক অভীক্ষা (Oral Test)

যে ধরনের অভীক্ষায় পরীক্ষক মৌখিকভাবে সামনাসামনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মৌখিক উত্তর আদায় করে পরীক্ষার্থীর প্রজ্ঞা, দক্ষতা, বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ, উপস্থিত বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করেন তাকে মৌখিক অভীক্ষা বলা হয়। এই পদ্ধতি যে কোনো ধরনের নির্বাচনী কাজে খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতি নিরক্ষর ও ছোট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এবং ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

মৌখিক অভীক্ষার লক্ষ্য (Aims of Oral Test)

- উত্তরের উৎকর্ষতা বিচার।
- পরীক্ষার্থীর বলার এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যাচাই।
- সাবলীলভাবে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কৌশল ও পারদর্শিতা যাচাই।

মৌখিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Oral Test)

- এই অভীক্ষায় মৌখিকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং অভীক্ষার্থী মৌখিকভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে।
- পরীক্ষক সুবিধামতো যখন তখন এ ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন।
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে।
- পরীক্ষা নেওয়ার স্থান ও সময় প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে।
- এটা লিখিত ও কর্ম সম্পাদনী অভীক্ষার পরিপূরক।
- শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ মার্জিত ও সুস্পষ্ট কিনা তা জানা যায়।
- শিক্ষার্থীর উপস্থিত বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

মৌখিক অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Oral Test)

- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, ভাষার প্রয়োগ, উপস্থিত বুদ্ধি, গণিতের সহজ নিয়মের ব্যবহার, স্মরণশক্তি ইত্যাদি দক্ষতা নির্ণয় করা সহজ।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষার্থী লেখার সময় অনেক ভুল করে থাকে যা মৌখিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ জ্ঞান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং চেহারা ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের ও কৃতিত্বের মোটামুটি একটি ধারণা পেতে পারে।
- নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থী অথবা নিরক্ষর লোক যারা লেখায় দক্ষ নয় তাদের ক্ষেত্রেও এই অভীক্ষা উপযোগী।
- মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

মৌখিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Oral Test)

মৌখিক অভীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. ভাইভা পরীক্ষা (Viva voce)
২. সাক্ষাৎকার (Interview)

এই দুইটি শ্রেণির মৌখিক অভীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো–

১. **ভাইভা পরীক্ষা (Viva voce) :** যখন কোনো অধীত বিষয়ের যাচাই করার উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জ্ঞান পরিমাপ করা হয় তাকে ভাইভা পরীক্ষা বলে। এই পরীক্ষার পরিধি সংকীর্ণ। ভাইভা পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়ের ভাইভা ঠিক সে বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসাবাদই এ অভীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. **সাক্ষাৎকার (Interview) :** ব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থাকে না। এর পরিধি শূন্য থেকে অনন্ত। কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনো প্রশ্নের জিজ্ঞাসা না করে শুধু চেহারা দেখে ছেড়ে দিলেও তা সাক্ষাৎকারের পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের অভীক্ষা সাধারণত কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ যাচাইয়ের জন্য এবং গবেষণার বা সমস্যা সমাধানমূলক তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মৌখিক পরীক্ষায় বেশ কিছু ত্রুটি আছে যা পরীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য হতে বাধা দেয়। এ ত্রুটিসমূহ দূর করলে মৌখিক পরীক্ষা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

মৌখিক অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of Oral Test)

- শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, ভাষার প্রয়োগ, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি দক্ষতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা খুবই কার্যকর পন্থা।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা লেখার সময় অনেক ভুল করে থাকে যা মৌখিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ জ্ঞান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।
- উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষার্থী না বুঝে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে লেখে অথবা নকল করে লেখে সেক্ষেত্রে এই পরীক্ষা দ্বারা সত্যিকারের জ্ঞানের মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- নিরক্ষর লোক অথবা নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা লেখায় দক্ষ নয় তাদের ক্ষেত্রেও এই অভীক্ষা বিশেষ উপযোগী।

মৌখিক অভীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Oral Test)

- কর্মপরিধি সংকীর্ণ এবং এর সাহায্যে যে মাপ পাওয়া যায় তা ত্রুটিপূর্ণ।
- সময় খুব বেশি লাগে।
- পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান এবং
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্থায়ী মূল্যায়ন হয় না।
- এটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

মৌখিক পরীক্ষার ত্রুটি (Faults of Oral Test)

মৌখিক পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা সম্ভব হলেও এই পরীক্ষার কিছু ত্রুটি পরীক্ষাটির গ্রহণযোগ্যতায় সমস্যার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার কঠিন সমালোচনা করা হয়েছে এভাবে–

- মৌখিক পরীক্ষা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান বিচার করতে অক্ষম।
- এ পরীক্ষা বিস্তৃতভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করতে পারে না।
- এ পরীক্ষায় শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মূল্যায়নের স্থায়িত্ব বজায় থাকে না।
- এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি বেশি হয় তবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।
- এ পরীক্ষায় অনেক সময় কাঠিন্যের মাত্রা স্থির রাখা সম্ভব হয় না।

৫.৫ : মানদণ্ডভিত্তিক শিখনযাচাই–একটি বিকল্প পন্থা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া (Teaching-learning process) বা প্রশিক্ষণ কার্য শেষে কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত মান অর্থাৎ কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা (achievement) যাচাইয়ে ব্যবহৃত কৌশলকে মূল্যযাচাই বলে। সাধারণত বিভিন্ন অভীক্ষা, নির্ধারিত কাজ, ধারাবাহিক ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই এমন নানা পন্থা মূল্যযাচাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারদর্শিতা হলো, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি যা সে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের শেষে অর্জন করে।

শিখনযাচাই কাজে পরীক্ষক হিসেবে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষার স্বার্থে শিক্ষক হিসেবে উচিত বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি আদর্শ মানদণ্ডে আগেভাগেই দৃঢ় অবস্থান ঠিক করে নেওয়া।

একসময় বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি ছিল না। রচনামূলক প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষক শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তর পড়ে নিজের মতামতের সাথে মিলিয়ে ইচ্ছামতো নম্বর প্রদান করতেন। এখানে প্রশ্নের মোট নম্বর দেওয়া থাকত, আবার কখনওবা প্রশ্নকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রতি অংশের জন্য নম্বর উল্লেখ করে দেওয়া থাকত। পরীক্ষক উত্তরের ধরন দেখে নিজের পছন্দ মাফিক একেক জনের উত্তরের পক্ষে নম্বর দিতেন। এক্ষেত্রে নম্বর প্রদান নৈর্ব্যক্তিক হতো না। অর্থাৎ এভাবে নম্বর বরাদ্দ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে; এমনকি একজন পরীক্ষকের কাছেই একই রকম উত্তরের জন্য প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যেত। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন মাত্রায় নম্বর দিতেন। যার ফলে অনেক ভালো শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট থেকে বঞ্চিত হতো এবং তুলনামূলকভাবে খারাপ শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করত। এটা নির্ভর করতো পরীক্ষকের উপর। বর্তমানে এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এটা আরও জরুরি যে, নম্বর প্রদানের মানদণ্ড ঠিক করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করলে বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে নম্বর বরাদ্দ একই রকম হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে বিচার করা সহজ হবে।

পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতার দায়িত্ব থাকবে প্রশ্ন তৈরির পর তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে যে উত্তর প্রত্যাশা করেন তার প্রতিটি ভাবগত উত্তরের জন্য অর্থাৎ উত্তরের প্রতিটি পয়েন্টের জন্য নম্বর বরাদ্দ করে একটি আদর্শ উত্তরপত্র তৈরি করা। পরীক্ষা হওয়ার পর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক উত্তরপত্র বিতরণের সময় প্রতিটি পরীক্ষককে এই মানদণ্ডভিত্তিক আদর্শ উত্তরপত্রের নমুনা সরবরাহ করতে হবে। পরীক্ষক তার ভিত্তিতে মূল্যায়নের কাজটি করবেন। এটি বাংলাদেশে অবশ্যই মূল্যযাচাইয়ের একটি বিকল্প পন্থা।

স্ব-মূল্যযাচাই

কোনো কাজ করতে গেলে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কাজটিকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধাপে ভাগ করার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এবং এ রকম বিভিন্ন ধাপের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করতে হয়। কাজটি সম্পন্ন করার পর পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কত কাছাকাছি পৌঁছানো গেল তাও বিবেচনা করতে হয় এবং কীভাবে আরো ভালো করে করা যেত তা নিয়েও চিন্তা করতে হয়। ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কাজকর্মে তার নিজের ভূমিকা, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ এবং কাজের তৃপ্তি ইত্যাদি শনাক্তকরণ ও তা অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ এবং কর্মসম্পাদনের পর এর ভুল-ত্রুটি, ব্যর্থতা-সফলতা যাচাই করে কাজটির উন্নয়নে কী করণীয় তা ঠিক করাই হচ্ছে স্ব-মূল্যযাচাই।

স্ব-মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগত দিক থেকে তার নিজের উন্নয়ন সাধন করা অর্থাৎ পেশাগত উন্নয়ন তার কর্তব্য যা কার্যকর শিখন-শেখানোয় ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সহায়তা করে। নিজের কর্মপরিবেশে অন্যের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরিতে এবং নিজের

পেশাগত উন্নয়নে স্ব-মূল্যযাচাই সহায়ক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্ব-মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ–

- কাজের প্রতি বা পেশার প্রতি আগ্রহ।
- জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন।
- কাজ করার উৎসাহ ও কর্ম চঞ্চলতা বৃদ্ধি।
- ব্যক্তিত্ব বিকাশ।
- সততার সংরক্ষণ।
- নৈতিকতার উন্নয়ন।
- অধ্যবসায়।
- নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- কর্মশক্তি বা পরিশ্রম করার সামর্থ্য বৃদ্ধি।
- ধৈর্য, সহনশীলতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন।
- আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা ও সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন।
- নেতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক যোগ্যতার ক্ষেত্র।
- প্রশাসনের সহিত সম্পর্ক ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে।
- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতায়।
- শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা এবং সময়জ্ঞান।
- মূল্যায়ন যোগ্যতা বা বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।
- তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ক্ষমতা।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দক্ষতা।

স্ব-মূল্যযাচাই থেকে শিখনীয় বিষয়সমূহ

আমেরিকান মনোবজ্ঞানী Joseph Luft (১৯১৬-২০১৪) এবং Harrington Ingham (১৯১৬–১৯৯৫) এর মতে (১৯৬৯), স্ব-মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এবং পেশাগত আচার-আচরণ সম্পর্কে নিচের চার ধরনের ক্ষেত্রের তথ্য জানতে পারেন–

- **নিজের উন্মুক্ত ক্ষেত্রসমূহ (Open Quadrant) :** নিজের যা জানা আছে এবং অন্যরা তা জানে (Known to self and to others)।
- **নিজের লুক্কায়িত ক্ষেত্রসমূহ (Hidden Quadrant) :** নিজের যা জানা আছে, কিন্তু অন্যরা তা জানে না (Known to self but not to others)।
- **নিজের অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষেত্রসমূহ (Blind Quadrant) :** নিজের যা জানা নেই, কিন্তু অন্যরা তা জানে (Known to others but not to self)।
- **অজানা বা অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রসমূহ (Unknown Quadrant) :** নিজের বা অন্যদের যা জানা নেই (Not known to self or others)।

স্ব-মূল্যযাচাই এর মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কার, পরিশীলিত ও দক্ষ করে তোলা সম্ভব যদি এ অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে ওঠে। অন্যকে সমালোচনা করার পূর্বে নিজের সমালোচনা করা উচিত। এটা হতে পারে এভাবে যে, আমাকে কী করা এবং কীভাবে করা উচিত ছিল? আমি কী করেছি? এই জিজ্ঞাসা স্ব-মূল্যযাচাইকে ত্বরান্বিত করে এবং এর মাধ্যমে দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব। সহজাত বা অর্জিত গুণাবলি সম্পন্ন যে কোনো শিক্ষকই শিক্ষক জীবনের প্রথম দিন থেকেই সুশিক্ষক হতে পারেন না এবং আশা করাও যায় না। শিক্ষকের সফলতা নির্ভর করে অনবরত অধ্যয়ন, শিক্ষণে অধ্যবসায় ও অভ্যাস এবং ব্যবহারিক শিক্ষাক্রিয়ার অভিজ্ঞতার উপর। শিক্ষকতার কোনো পর্যায়ে তিনি কতটা বিশ্বস্ততার সাথে তার কর্তব্য পালন করেছেন, শিক্ষার পরিবেশ তাঁর কাজের অনুকূলে কিনা, তাঁর পাঠদানে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট কিনা ইত্যাদিরও যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শিক্ষকের ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন প্রতিটি শিক্ষকের পরিচায়ক, গুণগত বৈশিষ্ট্য তেমনি তার পরিচয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষ গড়ার কারখানায় যারা প্রতিনিয়ত সেবাদান করে নিমগ্ন, যাদের কাজ শিক্ষকের মন ও মননের পরিচর্যা ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির গতিপথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষকদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সুকুমার শিল্পবোধ সম্পন্নও হতে হবে। সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিশু মানসকে বিকশিত করতে হবে। এ জন্য শিক্ষকতার সার্থকতা তার সাধনাশীল কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে। এই সার্থকতা লাভ করতে হলে তাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছ দর্পণে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে আত্মমূল্যায়ন করতে হবে।

নিচের বিষয়গুলোর নিরিখে শিক্ষক আত্মজিজ্ঞাসা করতে পারেন। নিরপেক্ষ যাচাইয়ের নিরিখে তিনি প্রকৃত জবাবটি বিশেষ ঘরে টিক চিহ্নিত করবেন। প্রতি শিক্ষাবর্ষে অন্তত তিনবার এ ধরনের আত্মসমীক্ষা করলে আত্মপর্যবেক্ষণ এবং স্ব-মূল্যযাচাই যথাযথ হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

বিষয়	**মান**				
ক. **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য**	৫	৪	৩	২	১
১. স্বভাব সুমধুর ও অমায়িক					
২. মেজাজ ভারসাম্য রাখার ক্ষমতা					
৩. আত্মসংযম					
৪. উদ্যমশীলতা					
৫. ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা					
৬. সততা ও বিশ্বস্ততা					
৭. নমনীয়তা					
৮. কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি					
৯. সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচার					
১০. সামাজিকতা					
১১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা					
১২. পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিবোধ					
১৩. ধৈর্য ও সহনশীলতা					
১৪. মার্জিত ব্যবহার					
১৫. পরমতসহিষ্ণুতা					
১৬. পরিমিতিবোধ					
১৭. গঠনশীল মনোভাব					
১৮. নতুনকে গ্রহণের ক্ষমতা					
১৯. সমঝোতাবোধ					
২০. সবার সাথে মেশার ক্ষমতা					
খ. পেশাগত বৈশিষ্ট্য					
১. শিক্ষকতার যোগ্যতা ও দক্ষতা					
২. শিক্ষা বিজ্ঞানের জ্ঞান ও পেডাগজি সংক্রান্ত ধারণা					
৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির জ্ঞান					
৪. সময় জ্ঞান					
৫. পাঠ পরিকল্পনা তৈরির যোগ্যতা					

৬. উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যোগ্যতা					
৭. উপকরণ ব্যবহারে আগ্রহ ও দক্ষতা					
৮. প্রশাসনিক দক্ষতা					
৯. বিষয়বস্তুর উপর স্পষ্ট ধারণা					
১০. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ধারণা					
১১. শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আগ্রহ					
১২. শ্রেণি সংগঠন ক্ষমতা					
১৩. প্রশ্ন করার দক্ষতা					
১৪. বিভিন্নধর্মী প্রশ্ন তৈরির যোগ্যতা					
১৫. মূল্যায়ন যোগ্যতা					
১৬. যোগাযোগ দক্ষতা					
১৭. অভিভাবকের সহিত সংযোগ স্থাপন					
১৮. সহকর্মীদের সহিত ব্যবহার ও সুসম্পর্ক					
১৯. ICT জ্ঞান ও এর ব্যবহার দক্ষতা					
২০. পেশার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ					

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে তার পেশাগত ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় করে বিদ্যালয় কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে এটাই প্রত্যাশিত। এর জন্য শিক্ষক নিজে কতটা যোগ্য স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি প্রতিনিয়ত তা বিচার করবেন এবং নিজেকে সব সময় সমসাময়িক পরিস্থিতির উপযোগী করে রাখবেন।

৫.৬ : শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নত করার জন্য শিখনযাচাই

শিখনমান উন্নয়নের জন্য শিখনযাচাই

শিক্ষার্থীর অর্জন বা শিখনের মানযাচাই করে তাকে এগিয়ে নিতে শিক্ষক নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন। যথাযথভাবে শিখনমান যাচাই করতে পারলেই তবে শিক্ষার্থীর শিখনের সাফল্য, অগ্রগতি এবং অবস্থা জানা সম্ভব। সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে শিখনমান উন্নয়নে ভবিষ্যতের করণীয় এবং নির্দেশনা কী হবে তা জানা যায়।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে এবং কতটা বাকি আছে শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিয়ে পড়ালেখায় তাকে সতর্ক করা যায়। শিক্ষার্থীর কার কী ধরনের বিশেষ সামর্থ্য ও দক্ষতা আছে তা জেনে কার জন্য কোনো্ ধরনের শিক্ষা বা কাজ উপযোগী তা নির্ধারণ সম্ভব।

শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির অবস্থা বুঝতে সম্ভব সব রকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং সে বিবেচনায় তার উপযোগী শিক্ষার ধরন নির্দেশ করা যায়। এভাবে শিখনমান যাচাইয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, অভ্যাস ইত্যাদি জেনে সঠিক পথনির্দেশনা ও পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিখন এবং সেইসাথে তার দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মানুষ বিবেচনায় তার মান উন্নীতকরণের পথনির্দেশ করাও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়।

অধিকন্তু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক পাঠদানকালে নিজস্ব কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পন্থায় মূল্যায়ন করতে পারেন। এতে করে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি সদা মনোযোগী এবং সক্রিয় থাকে। শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ত্রুটি বা সমস্যা বা দুর্বলতা শনাক্ত করে সেগুলো সারিয়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের ফলপ্রসূ প্রয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় অন্যদিকে তেমনি শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে থাকে।

নির্ণায়ক ও গাঠনিক মূল্যযাচাই

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক শিখন কার্যক্রম চলাকালীন দুই ধরনের মূল্যযাচাই করা যায়। একটি হচ্ছে নির্ণায়ক অন্যটি গাঠনিক মূল্যযাচাই।

নির্ণায়ক মূল্যযাচাই (Diagnostic Assessment)

যে ধরনের মূল্যযাচাইয়ে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় তাদের নির্ণায়ক মূল্যযাচাই বলে। এটি এমন এক ধরনের পারদর্শিতার অভীক্ষা যার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য উভয় দিক সম্পর্কে জানা যায়।

এ ধরনের অভীক্ষার উদ্দেশ্য হলো, শিখনের শিক্ষার্থীর দুর্বল দিকগুলো বিশেষভাবে নির্ণয় করা। এতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক স্কোর মানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ এখানে সামগ্রিক পারদর্শিতার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। এ ধরনের অভীক্ষায় অভীক্ষাপদের সংখ্যাও বেশি হয়। এতে অভীক্ষাপদগুলো নির্বাচন করা হয় শিক্ষার্থীরা কী ধরনের ভুল করতে পারে তার ভিত্তিতে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু আদর্শায়িত নির্ণায়ক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে পঠন ও গণিতের অভীক্ষাই বেশি। যেমন–

১. ডুরেলের পঠন অসুবিধা নির্ণায়ক অভীক্ষা (Durrell's Analysis of Reading Difficulty Test)
২. আইওয়া নীরব পঠন অভীক্ষা (Iowa Silent Reading Test)
৩. বাসওয়েল ও জনের পাটিগণিতের নির্ণায়ক অভীক্ষা (Buswell and John's Diagnostic Test for Fundamental Process in Arithmetic) ইত্যাদি।

এ ধরনের মূল্যযাচাইয়ের সুবিধা হলো, এগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং তার ভিত্তিতে সংশোধনমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। এর দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষণ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়।

গাঠনিক মূল্যযাচাই (Formative Assessment)

Form থেকে Formative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা সবলতা শনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা (remedial/measure) গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তৈরি বা গঠন করে নেওয়ার জন্য যে মূল্যায়ন তাকে বলে গঠনকালীন বা গাঠনিক মূল্যায়ন। প্রাক্-মূল্যায়ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন অথবা যে কোনোরূপ মূল্যায়নই যখন শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে গঠনের জন্য বা শিক্ষার্থীকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উন্নয়ন ও সুসংগঠিত করার কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলা হয় গঠনকালীন মূল্যায়ন।

গাঠনিক মূল্যযাচাই একটি চলমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিত উপায়ে তদারকি করার জন্য এ জাতীয় মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলত গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোর্স চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে কার্যক্রম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা তদারকি করা হয় তাকেই গাঠনিক মূল্যযাচাই বলা হয়।

Page Thomas-এর মতে, যে মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাবর্তনের (Feedback) মাধ্যমে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিখন-শেখানো পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম তাকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলে।

Ruth Sutton এর মতে, গাঠনিক মূল্যযাচাই হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

John W. Best এবং James V. Kahn বলেছেন, গাঠনিক মূল্যযাচাই একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনকালীন পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, কোনো নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হলো তার মাত্রা নিরূপণ এবং পূর্ণ সফল শিখন ঘটতে কতটুকু বাকি থাকল তার সুনির্দিষ্টকরণ।

Rag and Thomas-এর মতে, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয় তাই গঠনকালীন মূল্যায়ন।

Abel and Frisby বলেন, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য পরিচালিত মূল্যায়নই গঠনকালীন মূল্যায়ন।

Ahman and Flock বলেন, 'গাঠনিক মূল্যায়ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফলাবর্তন দেয় যার ভিত্তিতে শিখন-শেখানো প্রচেষ্টায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। এ মূল্যায়নে শিখনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে জানা যায়। সফল শিখন বা সার্বিক শিখনের জন্য এখনও আর কতটা বাকি তাও জানা যায়।'

গঠনকালীন মূল্যায়নের অধিকাংশই শ্রেণিকক্ষে সংগঠিত হয় বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মৌখিকভাবে বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেও এ মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আবার পাঠপূর্ব ও পাঠোত্তর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ব্যক্তিগত কাজ বা দলগত কাজ দিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও এ মূল্যায়ন হতে পারে। চেকলিস্ট, রেটিং স্কেল ইত্যাদি ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে গঠনকালীন মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এটি প্রাক্ মূল্যায়ন বা ভর্তি ও যোগ্যতা যাচাই কাজে ব্যবহৃত হয়। তার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বা শাখায় বিভক্ত করে বিভিন্ন দলের জন্য যথোপযুক্ত শিখন কার্যক্রম নির্ধারণ করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে গঠনকালীন মূল্যায়ন কার্যক্রমগুলো হলো–

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে প্রশ্নোত্তর পর্যবেক্ষণ।
- ব্যক্তিগত ও দলগত কাজ প্রদান করে কাজের মান পর্যবেক্ষণ।
- পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ।

চেকলিস্ট ব্যবহার

- শিক্ষার্থী কী জানতে পারল বা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করল তা জানার উদ্দেশ্যে।
- আচরণের কী পরিবর্তন হলো।
- দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিবর্তন হলো ইত্যাদির উপর চেকলিস্ট তৈরি করে শিখনযাচাই করা।

অভীক্ষার ব্যবহার

একটি অধ্যায় বা ইউনিটের পাঠদান শেষে বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মান নির্ধারণ করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনমানের উন্নয়ন করা যায়।

গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের সীমাবদ্ধতা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার দুর্বলতা শনাক্ত করে তা দূর করার জন্য গঠনকালীন মূল্যায়নের যথেষ্ট ভূমিকা থাকলেও তার কিছু অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সীমাবদ্ধতাগুলো হলো–

- গঠনকালীন মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান, ধারণা বা অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে যথাযথ ফলাবর্তন পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
- শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এ মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা না গেলে তাদের কাছে এটি একটি বাড়তি বোঝা মনে হতে পারে।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে এ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন বাস্তবায়ন বেশ দুরূহ হয়ে পড়ে।
- প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন বা পরীক্ষা, পুনঃপুন বাড়ির কাজ, অন্যান্য ধারাবাহিক মূল্যায়নমূলক কাজ শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এতে মূল্যায়নের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।
- শিক্ষার্থীর অনিয়মিত উপস্থিতি এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন বা গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার অভাবে কেবল অভীক্ষার মাধ্যমে করা হলে অত্যধিক সময় ব্যয়ের ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।
- শিক্ষকের অত্যধিক ক্লাসের বোঝা এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে।
- এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পাস-ফেল বা গ্রেড দেওয়া হয় না বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এ মূল্যায়নের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী নাও হতে পারে।

গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে গঠনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব অত্যধিক। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষক তার শিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা ও সবলতা শনাক্ত করে দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। শিক্ষার্থীও পাঠে তার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে। এ মূল্যায়নের ফলাবর্তনের মাধ্যমে অভিভাবকও তার সন্তানের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। গঠনকালীন মূল্যায়নের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়ন করতে পারেন। শিক্ষা প্রশাসকগণও এ ফলাবর্তনের মাধ্যমে সময় থাকতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক অর্থাৎ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গই গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথাসময়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

ক. শিক্ষকের কাছে গুরুত্ব

- গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যেন প্রান্তিক মূল্যায়নে কোনো বিপর্যয় না ঘটে।
- শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষাদান করেন। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারেন।
- শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা যাচাই করে লাগসই শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।
- যথাসময়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে সচেতন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি অভিভাবককে আরও যত্নবান করে তোলা যায়।

খ. শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্ব

- শিক্ষার্থী তার শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে দুর্বলতা দূর করার জন্য সচেতনভাবে অগ্রসর হতে পারে।
- বিশেষ দুর্বল দিকগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষকের বিশেষ সহায়তা ও পরামর্শ চাইতে পারে।
- অভিভাবককে তার অগ্রগতি ও দুর্বলতা জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলোচনা করতে পারে।
- সহপাঠীদের সাথে দলগতভাবে আলোচনা করেও নিজের দুর্বলতা দূর করতে পারে।
- প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের কারণে মূল্যায়নের প্রতি শিক্ষার্থীর সাধারণ ভীতি দূর হয়ে যায়।
- বিষয়বস্তুর পরিষ্কার ধারণা গঠনে গঠনকালীন মূল্যায়ন অত্যন্ত সহায়ক।
- ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।
- লেখাপড়ায় মনোযোগ ও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিতে গঠনকালীন মূল্যায়ন বেশ সহায়ক।

গ. শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের কাছে গুরুত্ব

- গঠনকালীন মূল্যায়নের ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের দুর্বলতা ও সবলতা শনাক্ত করতে পারেন।
- বিশেষজ্ঞগণ গবেষণামূলক কাজে এর ফিডব্যাক (feedback) ব্যবহার করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরবর্তী পরিমার্জন ও নবায়নের কাজে গঠনকালীন মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।

ঘ. শিক্ষা প্রশাসনের কাছে গুরুত্ব

- শিক্ষা প্রশাসকগণ শিক্ষাগত তদারকির মাধ্যমে গঠনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের কাজে এর ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।
- নিয়োগ, বদলী ও যথাস্থানে উপযুক্ত শিক্ষকের পদায়ন, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে গঠনকালীন মূল্যায়নের ফলাবর্তন ব্যবহার করতে পারে।

গঠনকালীন মূল্যায়ন কেবল অগ্রগতি যাচাইমূলক কার্যক্রমই নয় এটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখে, এমনকি শিক্ষকও শিখেন। বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, গবেষক সকলের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারই এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে গঠনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। গঠনকালীন মূল্যায়ন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক। মূলত শিক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ও গঠনকালীন শব্দদ্বয় সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

নির্ণায়ক মূল্যযাচাই ও গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য

নির্ণায়ক মূল্যযাচাই	গাঠনিক মূল্যযাচাই
১. এ ধরনের মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।	১. শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
২. এর অভীক্ষা পদগুলো বিশ্লিষ্ট।	২. এর অভীক্ষা পদগুলো ধারাবাহিক।
৩. এতে আংশিক স্কোরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩. এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
৪. এতে অভীক্ষা পদগুলো নির্বাচন করা হয় শিক্ষার্থীরা কী ধরনের ভুল করতে পারে তার ভিত্তিতে।	৪. শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে ধারাবাহিক অভীক্ষাপদ নির্ণয় করা হয় যা শিক্ষককে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে।
৫. এটি হঠাৎ করে যে কোনো সময় প্রয়োগ করা হয় যা শিক্ষার্থীর ভুলত্রুটি শনাক্ত করতে সহায়তা করে।	৫. এ ধরনের মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বছরে একাধিকবার করা হয় যার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।
৬. এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ভুলগুলো সংশোধিত হয়।	৬. এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পাঠ সংশোধনের সুযোগ থাকে এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নির্ণায়ক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

এ ধরনের মূল্যযাচাইয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখনের ভুলত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং তার ভিত্তিতে সংশোধনমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। এর দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

গঠনকালীন মূল্যায়ন শিক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন–

- শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রাত্যহিকভাবে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠনকালীন মূল্যায়ন সাহায্য করে।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।
- এটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমও ফলপ্রসূ করে তোলে। গঠনকালীন মূল্যায়ন ব্যতীত শিক্ষক কার্যকরভাবে তার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন না।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিস্তৃত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হন যা সামষ্টিক মূল্যায়নের সহায়ক।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচিকে পরিচালনা করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

সামষ্টিক মূল্যায়ন

একটি কোর্সের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য যে সময়সীমা নির্ধারিত থাকে তার শেষ প্রান্তে এসে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকেই বলা হয় প্রান্তিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নকে চূড়ান্ত মূল্যায়নও বলা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন দুই ধরনের হয়ে থাকে। কোর্স শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে যে মূল্যায়ন করা হয় তা হলো প্রান্তিক মূল্যায়ন। আবার চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সারাবছরের ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়নের ফলাফল সহযোগে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে বলা যায় সামষ্টিক মূল্যায়ন। Sum শব্দ থেকে Summative শব্দ গঠিত হয়েছে। Sum অর্থ সমষ্টি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোর্সব্যাপী সকল মূল্যায়নের ফলাফল নিয়ে যে সার্বিক মূল্যায়ন তাকেই বলা হয় Summative Evaluation বা সামষ্টিক মূল্যায়ন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের নিম্নরূপ একটি চিত্র দেওয়া হলো–

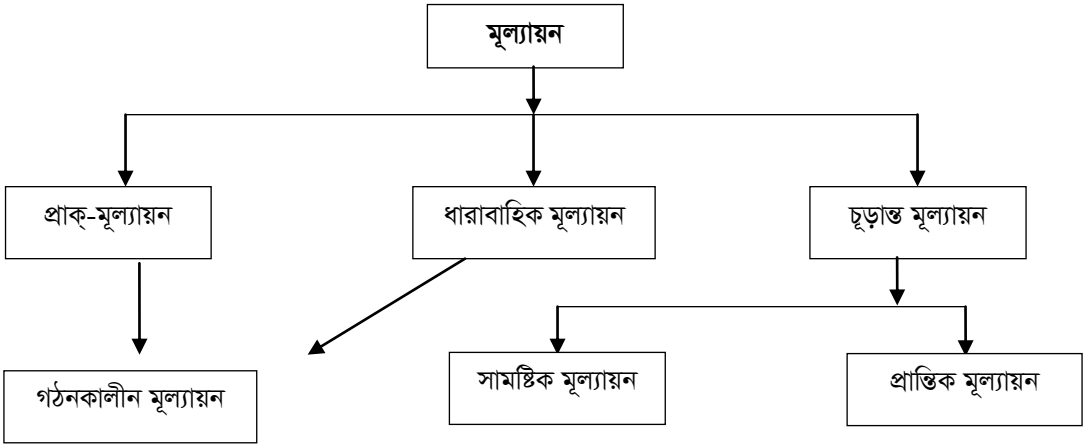

চিত্র : মূল্যায়নের প্রকারভেদ

তবে শিক্ষাবিদগণ মূল্যায়নকে গঠনকালীন (Formative) ও সামষ্টিক (Summative) এ দুটি ব্যাপক শ্রেণিতেই ভাগ করে থাকেন। কেউ কেউ ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়ন এ দুভাগেও মূল্যায়নের শ্রেণিবিভাগ করে থাকেন।

Rita Sud (রিতা সুদ) বলেন, "At the end of the tenure of a unit or a course of teaching the final or the latest evalution is called summative evalution. The main task of this evalution is to determine the comparative position of the pupils' success or ranking them to give marks, grade or certification for their achievments."

Norman E. Gronlund and Robert L. Linn বলেন, কোর্স সমাপনান্তে যে মূল্যায়ন তাই সামষ্টিক বা প্রান্তিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারণ করে সার্টিফিকেট প্রদান এবং কোর্সের উদ্দেশ্য কতটা বাস্তবায়িত হলো তা নির্ধারণ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদের এসব সংজ্ঞা, ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় চূড়ান্ত মূল্যায়ন, প্রান্তিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন শব্দাবলি প্রায় সমার্থক বা একই ধরনের মূল্যায়নের বিভিন্ন নাম।

সামষ্টিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

সামষ্টিক মূল্যায়নের বিভিন্ন ধারণা ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে তার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়–

- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি স্তর শেষে এ মূল্যায়ন করা হয়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সফলতার মান নির্ধারণ করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় বা পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ করা হয়।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও এ মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয়।
- এ মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকে না তবে পরবর্তী শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়।
- এ মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক ও অনমনীয়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটা সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

সামষ্টিক মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

১. এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই।
২. পাঠ্যসূচির প্রত্যেক বিষয়বস্তুর উপর এ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না; কেবল কতিপয় নির্বাচিত বিষয়বস্তুর ওপর মূল্যায়ন করা হয় বলে সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।
৩. প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার্থী সমগ্র পাঠ্যসূচির উপর প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে না বলে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
৪. এ ধরনের মূল্যায়ন সার্বিক জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা পরীক্ষা পাসের প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র কী?
(খ) বেঞ্জামিন ব্লুম এর ৩টি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. (ক) শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের ব্যবহার কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?
(খ) শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতার শিখনযাচাই কীভাবে করা হয়ে থাকে বর্ণনা করুন।

৩. (ক) পর্যবেক্ষণ (Observation) কী?
(খ) পর্যবেক্ষণের শ্রেণিবিভাগ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) মনোভাব কী?
(খ) মনোভাব গঠনের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২. (ক) শিখনে মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়?
(খ) শিক্ষার্থীদের সার্থক শিখন যাচাইয়ে মনোভাব জানা অপরিহার্য কেন– ব্যাখ্যা করুন।

৩. (ক) লিকার্টের মনোভাব-স্কেল গঠনের পদ্ধতির বিবরণ দিন।
(খ) মনোভাব পরিমাপে লিকার্টের স্কেল ব্যবহারের উপযোগিতা বর্ণনা করুন।

৪. (ক) স্ব-মূল্যযাচাই কী?
(খ) স্ব-মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. (ক) গাঠনিক মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়?
(খ) নির্ণায়ক মূল্যযাচাই ও গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০০৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা।

রায়, সুশীল, মূল্যায়ন : নীতি ও কৌশল (১৯৯৮), জলপাইগুড়ি, ভারত।

শিক্ষা মূল্যায়ন : নীতি ও ব্যবহারিক দিক (২০০১), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ ও ৩: শিখন সামগ্রী)-২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

উদ্দিন, এম জামাল ও চৌধুরী, মুহাঃ শহীদুল আমিন, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (২০১২)-বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, এনসিটিবি, ঢাকা।

চারু ও কারুকলা: ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা।

ইউনিট ৬ : বিভিন্ন প্রকার শিখনযাচাই : প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও অভীক্ষা গঠন

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৬.১ : ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিখনযাচাই

৬.২ : মানসম্মত প্রশ্ন, শ্রেণি অভীক্ষা ও পরীক্ষা সংগঠন

- রচনামূলক প্রশ্ন
- বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
- সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

৬.৩ : নম্বর প্রদানের মানদণ্ড ও নম্বর প্রদানের গ্রিড

৬.৪ : উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার বৈশিষ্ট্য

৬.৫ : প্রশ্ন মডারেশন ও চূড়ান্তকরণ।

ইউনিট ৬ : বিভিন্ন প্রকার শিখনযাচাই : প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও অভীক্ষা গঠন

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিখন। সাধারণভাবে শিখন হলো ব্যক্তির নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। শিখনের মাধ্যমেই প্রাণী তার আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায়। নতুন কিছু আয়ত্তকরণই শিখন। তা কতকগুলো ধারণা (ideas) হতে পারে আবার কতকগুলো কাজের দক্ষতাও (skills) হতে পারে। আর পরীক্ষা হলো যে কোনো একটি বিষয়ে বা কতকগুলো বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্য বা কৃতিত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। অন্যদিকে অভীক্ষা হলো কোনো বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পরিমাপের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রণীত একগুচ্ছ প্রশ্ন বা এই ধরনের কাজের নামই অভীক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের যে প্রশ্ন তৈরি করা হয় সেগুলো একেকটি অভীক্ষা। একজন শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কী পরিমাণ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করেছে তার সংখ্যাগত পরিমাণ নিরূপণ হলো পরিমাপ। পরিমাপ মূল্যায়নে সহায়ক। মূল্যায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন উপায়ে এবং নানাবিধ উপকরণ ও পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে পরিচালিত হয়। এগুলোর যথাযথ নির্বাচন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে মূল্যায়নের গুণগত মান। আর তাই শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল শিক্ষকের জন্য হাতিয়ারস্বরূপ। এই ইউনিটের সিলেবাসে উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে নিম্নবর্ণিত সাব ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে–

৬.১: ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিখনযাচাই

৬.২: মানসম্মত প্রশ্ন, শ্রেণি অভীক্ষা ও পরীক্ষা সংগঠন

- রচনামূলক প্রশ্ন
- বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
- সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

৬.৩: নম্বর প্রদানের মানদণ্ড ও নম্বর প্রদানের গ্রিড

৬.৪: উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার বৈশিষ্ট্য

৬.৫: প্রশ্ন মডারেশন ও চূড়ান্তকরণ।

৬.১ : ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিখনযাচাই

শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল দেশে এক রকম হবে না এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও সব ধরনের শিক্ষার কিছু সার্বজনীন উদ্দেশ্য আছে। বেঞ্জামিন ব্লুম এবং তার সহকর্মীগণ ১৯৬৫ সালে শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করে প্রত্যেক শ্রেণিকে আবার কিছু উপশ্রেণিতে/উপস্তরে ভাগ করেছেন। তিনি চিন্তন এবং আচরণের জটিলতার উপর ভিত্তি করে এদেরকে নিম্নবর্ণিত স্তরে বিন্যস্ত করেন–

ডোমেইন/ক্ষেত্র	বুদ্ধিবৃত্তীয় উদ্দেশ্য Cognitive	মনোপেশিজ উদ্দেশ্য Psychomotor	আবেগীয় উদ্দেশ্য Affective
সম্পর্ক	চিন্তন প্রক্রিয়া	মন ও পেশি	গুণাগুণ বিচার*
ধারাবাহিক উপস্তর	• জ্ঞানমূলক (Knowledge) • অনুধাবনমূলক (Comprehension) • প্রয়োগ (Application) • বিশ্লেষণ (Analysis) • সংশ্লেষণ (Synthesis) • মূল্যায়ন (Evaluation)	• অনুকরণ (Imitation) • সংশোধন সাপেক্ষে কর্ম সম্পাদন (Manipulation) • নিয়ন্ত্রণ (Control) • নিশ্চিতকরণ (Articulation) • সহজাতকরণ (Naturalization)	• গ্রহণ (Receiving) • সাড়া প্রদান (Responding) • গুরুত্ব প্রদান (Valuing) • অন্তঃর্ধারণ (Internalizing) • মূল্যবোধের দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ
*দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, আবেগ, মূল্যবোধ, কোনো কিছু গ্রহণ বা বর্জনের মাত্রা			

বেঞ্জামিন ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিক্ষাক্রমে শিখনফলগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। শিখনের বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিখন-শেখানোর কার্যক্রমে ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্র এবং এর উপস্তরগুলোর উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নে বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রগুলোকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে (জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ঠিক রেখে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে সমন্বিত করে উচ্চতর দক্ষতার স্তর হিসেবে)।

এই স্তরগুলো নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো–

১.	জ্ঞান (Knowledge)	১.	জ্ঞান (Knowledge)
২.	অনুধাবন (Comprehension)	২.	অনুধাবন (Comprehension)
৩.	প্রয়োগ (Application)	৩.	প্রয়োগ (Application)
৪.	বিশ্লেষণ (Analysis)	৪.	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর (Higher Order Thinking skill)
৫.	সংশ্লেষণ (Synthesis)		
৬.	মূল্যায়ন (Evaluation)		

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নবর্ণিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে–

জ্ঞান স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো– সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, বুঝতে পারা ইত্যাদি। কোনো কিছু বুঝতে পারলে তা ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ স্তর	প্রয়োগ বলতে বোঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

৬.২ : মানসম্মত প্রশ্ন, শ্রেণি অভীক্ষা ও পরীক্ষা সংগঠন

মানসম্মত প্রশ্ন ও শ্রেণি অভীক্ষা গঠন

যে কোনো আদর্শ বা উত্তম অভীক্ষার কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এগুলোর যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে পরিমাপের উপকরণ হিসেবে নিখুঁত বা নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। অভীক্ষার এই উপাদান বা শর্তগুলোকে বলা হয় সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য। নিম্নে সু-অভীক্ষার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো–

১. **যথার্থতা :** কোনো অভীক্ষার যথার্থতা বলতে বোঝায়, যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে অভীক্ষাটি দিয়ে যদি নিখুঁতভাবে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যই পরিমাপ করতে চাওয়া হয় এবং অভীক্ষাটি যদি শুধু তাই পরিমাপ করে, তবে সেটিকে যথার্থ অভীক্ষা বলা যায়। বিজ্ঞানের একটি অভীক্ষা যদি শিক্ষার্থীর হাতের লেখা বা ভাষাজ্ঞান পরিমাপ না করে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করে তবে অভীক্ষাটির যথার্থতা রয়েছে বলা যাবে। অভীক্ষার যথার্থতা যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। American Education and Psychological Association এবং National Council On Measurement and Evaluation যৌথভাবে যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো– কোনো অভীক্ষালব্ধ স্কোর থেকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথোপযুক্ততা, অর্থপূর্ণতা ও কার্যোপযোগিতা হলো এর যথার্থতা।

২. **নির্ভরযোগ্যতা :** অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় একটি অভীক্ষা কতটা নির্ভুল ও সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। যদি একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের দুইবারের ফলাফলের মধ্যে মিল আছে, তাহলে বলা যাবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

৩. **নৈর্ব্যক্তিকতা :** কোনো অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় যে, অভীক্ষাটির প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ অভীক্ষাটি নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হবে।

৪. **আদর্শায়ন :** কোনো অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে যে কৌশল অনুসরণ করা হয়, তাকে বলা হয় আদর্শায়ন। আদর্শায়িত অভীক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শ মান বা নম্বর নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয়।

৫. **পরিমিততা :** অভীক্ষার পরিমিততা বলতে বোঝায় অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বর প্রদানের ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হওয়া। যে অভীক্ষার প্রয়োগে ও ফলাফল প্রদানে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, সে অভীক্ষার পরিমিততা কম বলা চলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

রচনাধর্মী প্রশ্ন (অভীক্ষা) হচ্ছে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, ভাষাজ্ঞান এবং বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপনের পরিমাপ কৌশল। সাধারণভাবে যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে উত্তরের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বিষয়বস্তুর যথাযথ বিন্যাসে এবং উপস্থাপনের স্বাধীনতা প্রদান করে তাকে বলা হয় রচনাধর্মী প্রশ্ন । [The Essay type questions (test) is one which permits the pupil to select, organize and present his answer in written form].

রচনামূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

রচনামূলক প্রশ্নের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়–

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী অবাধে নিজের ইচ্ছামতো প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে পারে।
- পরীক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।
- পরীক্ষার্থী নিজস্ব যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ পায়।
- উত্তরের সীমারেখা নির্দিষ্ট নয় বলে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হয়।
- পরীক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের মধ্য থেকে বাছাই করে পছন্দকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সমর্থ হয়।

রচনামূলক প্রশ্নের সুবিধা

রচনামূলক প্রশ্নের নিম্নবর্ণিত সুবিধা রয়েছে–

- শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, বাক্যকাঠামো, রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিমাপ হয়।
- শিক্ষার্থী কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা অর্জন করে।
- রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। এ জন্য শিক্ষককে বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

রচনামূলক প্রশ্নের অসুবিধা

রচনামূলক প্রশ্নের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ–

- সীমিত গণ্ডি থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করায় যথার্থতা কম।
- নম্বর প্রদানে নির্ভরযোগ্যতার অভাবে ঘটে।
- পরীক্ষক প্রভাবমুক্ত থেকে নম্বর প্রদান করতে পারেন না বিধায় নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস পায়।
- শিক্ষার্থীর প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বারা পরবর্তী প্রশ্নের মূল্যায়ন প্রভাবিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা বা কৃতিত্বের সঠিক তুলনা করা যায় না।
- রচনামূলক প্রশ্নের প্রয়োগ করা সময় সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ।
- পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল নির্ধারণের কাজ সময় সাপেক্ষ।

রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীকে বিস্তারিতভাবে লিখতে হয় এবং তা সমাপ্ত করতে হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। এ কারণে রচনামূলক অভীক্ষায় সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতা, বর্ণনার নৈপুণ্য এবং চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করার ক্ষমতা যাচাই করা যায়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীর বিশেষ কতকগুলো যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য রচনামূলক প্রশ্ন অধিকতর কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো কেবল রচনামূলক প্রশ্ন দ্বারাই পরিমাপ করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে–

১. যে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করা হবে প্রশ্নের ভাষায় যেন তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার ভুল বোঝার অবকাশ যেন না থাকে।

২. প্রশ্নের ভাষা শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী হতে হবে। অজানা শব্দের ব্যবহার বা বাক্যের জটিলতার কারণে শিক্ষার্থীদের যেন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. প্রশ্নের উত্তরের সীমা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে হবে।

ত্রুটিপূর্ণ ও উন্নতমানের প্রশ্নের উদাহরণ

ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন	উন্নতমানের প্রশ্ন
শিল্পকলা উন্নয়নে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অবদান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।	বাংলাদেশে শিল্পকলা উন্নয়নে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উল্লেখ্যযোগ্য অবদান কী কী?

উপরে প্রদত্ত প্রশ্ন সম্পর্কে মন্তব্য

'যাহা জান' কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নয়।	'উল্লেখযোগ্য অবদান' একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।

৪. অল্প সংখ্যক বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্নের পরিবর্তে বেশি সংখ্যক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

৫. পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে হবে। একবারে পরীক্ষা নেওয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিতে হবে।

৬. প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে (সহজ থেকে কঠিন) সাজাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রথমেই যাতে কোনো কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে না পারার কারণে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে না ফেলে।

৭. শিক্ষার্থীদের ফলাফলের তুলনা করার প্রয়োজন হলে সকলের একই জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করতে হবে। এ কারণে প্রশ্ন বাছাইয়ের সুযোগ বাতিল করতে হবে।

৮. প্রশ্ন তৈরি করার পর সমতুল্য একটি দলের উপর প্রয়োগ করে উত্তর লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে এসব উপায় অনুসরণ করা হলে উন্নতমানের প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব হবে এবং সেগুলো ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাবে।

রচনামূলক অভীক্ষা পদের বৈশিষ্ট্য

যেসব যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন বেশি উপযোগী তা নিচে দেওয়া হলো–

তুলনা, পার্থক্য	দুইটি বস্তুর ধারণা বা ঘটনার তুলনা বা পার্থক্য নির্ণয় করা– উদাহরণ-১. উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের তুলনা কর, ২) জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
সারমর্ম, ব্যাখ্যা	কোনো বক্তব্যের সারমর্ম তৈরি করা বা ব্যাখ্যা দেওয়া– উদাহরণ-১. "আমাদের গ্রাম" কবিতাটির সারমর্ম লিখ, ২) 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি'– ব্যাখ্যা কর।
সম্পর্ক উপলব্ধি করা	কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক উপলব্ধি করা– উদাহরণ- কঠিন পদার্থ তরলে নিমজ্জিত করলে সেটির ওজন কমে যায় কেন?
যুক্তিসহ মতামত ব্যক্ত করা	মতামতের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা– উদাহরণ- 'অজ্ঞতা মূর্খতার সৃষ্টি করে'– বক্তব্যটি সম্পর্কে যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
তাৎপর্য নির্ণয় করা	তাৎপর্য নির্ণয় করা– উদাহরণ- পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই তথ্য থেকে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায়?
বর্ণনা দেওয়া	বিবরণ বা বর্ণনা দেওয়া– উদাহরণ-১. শরৎ ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা কর। ২. চিত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
লব্ধজ্ঞান প্রয়োগ করা	লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করা– উদাহরণ- বড় ড্রামকে না সরিয়ে ড্রামের ছোট মুখ থেকে বোতলে তেল নেবে কীভাবে?
উপায় নির্ধারণ করা	উপায় নির্ধারণ করা– উদাহরণ- তোমার এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

উপরে যেসব বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য রচনামূলক প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হলো তাদের মধ্যেই রচনামূলক প্রশ্নের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। আরও নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন রকমের রচনামূলক প্রশ্ন রচনা করা সম্ভব। এ ছাড়া উন্নতমানের রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করতে হলে আগে জানতে হবে প্রচলিত প্রশ্নগুলোতে কী ধরনের ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে।

রচনামূলক প্রশ্নের ত্রুটির ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ–

১. প্রশ্ন নির্বাচনে ত্রুটি

২. প্রশ্ন তৈরি করার ত্রুটি

৩. উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানে ত্রুটি।

প্রশ্ন নির্বাচনে ত্রুটি

যেহেতু রচনামূলক অভীক্ষায় সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন ব্যবহার করতে হয় সে কারণে সমগ্র সিলেবাসের উপর প্রশ্ন করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনো পাঠ্যপুস্তকে বিশটি অধ্যায় থাকে এবং মোট প্রশ্ন সংখ্যা যদি দশ হয় তাহলে মাত্র বিশটি অধ্যায় থেকে দশটি প্রশ্ন করা যায়। এই দশটি প্রশ্ন থেকে আবার যদি শিক্ষার্থীকে ছয়টি প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়ায়? শিক্ষার্থীকে কেবল তার পাঠ্যবইয়ের ১/৩ অংশের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা হয়। প্রশ্ন বাছাই করে উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকে বলে বিভিন্ন শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলকে তুলনা বা মেধা অনুযায়ী সাজানো যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এভাবে সকল শিক্ষার্থীর একই জ্ঞান বা দক্ষতা যাচাই করা হয় না।

প্রশ্ন তৈরি করার ত্রুটি

প্রচলিত প্রশ্নে যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তার একটি হচ্ছে, প্রশ্নের গঠন থেকে সচরাচর প্রশ্নের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। ফলে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে উত্তর দেয়। যাদের জন্য প্রশ্ন তৈরি করা হয়, অনেক সময় প্রশ্নের ভাষা তাদের উপযোগী হয় না। অজানা শব্দের ব্যবহার বা বাক্য গঠনের জটিলতার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নটি বুঝতে পারে না। এ কারণে প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা থাকলেও শিক্ষার্থী উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। কখনও কখনও প্রশ্নপত্রে উত্তরের সীমা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকে না। ফলে শিক্ষার্থীদের উত্তরের বিস্তৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এর দরুন সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য কতটা সময় প্রয়োজন হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করে নেওয়া হয় না। এ কারণে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সব প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও তা লিখে শেষ করা সম্ভব হয় না।

উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানে ত্রুটি

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব। একই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন রকমের নম্বর দেন। এমনকি সময় ও পরিবেশের পার্থক্যের কারণে একই পরীক্ষকের নম্বর প্রদানেও পার্থক্য হয়। পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবেই নম্বর প্রদানে এ ধরনের তারতম্য হয়ে থাকে। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রদর্শনের সুযোগ থাকে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই মানের উত্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর প্রদান করেন।

বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Type Tests)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা আধুনিককালে তৈরি করা হয়েছে প্রচলিত রচনামূলক অভীক্ষার দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য। রচনাধর্মী প্রশ্নপত্র এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রকৃতির দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের দ্বারাই ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। কিন্তু পদ্ধতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে দুটি আলাদা ধরনের।

প্রচলিত রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রধান ত্রুটি ব্যক্তিক (Subjectivity) এবং নম্বর দেওয়ার অনিশ্চয়তা (Inaccuracy in marking)। রচনাধর্মী অভীক্ষার ব্যক্তিধর্মতা দূর করে কৃতিত্বের মূল্যায়ন যতটুকু সম্ভব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার (Objective test) উদ্ভব হয়েছে। এ অভীক্ষার সাহায্যে জ্ঞানের যথাযথ পরিমাপ সাধন করা সম্ভব এবং অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর প্রভাব জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

যেসব অভীক্ষা পদ বা প্রশ্নে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়েরই ব্যক্তিগত প্রভাব আসার সম্ভাবনা থাকে না তাদের বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা। প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করা হয় যার একটি নির্দিষ্ট উত্তর আছে। পরীক্ষার্থীরা সে নির্দিষ্ট উত্তরটি কোনো শব্দ (Word) প্রয়োগ করে বা ধারণা নির্বাচন করে সম্পন্ন করে থাকে। তাই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে মনোবিদরা বলেছেন, "Objective tests are items which are highly structured and require the pupil to supply a word or two, or to select the correct answer from among a limited numbers of alternatives".

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective Type Tests)

- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একটি প্রধান গুণ হলো নির্ভরযোগ্যতা। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি, ভালোলাগা, মন্দলাগা, মেজাজ প্রভৃতির কোনো স্থান নেই। এ অভীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর থাকে। ফলে উত্তরপত্র বিচারের সময় নম্বরের তারতম্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরীক্ষায় যথার্থতা রক্ষিত হয়। কারণ উত্তরপত্র বিচারের প্রভাবিত না হয়ে উত্তরের ভিত্তিতে সঠিক নম্বর দিতে বাধ্য থাকেন।

- এ জাতীয় পরীক্ষায় উত্তর দানের জন্য সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় সমগ্র পাঠ্যবই থেকে বহু প্রকারের বহু সংখ্যক প্রশ্ন করা হয়। এতে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
- এ পরীক্ষায় সমগ্র পাঠ্যবই থেকে অনেক প্রশ্ন থাকে বলে বাছাই করে কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে ভালো নম্বর পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। তাই পরীক্ষার্থী সমস্ত বই ভলোভাবে পড়তে বাধ্য হয়।
- এ ধরনের প্রশ্নে অল্প সময়ে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলে পরীক্ষার্থীর ক্ষিপ্রতা বাড়ে।
- এ জাতীয় প্রশ্নে পরীক্ষার খাতা বা উত্তরপত্র দেখতে পরীক্ষকের সময় লাগে খুবই কম।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Objective Type Tests)

- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সুশৃঙ্খল চিন্তা, যুক্তি প্রয়াগে ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয় না। মৌলিক চিন্তা বা রচনাশক্তির পরীক্ষার সুযোগ এখানে নেই।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা পরিশ্রমসাধ্য এবং প্রশ্নপত্র ছাপাতে অধিক সময় ব্যয় হয়।
- প্রশ্নপত্র রচনায় পরীক্ষকের বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকলে সাধারণ বা নিম্নমানের প্রশ্নপত্র রচিত হবে। এতে পরিমাপ সঠিক হবে না।
- প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় অনুমানের উপর ভিত্তি করে দেওয়া চলে।
- এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন বা তাগিদ বড় একটা থাকে না।
- এ অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতার অনুশীলন ও পরিমাপের সুযোগ থাকে না। যদিও বাস্তব জীবনে ভাষাগত দক্ষতার মূল্য অপরিসীম।
- অনেক সময় পরীক্ষার্থী এ ধরনের প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝতে না পারায় ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Objective type test)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. সরবরাহ পদ্ধতি (Supply type) : সরবরাহ পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীকে উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়।
২. নির্বাচন পদ্ধতি (Selection type) : এখানে পরীক্ষার্থী সরবরাহকৃত কয়েকটি উত্তরের মধ্য হতে শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নেয়। যেসব প্রশ্নের উত্তরদানের সময় সরবরাহকৃত কতকগুলো উত্তরের মধ্য হতে একটিকে নির্বাচন করতে হয়, তাদের বলা হয় নির্বাচন প্রকৃতির প্রশ্ন।

এ দুটি প্রধান শ্রেণির অন্তর্গত প্রশ্নগুলোকে আবার তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. স্মরণ (Recall)
২. শূন্যস্থান পূরণ (Completion বা Gap filling)।

উত্তর নির্বাচনের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন পদ্ধতিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. বিকল্প উত্তর নির্বাচনমূলক অভীক্ষা (Alternative form tests)।
   যেমন– সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল, হ্যাঁ-না ইত্যাদি।
২. বহুনির্বাচনি (Multiple choice)
৩. মিলকরণ (Matching)
৪. নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো (Rearrangement)
৫. উপমা (Analogy)।

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা, সত্য-মিথ্যা, মিলকরণ ও বহু-নির্বাচনি অভীক্ষা

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষায় কোনো বাক্য হতে একটি শব্দ বাদ দিয়ে সে জায়গাটুকু খালি করে রাখা হয়। ওই খালি জায়গাটি একটি উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূরণ করতে হয়। অনেক সময় এ জাতীয় প্রশ্নে একটি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থী উপযুক্ত শব্দ (Word) বা শব্দ সমন্বয় দ্বারা বিবৃতির অসম্পূর্ণ অংশটি পূরণ করে।

উদাহরণ

প্রশ্ন : জাতীয় ডায়াবেটিক সচেনতা দিবস.....ফেব্রুয়ারি।
(উত্তর হিসেবে নির্দিষ্ট তারিখ লিখে বিবৃতিটি সম্পূর্ণ করতে হবে)।
প্রশ্ন : ..... দিয়ে বায়ুর চাপ মাপা হয়।
(উত্তর হিসেবে নির্দিষ্ট যন্ত্রের নাম লিখে বিবৃতি সম্পূর্ণ করতে হবে)।

সুবিধা

১. এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের উত্তরটি সরবরাহ করতে হয়। ফলে অনুমানের উপর ভিত্তি করে উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
২. শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা অনেকটা পরিচিত, ফলে প্রশ্ন দেখে তারা ভয় পায় না।
৩. এ জাতীয় প্রশ্ন তৈরি করা সহজ।
৪. গণিত বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্ন বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ এতে গণিতের কঠিন যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে কয়েকটা সংকেতের সাহায্যে এর উত্তর দেওয়া যায়।

অসুবিধা

১. শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষায় নম্বর দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নম্বর দেওয়া যায় না। ধরা যাক, একটি বাক্যের শূন্যস্থান কয়েকটি শব্দ দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে কিছু শব্দ বেশি প্রযোজ্য আবার কিছু শব্দ কম প্রযোজ্য। এখন কোনো শিক্ষার্থী যদি কম প্রযোজ্য শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করে, আর কোনো শিক্ষার্থী যদি বেশি প্রযোজ্য শব্দ দ্বারা পূরণ করে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষককে সমান নম্বর দিতে হয়। এতে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকে না।
২. এ ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীর পূর্ণ জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না।
৩. এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারল কিনা বোঝা যায় না।

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা তৈরি করার নিয়মাবলি

১. প্রশ্নের বাক্য এমন হওয়া উচিত যাতে নির্দিষ্ট শূন্যস্থানের জন্য একটি উত্তর থাকে।

   ভুল প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল জন্মগ্রহণ করেন.....। এখানে শূন্যস্থানটি খ্রিস্টাব্দে বা দেশের নাম ইত্যাদি দ্বারা পূরণ করা যায়। সুতরাং এ প্রশ্নটি আরও উন্নত করে নিম্নরূপভাবে লেখা যায়–

   প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার গ্রাহাম..... খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২. প্রশ্নে বইয়ের ভাষা হুবহু থাকা উচিত নয়। এতে শুধু স্মৃতির পরীক্ষা হয়, প্রকৃত বোঝার পরীক্ষা হয় না। মনে করা যাক, কোনো বইয়ে লেখা আছে, "পৃথিবীর স্থলভাগকে ৭টি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেকটি ভাগকে বলা হয় মহাদেশ।" এখন যদি শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষার সাহায্যে এ বাক্যের কোনো তথ্য জানতে চাওয়া হয় তবে হুবহু বাক্যটি প্রশ্নে না দিয়ে এটি একটু ঘুরিয়ে নিজের ভাষায় লেখার সুযোগ থাকা উচিত।
৩. একই বাক্যে বেশি শূন্যস্থান থাকা উচিত নয়। বেশি শূন্যস্থান থাকলে পরীক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামতো শব্দ বসিয়ে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। উদাহরণ : আণবিক শক্তি মানুষের অনেক..... সাধন করতে পারে, ফলে সমস্ত দুনিয়া আণবিক শক্তির নাম শুনলে..... হয়। এখানে শূন্যস্থানগুলো কমপক্ষে দুভাবে পূরণ করা যায়। যথা :

   (ক) আণবিক শক্তি মানুষের অনেক <u>উপকার</u> সাধন করতে পারে, ফলে সমস্ত দুনিয়া আণবিক শক্তির নাম শুনলে <u>পুলকিত</u> হয়।

   (খ) আণবিক শক্তি মানুষের অনেক <u>ধ্বংস</u> সাধন করতে পারে, ফলে মানুষ আণবিক শক্তির নাম শুনলে <u>আতঙ্কগ্রস্ত</u> হয়। এই বাক্যটিতে বেশি শূন্যস্থানের জন্য বাক্যের অর্থ দুই রকম হয়ে গেল!
৪. বাক্যের প্রধান শব্দটি বাদ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ প্রশ্ন তৈরি করা উচিত। যথা :

   ভুল প্রশ্ন : বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর.....।

   উপরের প্রশ্নের শূন্যস্থানটি 'সুন্দর', 'চমৎকার', 'আধুনিক' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পূরণ করা যায়।

   সুতরাং উন্নত ধরনের প্রশ্ন নিচে দেওয়া হলো–

   উন্নত প্রশ্ন : বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর..... অবস্থিত।

৫. প্রশ্নপত্রের সব কয়টি শূন্যস্থানের জন্য জায়গার দূরত্ব সমান হওয়া উচিত। তা না হলে বড় উত্তরের জন্য বেশি জায়গা এবং ছোট উত্তরের জন্য ছোট জায়গা রাখলে শিক্ষার্থীরা অনুমান করে উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। উদাহরণ–

(ক) প্রশ্ন : রাশিয়ার রাজধানী ..... শহরে অবস্থিত।

(খ) প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ..... শহরে অবস্থিত।

এখানে প্রথমটির উত্তর 'মস্কো' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 'ওয়াশিংটন ডিসি'। যেহেতু 'খ' প্রশ্নের চেয়ে 'ক' প্রশ্নের উত্তরের জন্য জায়গা কম লাগে, এ কারণে শিক্ষার্থীরা অনুমান করে নির্দিষ্ট উত্তর বের করতে পারবে। সুতরাং 'ক' প্রশ্নের উত্তরের জন্য ছোট জায়গা রাখা উচিত হয়নি।

৬. একটি শূন্যস্থান একটি মাত্র শব্দ দ্বারা পূরণ করা উচিত।

৭. খাতা দেখার পূর্বে উত্তরপত্র তৈরি করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ পরীক্ষার খাতা দেখার পূর্বে কোনো শূন্যস্থান কোনো শব্দ দ্বারা পূরণ হবে তা একটি কাগজে আগেই লিখে রাখা দরকার।

৮. প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় মনে রাখা উচিত যাতে বাক্য হিসেবে নম্বর বরাদ্দ না করে শূন্যস্থানের সংখ্যা হিসেবে নম্বর বরাদ্দ করা হয়। অর্থাৎ কোনো প্রশ্নপত্রে ছয়টি বাক্য থাকতে পারে এবং এ ৬টি বাক্যের মধ্যে ১০টি শূন্যস্থান থাকতে পারে। এখন নম্বর বরাদ্দের সময় মনে রাখা উচিত যে, এ ৬টি বাক্যের জন্য ৬ নম্বর বরাদ্দ না করে যেন ১০টি শূন্যস্থানের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়।

বিকল্প-উত্তর নির্বাচনমূলক অভীক্ষা

সত্য/মিথ্যা, ভুল/নির্ভুল, হ্যাঁ/না প্রভৃতি অভীক্ষাগুলো বিকল্প উত্তর নির্বাচনমূলক অভীক্ষার অন্তর্গত। নাম ভিন্ন হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রশ্নের ধরন এবং উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন। তাই এখানে শুধু সত্য-মিথ্যা অভীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সত্য-মিথ্যা (True-False)

সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ অভীক্ষায় একটি বাক্য থাকে এবং এর পার্শ্বে উভয়ের অংশে দুটি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। এ দুটি বিকল্প উত্তর সত্য ও মিথ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীরা বাক্যটি পড়ে ঠিক করবে যে বাক্যটি সত্য না মিথ্যা। এখানে উত্তরের অংশে সত্য/মিথ্যা না লিখে ভুল/নির্ভুল বা হ্যাঁ/না লেখা যায়। গঠন ও উত্তরের দিক থেকে প্রত্যেক প্রশ্নই এক। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সেসব প্রশ্নের (test item) সম্ভাব্য দুটি উত্তরের মধ্যে একটিকে নির্বাচন করে। সত্য/মিথ্যা, ভুল/নির্ভুল, হ্যাঁ/না প্রভৃতি জাতীয় প্রশ্নের এটিই হলো সাধারণ নাম।

উদাহরণ: কুমিল্লা গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত– সত্য/মিথ্যা। এখানে বাক্যটি সত্য। অর্থাৎ কুমিল্লা ঠিকই গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। সুতরাং শিক্ষার্থীরা সত্যের জায়গায় কোনো চিহ্ন দেবে বা মিথ্যা কেটে ফেলবে, এটা নির্ভর করবে প্রশ্নপ্রণেতার নির্দেশের উপর।

সুবিধা

১. যে বিষয়বস্তুর উপর দুটির বেশি একই জাতীয় উত্তর পাওয়া কষ্টকর সে জাতীয় বিষয়ের উপর এ অভীক্ষা কার্যকর। যেমন– অফিসের বিপদকালীন বহির্গমনের দরজা বাইরের দিকে খোলার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এখানে মাত্র দুটি সম্ভাব্য উত্তর থাকতে পারে। যথা– বাইরের দিকে অথবা ভেতর দিকে। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্য কোনো অভীক্ষা না দিয়ে সত্য/মিথ্যা অভীক্ষা দেওয়া ভালো। অথচ এ প্রশ্নটি শূন্যস্থান পূরণের সাহায্যেও ভালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যথা– অফিসের বিপদকালীন বহির্গমনের দরজা খোলার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ প্রশ্নের শূন্যস্থানটি পূরণ করতে হলে 'বাইরের দিকে' বা 'ভেতর দিকে' না লিখে একজন 'ভালোভাবে' লিখতে পারে। 'ভালোভাবে' লিখলে নম্বর দিতে হবে। এতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ এ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হলো 'বাইরের দিকে'।

২. এ ধরনের প্রশ্নে অল্প সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

৩. গণিত ও বিজ্ঞানে এ অভীক্ষা সুবিধাজনক। সাধারণত এসব বিষয়ের উপর যে প্রশ্ন হবে তার উত্তর দুটিই থাকে সত্য অথবা মিথ্যা। যেমন– পানিতে অক্সিজেন আছে– সত্য/মিথ্যা। এখানে শিক্ষার্থীরা দুটির মধ্যে একটি উত্তর দিতে বাধ্য। কারণ তৃতীয় কোনো উত্তর নেই।

অসুবিধা

১. পরীক্ষকের প্রশ্ন তৈরি করা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকলে এ অভীক্ষার সাহায্যে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।
২. যে সমস্ত বাক্যের উত্তর কেবল সত্য বা মিথ্যা হবে সে সমস্ত বাক্য ছাড়া মূল্যায়ন সঠিক হয় না।
৩. গণিত ও বিজ্ঞান ছাড়া এ অভীক্ষা অন্যান্য বিষয়ের উপর খুব বেশি প্রযোজ্য নয়। কারণ অন্যান্য বিষয়বস্তুর উত্তর অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে।
৪. অভীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর দিতে পারে। যেমন– একটি পরীক্ষায় দশটি সত্য/মিথ্যার প্রশ্ন আছে। এখন যদি কোনো শিক্ষার্থী না বুঝে দশটার উত্তরই সত্য লিখে দেয়। তবুও তার কিছু উত্তর শুদ্ধ হবে। এতে পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

সত্য-মিথ্যা অভীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করার নিয়মাবলি

১. মোট প্রশ্নে অর্ধেক বাক্য সত্য এবং বাকি অর্ধেক বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে পারে যে এক জাতীয় বাক্য বেশি আছে তাহলে তারা অনুমানের উপর ভিত্তি করে সবগুলোর জন্যই একই উত্তর দিয়ে দেবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে পারে কোনো প্রশ্নমালায় সত্য বাক্যের সংখ্যা বেশি তাহলে তারা সব বাক্যের উত্তরই সত্য লিখে দেবে।
২. প্রশ্নের ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে ভাষার জটিলতার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধায় পড়তে না হয়। আবার এমন ভাষাও ব্যবহার করা উচিত নয় যার ফলে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়।
৩. অনেকগুলো শব্দ আছে যা বাক্যে ব্যবহার করলে বাক্যের বিষয়বস্তুর উপর অনেক বেশি জোর সৃষ্টি হয়ে শিক্ষার্থীদের উত্তরের সুবিধা করে দেয়। সে জাতীয় শব্দ বাক্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। সে শব্দগুলো হচ্ছে 'শুধু', 'একাই', 'সমস্ত', 'কেহই না', 'সব সময়' ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো ব্যবহার করা হলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। সেসব শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো।
৪. প্রশ্নে জটিল বাক্য বা জটিল শব্দ থাকা উচিত নয়।
   ভুল প্রশ্ন : শিক্ষার্থীর পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে পরীক্ষার সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়– সত্য/মিথ্যা।
   শুদ্ধ প্রশ্ন : ভালোভাবে লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার সময় অসুবিধায় পড়তে হয়– সত্য/মিথ্যা।
৫. এ জাতীয় প্রশ্নে ঋণাত্মক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (Multiple choice type question)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষায় একটি প্রশ্ন থাকে এবং সে প্রশ্নের দুই বা ততোধিক সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। এ উত্তরগুলোর মধ্যে একটি উত্তর শুদ্ধ বা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি প্রযোজ্য হতে হবে। শিক্ষার্থীরা এ উত্তরগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য উত্তরটি বেছে প্রশ্নপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশ করবে।

তবে এ ধরনের প্রশ্নপত্রে এমন কোনো প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয় যার উত্তরকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে।

মিলকরণ প্রশ্ন (Matching type question)

মিলকরণ অভীক্ষায় দুই বা ততোধিক তালিকা থাকে। প্রশ্নপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো একটি তালিকার প্রত্যেকটি জিনিসের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে অন্য তালিকায় বর্ণিত জিনিসগুলো হতে বেছে প্রকাশ করতে হয়। যেমন– এক তালিকায় কয়েকটি জায়গার নাম এবং অন্য তালিকায় কয়েকটি দেশের নাম। এখন প্রশ্নপত্রে দেশের নামের সহিত মিল রেখে জায়গার নাম বা জায়গার নামের ক্রমিক নম্বর বসানোর নির্দেশ থাকতে পারে (অর্থাৎ কোনো জায়গা কোনো দেশে অবস্থিত)। এ ধরনের প্রশ্নকে মিলকরণ প্রশ্ন বলা হয়।

সুবিধা

১. এ অভীক্ষায় জায়গা কম লাগে। কারণ এক প্রশ্নে বর্ণিত তালিকায় সমস্ত উত্তরের জন্য একই জায়গায় সব উত্তর দেওয়া যায়।
২. কোনো বিশেষ বিষয় বা ঘটনাগুলো এক প্রশ্নে দেওয়া সম্ভব। এতে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এক জাতীয় অনেক তথ্যের পরীক্ষা করা যায়।
৩. এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান এবং সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।
৪. এ জাতীয় প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি রচনা করা যায়। কারণ বিকল্প উত্তরগুলো নির্বাচনের জন্য খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

অসুবিধা

১. এ জাতীয় অভীক্ষায় উত্তরদাতার খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পরীক্ষার ফল খারাপ করতে পারে।

২. এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তির পরিমাপ করা সম্ভব, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনো মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৩. এক প্রশ্নে বেশি সংখ্যক তথ্য দিলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হয়। এ জন্য প্রশ্নের দৈর্ঘ্য সীমিত রাখতে হলে উত্তর অনুমান করা সহজ।

মিলকরণ অভীক্ষা তৈরি করার নিয়মাবলি

১. এক প্রশ্নে একই জাতীয় বিষয় থাকা উচিত। অর্থাৎ কোনো প্রশ্নের সাহায্যে যদি বই ও এর লেখকের নাম জানতে চাওয়া হয় তবে প্রশ্নের অংশে শুধু কয়েকটি বইয়ের নাম থাকবে। আর উত্তরের অংশে কয়েকজন লেখকের নাম থাকবে।

এ ছাড়া একই প্রশ্নের মধ্যে বইয়ের লেখক, দেশের রাজধানী, যুদ্ধের তারিখ ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সংবলিত বিষয়বস্তু থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ একই ধরনের উত্তর নয় কিংবা একাধিক তথ্য সংবলিত বিষয়বস্তু নিয়ে মিলকরণ প্রশ্ন তৈরি করা যথার্থ নয়।

২. প্রশ্নের তালিকায় বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে উত্তরের তালিকায় বর্ণিত সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রশ্নে যদি নির্দেশনা থাকে যে "দেশের নামের সঙ্গে মিল রেখে রাজধানীর নামের ক্রমিক সংখ্যা বসান" তাহলে দেশের নাম যদি হয় পাঁচটি তখন রাজধানীর নাম হবে পাঁচের চেয়ে বেশি। নতুবা শেষের দিকের উত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনুমান করে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের যত সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর মিল করতে হবে প্রশ্নপত্রের তালিকায় তার চেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তর থাকতে হবে যাতে অনুমান করে উত্তর দেওয়া না যায়।

৩. কোনো বিষয়ের সহিত কোনো বিষয়ের মিল করতে হবে তা স্পষ্ট করে বলা উচিত।

৪. উত্তরের তালিকা অক্ষরের মান অনুসারে বা সময়ের মান অনুসারে সাজানো উচিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতকগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলো বিক্ষেপক (Distractors)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

	১০ জন লোকের গড় ওজন ১৩৮.৪ পাউন্ড তাদের মধ্যে ৩ জনের গড় ওজন হলো ১৮২ পাউন্ড।		উদ্দীপক
	বাকি ৭ জনের গড় ওজন কত পাউন্ড?		নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক.	১১৫.০০	বিক্ষেপক
	খ.	১২০.০০	সঠিক উত্তর
	গ.	১৪০.০০	বিক্ষেপক
	ঘ.	১৫৯.৭০	বিক্ষেপক

	ইউরো চালুর পূর্বে মার্ক কোন দেশের মুদ্রা ছিল?		উদ্দীপক/ নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক.	অস্ট্রিয়া	বিক্ষেপক
	খ.	ফ্রান্স	বিক্ষেপক
	গ.	স্পেন	বিক্ষেপক
	ঘ.	জার্মান	সঠিক উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কিছু নীতিমালা

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক–

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- 'হ্যাঁ'বোধক হতে হবে (আর 'না'বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে তা যাতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দেবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বিকল্প উত্তরসমূহ–

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually exclusive/Mutually inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সেক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনোটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো নির্দিষ্ট ক্রম (Sequence) না থাকে।

নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন করা যেতে পারে–

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)।

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এরপর থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্ন প্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বলতে গেলে নতুন প্রকৃতির। এ ধরনের বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং এর পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্নের সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের

সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর ও প্রয়োগ দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় অনুধাবন ও জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট। এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question-CQ)

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিখনীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালো মানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে উদ্দীপকের সাথে প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' প্রশ্নসমূহ করা হয়। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরে একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের দক্ষতা স্তর একটি কলামে উল্লেখ করা হয় এবং পাশের কলামে প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা দেওয়া হয়ে থাকে।

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ 'খ' তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। 'গ' অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং 'ঘ' অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বোঝা যাবে প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্ন প্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্ন প্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে, প্রশ্ন প্রণয়নকারী হয়তো তা চিন্তা করতে পারেননি। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোনো স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে। আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে– এমনটা ভাবা যাবে না। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে। আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোা অংশ লিখে আরেকটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন– কোনো একটি প্রশ্নের 'ক' অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পূর্বের প্রশ্নটির 'খ' অংশের উত্তর পরে দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন প্রণয়নকারী এবং পরিশোধনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে নির্দেশনাসমূহ

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখেও 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ') উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ') এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।

৬.৩ : নম্বর প্রদানের মানদণ্ড ও নম্বর প্রদানের গ্রিড

নম্বর প্রদানের মানদণ্ড

যখন কোনো ব্যক্তিকে খারাপ এবং কোনো ব্যক্তিকে ভালো বলা হয় তখন এটা স্পষ্ট যে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডে তাদের খারাপ অথবা ভালো বলা হয়ে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, নিশ্চয়ই ভালো বা খারাপ বলার জন্য কোনো না কোনো মানদণ্ড থাকা উচিত। কোনো কর্ম বা ঘটনার মূল্যযাচাই করার জন্য তার কিছু উপকর্ম বা উপঘটনা থাকে। এগুলো বিশ্লেষণ করে গাণিতিকভাবে অথবা উপলব্ধি দ্বারা তার একটি মান নির্ধারণ করা যায়। এ ধরনের সংখ্যা বা উপলব্ধিগুলোকে মান নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে মূল্যযাচাই এর হাতিয়ার হিসেবে ধরা হয় যা গাণিতিক নাও হতে পারে। যেমন– অতি ভালো, উত্তম, ভালো, মোটামুটি ভালো, মন্দ ইত্যাদি মানদণ্ডের বিচার করা যায়। এক্ষেত্রে মূল্যযাচাই নৈর্ব্যক্তিক হবে না, তবে প্রচলিত অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যযাচাই এভাবেই করা হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের পর দৃশ্যমান ফলাফল থেকে এ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নম্বর প্রদানসূচি/গ্রিড

প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকগুলো একই উদ্দেশ্যের সম্পাদিত কাজের মধ্যে তুলনা করে উপকাজের বা ধারণার উৎকৃষ্ট মান নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী সর্বজন স্বীকৃত একটি মান গাণিতিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই মান নির্ধারণ করার জন্য ধারণা বা উপকাজগুলোকে বিন্যস্ত করে তার প্রতিটি অংশে ভিন্নভাবে মূল্য আরোপ করা হয়। এটাই হচ্ছে নম্বর প্রদানসূচি। অর্থাৎ প্রতিটি মানদণ্ডের বিপরীতে মূল্য আরোপ করাই হলো নম্বর প্রদানসূচি। মানদণ্ডের বৈশিষ্ট্য হবে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য, প্রয়োগশীল। যারা মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং এর ফলাফল নিয়ে কাজ করবেন মূল্যযাচাই সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

নানা আঙ্গিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যযাচাই করার জন্য পরিকল্পনা পর্যায়ে মূল্যযাচাইয়ের মানদণ্ড ও নম্বর প্রদান সূচক নির্ধারণ করা দরকার। এরপর এর যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও প্রয়োগশীলতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানদণ্ড ঠিক করা প্রয়োজন। মূল্যযাচাইয়ের সাথে পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কার্যক্রমের দুর্বলতা ও কার্যক্রম পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও একই সাথে মূল্যযাচাইয়ের মান উন্নয়ন জড়িত থাকায় পরিমার্জন ও উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে হয়। নম্বর প্রদানের সূচি তৈরি করে মূল্যযাচাই করলে একদল শিক্ষার্থীর তুলনামূলক অবস্থান নানা আঙ্গিকে যথার্থভাবে নির্ণয় করা যায়। নম্বর প্রদানসূচির উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মূল্যযাচাইকে নির্ভরযোগ্য ও নৈর্ব্যক্তিক করা। নম্বর প্রদানসূচি তৈরি করতে হলে পরীক্ষককে অবশ্যই তার পূর্বে মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। এতে উদ্দেশ্যের সাথে ফলাফলের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়। নিচে মূল্যযাচাই ও নম্বর প্রদানসূচির একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

প্রশ্ন: শিশুর জন্য মায়ের দুধপান করার প্রয়োজনীয়তা কী? শিশু বেড়ে উঠার পেছনে এর প্রভাব কী?

উপরের প্রশ্নের মূল্যযাচাইয়ের জন্য নিচের নম্বর প্রদানসূচি/গ্রিড ব্যবহার করা যেতে পারে–

স্কোরিং পয়েন্টস (নম্বর প্রদানের উপকাজ বা উপাদান)	নম্বর
মাতৃদুধে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান আছে	১
মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ে	১
এতে মা ও শিশুর সম্পর্ক নিবিড় হয়	১
মা তার নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হন	১
ফলে শিশুর স্বার্থে মা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হন	১
মোট	৫

শিক্ষকের কাছে যদি এ সূচি থাকে তাহলে উপরের প্রশ্নের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী প্রদত্ত জবাবের মান এ মানদণ্ডে বিচার করে মূল্যায়ন করা যায়।

নম্বর প্রদানসূচির সুবিধা

১. নম্বর প্রদান নৈর্ব্যক্তিক হয়;
২. সহজে নম্বর প্রদান করা যায়;
৩. সুনির্দিষ্টভাবে নম্বর দেওয়া যায়;
৪. সকল পরীক্ষক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে একই ধারণা পোষণ করেন;
৫. সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

৬.৪ : উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার নানা স্তরে বা শ্রেণিতে কারিকুলামে উল্লিখিত শিখনফল অর্জিত হলো কিনা তা পরিমাপের নানা কৌশল আছে। এ কৌশলগুলোর মধ্যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থার সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এর উপর ভিত্তি করেই প্রকৃত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নানা স্তরে বিভাজন করা সম্ভবপর হয়। এ বিভাজন থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি তার উপযোগী কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে নিতে পারে। সুতরাং শিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ এরং মান উন্নয়নে প্রশ্নপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণেতাকে শিক্ষা সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হয়। একই সাথে বিশ্বের নানাস্থানে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হয়। প্রশ্ন প্রণেতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি এতে প্রভাব বিস্তার করে। উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার কী জাতীয় ব্যক্তিগত যোগ্যতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, গুণাগুণ ও পেশাগত আচরণ থাকতে হবে তা বিশ্লেষণ করলেই বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যাবে। নিচে উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো–

জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য

উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার জ্ঞানগত যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা নিম্নরূপ–

১. পাঠ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান
২. উত্তম ভাষাজ্ঞান
৩. আধুনিক প্রশ্ন প্রণয়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা
৪. শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান
৫. শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান
৬. শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা
৭. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা
৮. শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বিষয়ক ধারণা
৯. পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা
১০. পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
১১. সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা
১২. শিক্ষায় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে ধারণা
১৩. পরীক্ষা পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা
১৪. পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা
১৫. সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
১৬. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা
১৭. অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য জানা
১৮. শিক্ষার্থীর চাহিদা ও অগ্রগতি জানার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
১৯. শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান
২০. শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান।

দক্ষতামূলক বৈশিষ্ট্য

উত্তম প্রশ্নপ্রণেতার নিম্নরূপ দক্ষতামূলক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন–

১. মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নির্ধারণ দক্ষতা
২. বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা
৩. বিভিন্ন ধরনের চিন্তন দক্ষতা (বিমূর্ত চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, প্রতিফলনমূলক চিন্তন, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন ইত্যাদি)।
৪. দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করার দক্ষতা
৫. পাঠ্যক্রমে বিষয়ের আনুভূমিক ও উল্লম্ব বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন বিন্যাসের দক্ষতা
৬. চিন্তার উদ্রেকমূলক ও সৃজনশীলতায় সহায়ক প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা
৭. শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ দক্ষতা
৮. প্রশ্নপত্রের ত্রুটি সংশোধনের সক্ষমতা
৯. ভাষার ব্যবহার দক্ষতা

১০. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা
১১. পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করার দক্ষতা
১২. প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ ও মাত্রা নির্ধারণ দক্ষতা
(প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনায় উচ্চ মেধাসম্পন্ন এবং কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।)
১৩. মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করার যোগ্যতা
১৪. অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য নতুন পরিস্থিতি তৈরির দক্ষতা
১৫. প্রশ্নপত্রের পদের (Item) কাঠিন্য-মাত্রা নির্ধারণ দক্ষতা (এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।)
১৬. নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরির দক্ষতা (শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।)
১৭. প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করার দক্ষতা
১৮. প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বণ্টন বা বিন্যাস করার দক্ষতা।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

উত্তম প্রশ্ন প্রণেতার যেসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. মূল্যবোধ
২. কর্তব্যপরায়ণ
৩. সময় সচেতনতা
৪. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিমত্তা
৫. দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ী
৬. শিক্ষকতার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব
৭. সততা ও নীতিবোধ
৮. উদ্যমশীলতা
৯. নমনীয়তা
১০. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানসিক প্রস্তুতি
১১. ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা
১২. প্রশিক্ষণ গ্রহণের মানসিকতা
১৩. আত্মমূল্যায়ন ও আত্মপরিবীক্ষণ
১৪. সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি
১৫. পরিমিতিবোধ
১৬. অধ্যবসায়
১৭. ধৈর্য
১৮. নতুনকে গ্রহণের মনোভাব
১৯. সংকল্পে সুদৃঢ়
২০. সৃজনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সক্রিয়তা
২১. আত্মত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা
২২. বিশ্বস্ততা
২৩. সহকর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণের মানসিকতা
২৪. নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর মনোভাব।

৬.৫ : প্রশ্ন মডারেশন ও চূড়ান্তকরণ

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে প্রশ্নের উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং সংশোধনের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে মডারেশন বা পরিমার্জন বলা হয়। যে কোনো স্তরের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পর তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল করার লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মডারেশন করতে হয়। মডারেশনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ত্রুটিমুক্ত করা হয়।

কার্যকরভাবে প্রশ্ন পরিশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেট তৈরিতে মডারেটরগণ পরস্পরকে সহযোগিতা করেন। মডারেটরগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো প্রশ্নপত্র নির্ভুলভাবে মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। কারণ একাধিক ব্যক্তির চিন্তা একজনের চিন্তার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

প্রশ্নপত্র প্রণেতা অন্তর্ভুক্তকরণ

যেহেতু প্রশ্নপত্র প্রণেতাগণ তাঁদের নিজ নিজ তৈরি প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানেন সেহেতু তাদের পরিশোধন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করলে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল পাওয়া যায়। এর অর্থ হলো, পরিশোধনের উদ্দেশ্যে একদল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হয়ে প্যানেল গঠন করতে পারেন। একটি প্যানেলে প্রশ্নপ্রণেতাগণ এবং এক বা একাধিক স্বতন্ত্র মডারেটরগণ থাকতে পারেন। ফলে অনেকগুলো অভিজ্ঞ লোকের মতামতের বিনিময় হয় এবং যুক্তির নিরিখে এবং নির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হয়। এভাবে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হলে তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পায়।

মডারেশনের মূলনীতি

একজন স্বতন্ত্র সদস্যের সভাপতিত্বে এ প্যানেল সকল প্রশ্ন যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কার্যকরভাবে পরিশোধনের জন্য একজন মডারেটরকে নিম্নলিখিত মূলনীতির সাথে পরিচিত থাকতে হয়–

- নির্ধারিত বিষয়ে শ্রেণি পাঠদানের অভিজ্ঞতা;
- ভালো এবং যথার্থ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন কৌশল;
- ভালো এবং যথার্থ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন কৌশল;
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক (Specification Grid) তৈরি এবং মূল্যায়ন করা;
- যথাযথ ও পরিপূর্ণ মূল্যায়নের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা মেনে চলা (Marking Guideline/Scheme/Rubric) এবং প্রস্তাবিত নমুনা উত্তর (Suggested Model Answer) সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা;
- পরীক্ষার জন্য নমুনা উত্তরসহ ভারসাম্যপূর্ণ প্রশ্নপত্র তৈরি করা।

মডারেটরদের কাজ

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, ভাষাগত সহজীকরণ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের যে কোনো অস্পষ্টতা দূর করার বিষয়ে মডারেটরগণকে সচেতন হতে হবে।

মডারেটরদের নিয়ে গঠিত প্যানেল ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। সব ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছানো নাও সম্ভব হতে পারে, এ কথা মনে রেখেই বিজোড় সংখ্যক (odd number) মডারেটরদের সমন্বয়ে প্যানেল গঠন করতে হবে। অর্থাৎ মডারেটরদের প্যানেলে মতানৈক্য দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী যে সিদ্ধান্ত আসবে প্যানেল চেয়ারম্যান তা মেনে নেবেন।

পরীক্ষার মাধ্যমে যে মূল্যায়ন তার যথার্থতার (validity) মানোন্নয়নের জন্য মডারেটরগণ একটি প্যানেল হিসেবে প্রশ্নসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন এবং পরস্পরের সাথে মতবিনিময় করবেন। প্যানেলের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন/অন্যান্য ধরনের প্রশ্ন সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখতে হবে এবং যে কোনো পরিবর্তন বা কোনো প্রশ্ন বাতিলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পরামর্শ রাখবেন।

প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ

যদি প্রশ্ন প্রণেতাদের কাজ প্রশ্ন তৈরি করা হয় তাহলে মডারেটরদের কাজ হবে প্রশ্নসমূহ একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র তৈরি করা। তাঁরা এ কাজটি করতে পারেন বিভিন্ন প্রশ্ন প্রণেতাদের তৈরি প্রশ্নসমূহ থেকে প্রশ্ন বাছাই করে। এর ফলে চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্রটি ভারসাম্যপূর্ণ, সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থ (valid) হতে পারে। যদি কোনো বিষয়ে একাধিক প্রশ্নপত্র তৈরি

করা হয় তাহলে প্রশ্নপত্রসমূহের মধ্যে সু-সামঞ্জস্য আনয়নের ক্ষেত্রে সমতা থাকতে হবে এবং মডারেটরদের বিচারে প্রশ্নপত্রসমূহের কাঠিন্যের মাত্রা সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে।

প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য এবং মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মডারেটরগণ বিশেষভাবে বিবেচনায় আনেন এবং কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেন। চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্রটিতে সকল মডারেটরগণের স্বাক্ষর থাকে এবং মূল্যবান স্পর্শকাতর দলিল (পাণ্ডুলিপি) গোপনীয় হিসেবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষিত হয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) মিলকরণ অভীক্ষা তৈরি করার নিয়মাবলি লিখুন।
(খ) সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধাগুলো কী?

২. (ক) সম্পূর্ণকরণ জাতীয় অভীক্ষা কী? এর অসুবিধাগুলো লিখুন।
(খ) সু-অভীক্ষার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) জ্ঞানগত ক্ষেত্রের ছয়টি উপস্তরের ব্যাখ্যা দিন।
(খ) শ্রেণি ও বিষয় উল্লেখ করে প্রতিটি উপস্তর হতে একটি করে শিখনফল যাচাইয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

২. (ক) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
(খ) বহুনির্বাচনী অভীক্ষা গঠনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

৩. (ক) রচনামূলক অভীক্ষা কীভাবে প্রণয়ন করতে হয়? রচনামূলক অভীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।
(গ) রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পার্থক্য লিখুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০০০), মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ১ এবং ৩), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ৪ এবং ৫), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০০৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঢালী, স্বপন কুমার, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০১৩), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

হাবীব, মোঃ আহসান এবং আন্যান্য, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৩), মিতা ট্রেডার্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ), সেসিপ, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৪।

হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৬ খ্রি :।

ইউনিট ৭ : অভীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যাকরণ

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৭.১: গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয়

৭.২: আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

৭.৩: স্বাভাবিক বণ্টন

৭.৪: নম্বর বণ্টনের ব্যাখ্যাকরণ বা বিশ্লেষণ।

ইউনিট ৭ : অভীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যাকরণ

পরিসংখ্যান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যার সাহায্যে পরিমাপ সম্পন্ন তথ্যের সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করে অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোনো বিষয়ের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি তৈরিতে, বিশ্লেষণ ও উচ্চতর চিন্তন দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিসংখ্যান একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষা বিজ্ঞানের সকল শাখায় এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। পরীক্ষার ফলাফলে প্রাপ্ত নম্বরকে (স্কোরকে) বিন্যস্ত করে অর্থপূর্ণ রূপ দেওয়া, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক পরিমাপ করা, বোধগম্যতার জন্য গাণিতিক উপাত্তকে সারণিবদ্ধ করে চিত্তাকর্ষক লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং নানা ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের মাত্রা এবং প্রক্রিয়া, একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যক্রমের তুলনামূলক অর্থবহ বিশ্লেষণ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে করা হয়।

অভীক্ষার আদর্শায়িতকরণে পরিসংখ্যানের ব্যবহার অতুলনীয়। গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিসংখ্যানের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে এবং নতুন ধারণা প্রয়োগে কর্মসহায়ক গবেষণা, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনিভাবে শিক্ষার আধুনিকায়নে পরিসংখ্যান যোগ করে নতুন মাত্রা। পরিসংখ্যানই এর চালিকাশক্তি। শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলি সংগ্রহ ও তাৎপর্য নির্ণয় করে শিক্ষার্থীর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ সহায়ক পরিবর্তন আনতে পরিসংখ্যান দিকনির্দেশনা দেয়। যে কোনো চলমান প্রকল্পের তাৎক্ষণিক অবস্থা জানতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যের পারিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ তার প্রকৃত রূপকে উদ্ভাসিত করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে। এ থেকে বোঝা যায়, পরিসংখ্যান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনে নিত্য সাথী। অভীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যাকরণের জন্য পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ইউনিটের সিলেবাসে উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে চারটি সাব ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন–

৭.১: গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয়
৭.২: আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়
৭.৩: স্বাভাবিক বণ্টন
৭.৪: নম্বর বণ্টনের ব্যাখ্যাকরণ বা বিশ্লেষণ।

পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

স্কোর : বস্তু বা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা গুণের পরিমাপের সংখ্যাবাচক প্রকাশকে স্কোর বলে। যেমন– ফুটবলে গোল সংখ্যা, ক্রিকেটে রান সংখ্যা, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদি যা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত।

অবিন্যস্ত স্কোর : স্কোরগুলো ক্রম অনুযায়ী সাজানো অবস্থায় না থাকলে সেগুলোকে অবিন্যস্ত স্কোর বলা হয়। যেমন– ৬, ৯, ৩, ৫, ৮, ২, ৫, ৪।

বিন্যস্ত স্কোর : স্কোরগুলো কোনো গুণ বা ক্রম অনুসারে সাজানো অবস্থায় থাকলে সেগুলোকে বিন্যস্ত স্কোর বলা হয়। যেমন– ৭ জন শিক্ষার্থীর ২০ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ক্রম অনুসারে সাজানো হলে– ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯।

চলক : যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কর্ম দক্ষতাকে স্কোর দ্বারা প্রকাশ করা যায় সেগুলোকে বলা হয় চলক। ক্রিকেট খেলায় 'ক' দল ২৬০ রান করেছে। এখানে রান হলো চলক এবং ২৬০ রান হলো স্কোর।

অবিচ্ছিন্ন চলক : যেসব চলক নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে যে কোনো সংখ্যামান গ্রহণ করতে পারে, তাদের অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন- ১ টাকা, ১.৭৫ টাকা, ৩ টাকা, ৬.৫০ টাকা, ৭.৬৫ টাকা ইত্যাদি। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন– কোনো বস্তুর ওজন, উচ্চতা, মানুষের রক্তচাপ ইত্যাদি। (অর্থবোধক ক্ষুদ্রতম অংশ কল্পনা করা যেতে পারে)।

বিচ্ছিন্ন চলক : যেসব চলকের মানকে ভগ্নাংশে দেখানো যায় না, শুধু পূর্ণ সংখ্যার ভিত্তিতে উপস্থাপন করা যায় তাদের বিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন– ১, ৪, ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩.৫ বা ৫.২ জন শিক্ষককে কল্পনা করা যায় না। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন– ক্লাসের ছাত্রের সংখ্যা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি। (অর্থাৎ অর্থবোধক ক্ষুদ্রতম অংশ কল্পনা করা যায় না)।

ফ্রিকোয়েন্সি : এক গুচ্ছ স্কোরের মধ্যে কোনো একটি স্কোরের আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে ওই স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সি বা পৌন:পুন্য (গণসংখ্যা) বলে। যেমন– ৭ দিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৩ সে.মি., ৪ সে.মি., ২ সে.মি., ৬ সে.মি., ৪ সে.মি., ৫ সে.মি., ৩.৫ সে.মি.। এখানে ৪ সে.মি. বৃষ্টিপাতের ফ্রিকোয়েন্সি হলো ২।

ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন : যে পদ্ধতিতে ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী স্কোরগুলোকে সাজানো হয় তাকে ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন বলে।

শ্রেণি ব্যবধান : স্কোরগুচ্ছকে যখন কতকগুলো নির্দিষ্ট দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয় তখন এই দলকে শ্রেণি ব্যবধান বলে।

বিস্তার : স্কোরগুচ্ছের বৃহত্তম স্কোর ও ক্ষুদ্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে বিস্তার বলে। বিস্তার নির্ণয়ের সূত্র হলো, বিস্তার = (বৃহত্তম স্কোর-ক্ষুদ্রতম স্কোর) + ১

নিচে ৪০ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর (স্কোর) দেওয়া আছে। এর বিস্তার হলো–

৩০	৫৬	৩৭	৬১	৪৩	৫৯	৬২
৬৬	৪৬	৫৩	৫০	৩৪	৩৮	৫২
৬০	৪৯	৫৫	৫৭	৩৯	৬৪	৫৮
৪০	৪৫	৬৭	৪১	৩৫	৬৩	৪৭
৪২	৪৯	৪৮	৫৪	৬৮	৫৪	৭২

স্কোরগুচ্ছ

ক্ষুদ্রতম স্কোর

৩০	৫৬	৩৭	৬১	৪৩	৫৯	৬২	৫১
৬৬	৪৬	৫৩	৫০	৩৪	৩৮	৫২	৪২
৬০	৪৯	৫৫	৫৭	৩৯	৬৪	৫৮	৫৫
৪০	৪৫	৬৭	৪১	৩৫	৬৩	৪৭	৭০
৪২	৪৯	৪৮	৫৪	৬৮	৫৪	৭২	৫৩

বৃহত্তম স্কোর

∴ বিস্তার = (৭২-৩০) + ১
= ৪২+১
= ৪৩

স্কোরগুচ্ছ সুবিধাজনক দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা

স্কোরগুচ্ছকে যখন কতকগুলো নির্দিষ্ট দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয় তখন এই দলকে শ্রেণি ব্যবধান বলে।

$$\text{শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা} = \frac{\text{বিস্তার}}{\text{শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য}}$$

এখানে বিস্তার হলো ৪৩। শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য = ৫ নিলে

শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা = $\frac{৪৩}{৫}$ = ৮.৬

অর্থাৎ এখানে ৯টি শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা নিতে হবে।

(শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা বা দলের সংখ্যা ভগ্নাংশ হলে স্কোরগুলোকে বিন্যস্ত করলে যথাযথভাবে বিন্যস্ত হবে না। সে ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যায় নিতে হবে যেন কোনো স্কোর বাদ না পড়ে)।

শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য = ১০ নিলে

শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা = $\frac{৪৩}{১০}$ = ৪.৩

অর্থাৎ এখানে ৫টি শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা নিতে হবে।

শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা	শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ৫	শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ৫	শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ১০	শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ১০
১	৭০-৭৪	৬৮-৭২	৭০-৭৯	৬৫-৭৪
২	৬৫-৬৯	৬৩-৬৭	৬০-৬৯	৫৫-৬৪
৩	৬০-৬৪	৫৮-৬২	৫০-৫৯	৪৫-৫৪
৪	৫৫-৫৯	৫৩-৫৭	৪০-৪৯	৩৫-৪৪
৫	৫০-৫৪	৪৮-৫২	৩০-৩৯	২৫-৩৪
৬	৪৫-৪৯	৪৩-৪৭	উভয় ক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবধান ১০ এবং স্কোরগুচ্ছের কোন স্কোর বাদ পড়েনি	
৭	৪০-৪৪	৩৮-৪২		
৮	৩৫-৩৯	৩৩-৩৭		
৯	৩০-৩৪	২৮-৩২		
	উভয় ক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবধান ৫ এবং স্কোরগুচ্ছের কোন স্কোর বাদ পড়েনি			

শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা ভগ্নাংশ হলে পূর্ণ সংখ্যায় নিতে অতিরিক্ত স্কোরকে বৃহত্তম স্কোরের দিকে বা ক্ষুদ্রতম স্কোর একদিকে অথবা উভয় দিকে বাড়ানো যেতে পারে। সকল ক্ষেত্রে বিস্তার সমান হতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো স্কোর বাদ না পড়ে।

শ্রেণি ব্যবধানের প্রকৃত সীমা

প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের দুটি সীমা আছে। যথা : উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির নিম্নসীমা হলো ৭০ এবং উচ্চসীমা হলো ৭৪। ৭০ বলতে প্রকৃতপক্ষে ৬৯.৫ থেকে ৭০.৫ পর্যন্ত যে দূরত্ব ঠিক তার মধ্য বিন্দুকে বোঝায়। সুতরাং ৭০–৭৪ বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় ৬৯.৫ – ৭৪.৫।

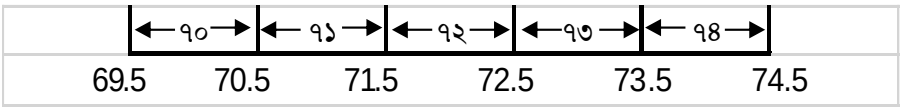

নিম্নসীমা উচ্চসীমা

শ্রেণি ব্যবধান প্রকাশের তিনটি পদ্ধতি

বহির্ভুক্ত পদ্ধতি	প্রকৃত শ্রেণিসীমা	অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি
৭০-৭৫	৬৯.৫-৭৪.৫	৭০-৭৪
৬৫-৭০	৬৪.৫-৬৯.৫	৬৫-৬৯
৬০-৬৫	৫৯.৫-৬৪.৫	৬০-৬৪
৫৫-৬০	৫৪.৫-৫৯.৫	৫৫-৫৯
৫০-৫৫	৪৯.৫-৫৪.৫	৫০-৫৪
৪৫-৫০	৪৪.৫-৪৯.৫	৪৫-৪৯
৪০-৪৫	৩৯.৫-৪৪.৫	৪০-৪৪
৩৫-৪০	৩৪.৫-৩৯.৫	৩৫-৩৯
৩০-৩৫	২৯.৫-৩৪.৫	৩০-৩৪

শ্রেণি ব্যবধান ৭০–৭৪ বা ৭০–৭৫ বলতে বোঝায় ৬৯.৫–৭৪.৫। যেভাবেই শ্রেণি ব্যবধান প্রকাশ করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে খ-পদ্ধতিতেই মান বসানো হয়। গণিতের দিক থেকে তিনটা পদ্ধতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু নির্ণয়

যখন শ্রেণি ব্যবধান তৈরি করা হয় তখন প্রতিটি শ্রেণির সকল স্কোর নিয়ে কাজ করা যায় না। প্রতিটি শ্রেণির জন্য ওই শ্রেণির স্কোরগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একটি মানের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে প্রতিনিধিত্বমূলক মানরূপে গ্রহণ করা হয়।

মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র–

একটি শ্রেণির–

$$\text{শ্রেণির মধ্যবিন্দু} = \frac{\text{নিম্নসীমা স্কোর} + \text{উচ্চসীমা স্কোর}}{২}$$

৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির নিম্নসীমা হলো ৭০ এবং উচ্চসীমা হলো ৭৪।

সুতরাং ৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দুটি হবে–

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{৭০ + ৭৪}{২}$$

$$= \frac{১৪৪}{২} = ৭২$$

সুতরাং নির্ণেয় মধ্যবিন্দু = ৭২।

বিকল্প উপায় মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ–

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{নিম্নসীমা স্কোর} + \frac{\text{উচ্চসীমা স্কোর} - \text{নিম্নসীমা স্কোর}}{২}$$

এই সূত্র প্রয়োগ করে ৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা হলো–

৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির নিম্নসীমা হলো ৭০ এবং উচ্চসীমা হলো ৭৪।

সুতরাং ৭০–৭৪ শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু হবে–

$$= ৭০ + \frac{৭৪ - ৭০}{২} = ৭০ + \frac{৪}{২}$$

$$= ৭০ + ২$$

$$= ৭২$$

সুতরাং নির্ণেয় মধ্যবিন্দু = ৭২

৭.১ : গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয়

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency)

কোনো বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় এমন একটি সংখ্যা যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারে। উপাত্ত সংগ্রহ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলো এলোমেলো থাকে। এগুলোকে বলে অবিন্যস্ত স্কোর বা অবিন্যস্ত উপাত্ত। এই অবিন্যস্ত স্কোরকে মানের ক্রমানুসারে (ঊর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রম) সাজালে কেন্দ্রের দিকে এমন একটি স্কোর পাওয়া যায়, যেটির দিকে অন্যান্য স্কোরগুলো যেতে চায় বা যাওয়ার প্রবণতা দেখায়। স্কোরগুলোর কেন্দ্রের দিকে যেতে চাওয়ার এই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) বলে। আবার তথ্যমালাকে গণসংখ্যা টেবিলে সাজালে বা সারণিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্কোর মাঝামাঝি শ্রেণিগুলোতে থাকে। যে কোনো বণ্টনের স্কোরগুলোর মাঝামাঝি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। ধরা যাক, একটি স্কুলের, নবম শ্রেণির ২১ জন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে ১৫ নম্বরের শ্রেণি পরীক্ষায় ১০, ১২, ৯, ১২, ১০, ১১, ৭, ১১, ৯, ১০, ৭, ১৩, ১১, ৯, ১২, ৮, ১০, ১৩, ১১, ১৪ এবং ১০ নম্বর পেয়েছে। প্রাপ্ত এই স্কোরগুলো এলোমেলো অবস্থায় আছে। এগুলোকে বলে অবিন্যস্ত স্কোর বা অবিন্যস্ত উপাত্ত। এগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে পাওয়া যায়–

৭, ৭, ৮, ৯, ৯, ৯, ১০, ১০, ১০, ১০, (১০,) ১১, ১১, ১১, ১১, ১২, ১২, ১২, ১৩, ১৩, ১৪

এখানে কেন্দ্রের মান ১০ (বৃত্তের মধ্যে)। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কেন্দ্রীয় মান ১০ এর দিকে এবং এর দুদিকের মানগুলো কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। এই প্রবণতাই হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতা। স্কোরগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করলে বণ্টনটি হবে নিম্নরূপ–

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা
১৪ – ১৫	১
১২ – ১৩	৫
১০ – ১১	৯ (কেন্দ্র)
৮ – ৯	৪
৬ – ৭	২
মোট	২১

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সারি ১০–১১ এর মধ্যে ৯ জন শিক্ষার্থী নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ১০–১১ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে। এর উপরের দিকে ১২–১৩ নম্বর পেয়েছে ৫ জন শিক্ষার্থী এবং ১৪–১৫ নম্বর পেয়েছে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী। আবার নিচের দিকে ৮–৯ নম্বর পেয়েছে ৪ জন শিক্ষার্থী এবং ৬–৭ নম্বর পেয়েছে মাত্র ২ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ উপরের ও নিচের শ্রেণিগুলোতে গণসংখ্যা কম। মনে হচ্ছে, সংখ্যাগুলো দুদিক থেকেই কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। কোনো বণ্টনের স্কোরগুলোর কেন্দ্র বা মাঝামাঝি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার এই প্রবণতাকেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক

প্রাপ্ত তথ্যের কেন্দ্রীয় প্রবণতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক প্রয়োজন। এটি একটি সংখ্যামাত্রা। যা সম্পূর্ণ বণ্টনটির প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা যায়, তাকে বলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাধ্যমে যে দলটির পরিমাপ করে স্কোরগুলো পাওয়া গেছে সে দলটির সমষ্টিগত সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে সাধারণত তিন ধরনের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা হয়। যথা :

১. গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) বা গড় (Mean)
২. মধ্যক (Median)
৩. প্রচুরক (Mode)

গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সাধারণত গাণিতিক গড়ই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। স্কোরগুচ্ছের স্বতন্ত্র স্কোরগুলোকে যোগ করে তাদের যোগ ফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকেই Mean বা গড় বলে।

অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় নির্ণয়

অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় নির্ণয়ে নিচের সূত্র ব্যবহার করা হয়–

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

(এখানে M= গড়, N= স্কোরগুলোর মোট সংখ্যা, X= স্কোর, ∑= যোগফল)

যেমন– সাতজন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৭০, ৬৪, ৫৩, ৭২, ৬৭, ৭২ এবং ৫৮।

এখানে, X = ৭০, ৬৪, ৫৩, ৭২, ৬৭, ৭২, ৫৮

∑X = ৭০ + ৬৪ + ৫৩ + ৭২ + ৬৭ + ৭২ + ৫৮

N = ৭

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

$$\text{প্রাপ্ত নম্বরের গড়} = \frac{\text{নম্বরগুলোর সমষ্টি}}{\text{শিক্ষার্থীর সংখ্যা}} = \frac{৭০+৬৪+৫৩+৭২+৬৭+৭২+৫৮}{৭}$$

$$= \frac{৪৫৬}{৭}$$

$$= ৬৫.১৪৩$$

বিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় নির্ণয়

বিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় নির্ণয়ের দুটি উপায়–

১. সরাসরি বা দীর্ঘ পদ্ধতি (Direct method)
২. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি (Short-cut method)

সরাসরি বা দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়

সারণিতে একটি পরীক্ষায় ২৫ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের বিন্যস্ত স্কোর দেখানো হয়েছে। সরাসরি বা দীর্ঘ পদ্ধতি ব্যবহার করে নম্বরগুলোর গড় নির্ণয় করা হলো।

শ্রেণি ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি (f)	মধ্যবিন্দু (X)	(fX)
৫০–৫৪	১	৫২	৫২
৪৫–৪৯	২	৪৭	৯৪
৪০–৪৪	২	৪২	৮৪
৩৫–৩৯	৪	৩৭	১৪৮
৩০–৩৪	৬	৩২	১৯২
২৫–২৯	৫	২৭	১৩৫
২০–২৪	৩	২২	৬৬
১৫–১৯	১	১৭	১৭
১০–১৪	১	১২	১২
	N = ২৫		∑fX = ৮০০

সরাসরি বা দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সূত্র–

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

এখানে,

M = গড়
N = স্কোরগুলোর মোট সংখ্যা
X = শ্রেণির মধ্যবিন্দু
f = ফ্রিকোয়েন্সি বা পৌনঃপুন্য
$\sum$ = যোগফল

প্রদত্ত স্কোর থেকে প্রাপ্ত,

N = ২৫
$\sum$fX= ৮০০

অতএব, গড়

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

$$= \frac{৮০০}{২৫}$$

= ৩২

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সূত্র–

$$M = AM + \frac{\sum fd}{N} \times i$$

এখানে,

M = গড়
X = স্কোর (শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু)
AM = অনুমিত গড়
N = স্কোরগুলোর মোট সংখ্যা
$d = \frac{X - AM}{i}$ (অনুমিত গড় থেকে প্রতি স্কোরের বিচ্যুতি)
i = শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য
f = ফ্রিকোয়েন্সি বা পৌনঃপুন্য
$\sum$ = যোগফল

শ্রেণি ব্যবধান	f	X	d	fd
৫০–৫৪	১	৫২	+৪	+৪
৪৫–৪৯	২	৪৭	+৩	+৬
৪০–৪৪	২	৪২	+২	+৪
৩৫–৩৯	৪	৩৭	+১	+৪
৩০–৩৪	৬	৩২	০	০
২৫–২৯	৫	২৭	–১	–৫
২০–২৪	৩	২২	–২	–৬
১৫–১৯	১	১৭	–৩	–৩
১০–১৪	১	১২	–৪	–৪
	N = ২৫			$\sum$fd = ০

এখানে,

AM = ৩২

$\sum fd$ = ০

N = ২৫

i = ৫

অতএব, গড়

$$M = AM + \frac{\sum fd}{N} \times i$$

$$M = ৩২ + \frac{0}{৫} \times ৫$$

M = ৩২ + ০

M = ৩২

সুতরাং নির্ণেয় গড় = ৩২

সাধারণত ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনের যে শ্রেণি ব্যবধানে সবচেয়ে বেশি স্কোর আছে (যে শ্রেণি ব্যবধানে ফ্রিকোয়েন্সির মান বেশি) সেই শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত গড় ধরা হয়। এখানে ৩০–৩৪ শ্রেণি ব্যবধানে ফ্রিকোয়েন্সির মান সবচেয়ে বেশি এবং শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৩২ যা এই সমস্যায় অনুমিত গড়। ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনে অন্য শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত গড় ধরে সমস্যাটির সমাধান করা যেতে পারে।

গড়ের বৈশিষ্ট্য

- কেন্দ্রীয় প্রবণতারূপে Mean বা গড় হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল। কারণ যে কোনো বণ্টনের বিভিন্ন নমুনাগুলোর মধ্যক বা প্রচুরকের তুলনায় গড়গুলোর মধ্যে বৈষম্য সবচেয়ে কম হয়ে থাকে।
- গড়কে সহজেই তার পরবর্তী পরিমাপগুলো যেমন– আদর্শ বিচ্যুতি, সহগ পরিবর্তনের মান সহজে গণনা করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় মান থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ধারণ করা পরিসংখ্যানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গণনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।
- যখন গড় থেকে বিচ্যুতি গণনা করা হয় তখনই সেই বিচ্যুতিটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে এবং সেটির বর্গ করারও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাকে। কারণ একমাত্র গড়ের ক্ষেত্রেই বণ্টনের সব কয়টি স্কোরের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তাই বণ্টনটি সুসামঞ্জস্য প্রকৃতির বলে মনে হলেও মধ্যক বা প্রচুরকের তুলনায় গড়ই নির্ভরযোগ্য।
- বণ্টনটি অসামঞ্জস্য প্রকৃতির মনে হলে গড় থেকে বণ্টন সম্পর্কে ভুল ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মধ্যক বা প্রচুরক ব্যবহার করাই উচিত।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড় থেকে বিচ্যুতির মানটি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গড়ের ব্যবহার

- যখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ জানার প্রয়োজন হয়।
- যখন বণ্টনটি প্রায় স্বাভাবিক থাকে।
- যখন অন্যান্য পরিমাপ; যেমন– আর্দশ বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি, সহসম্পর্ক ইত্যাদি নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। এ পরিমাপগুলো বের করতে হলে আগেই গড় বের করার প্রয়োজন হয়।

মধ্যক (Median)

মধ্যক এমন একটি বিন্দু যা বণ্টনকে সমান দুইভাগে ভাগ করে। এই নির্দিষ্ট বিন্দুর নিচে শতকরা ৫০ ভাগ স্কোর বা নম্বর থাকে এবং উপরে শতকরা ৫০ ভাগ স্কোর বা নম্বর থাকে। কোনো বণ্টনের মধ্যক নির্ণয়ের সময় স্কোরের আকার বিবেচ্য বিষয় নয়। স্কোরের সংখ্যা বিজোড় হলে বণ্টনের ঠিক মধ্যে অবস্থিত স্কোরটি হলো মধ্যক। স্কোরের সংখ্যা জোড় হলে বণ্টনের মধ্যবর্তী দুটো স্কোরের মধ্য বিন্দুটি মধ্যক হবে।

অবিন্যস্ত স্কোরের মধ্যক নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$$\text{মধ্যক (Mdn)} = \frac{N+১}{২} \text{তম পদ}$$

যেমন– ২, ৪, ৬, ৯, ৩, ৯, ৮, ২৪, ১৩ একটি অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ। এক্ষেত্রে স্কোরগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে সারিটি হবে ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ৯, ১৩, ২৪। এখানে স্কোরের সংখ্যা = ৯।

প্রদত্ত সূত্র অনুযায়ী এই স্কোরগুলোর মধ্যক হলো–

$$\text{মধ্যক (Mdn)} = \frac{N+১}{২}$$

$$= \frac{৯+১}{২}$$

$$= \frac{১০}{২}$$

$$= \text{৫তম পদ।}$$

সাজানো সারিতে ৫ম পদ ৮। তাই এখানে মধ্যক ৮।

জোড় সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে যেমন– ২, ১৫, ৪, ৬, ৯, ৩, ৯, ৮, ২৪, ১৩ একটি অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ। এক্ষেত্রে স্কোরগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে সারিটি হবে ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ৯, ১৩, ১৫, ২৪।

এখানে স্কোরের সংখ্যা = ১০।

সূত্র অনুযায়ী এই স্কোরগুলোর মধ্যক হলো–

$$\text{মধ্যক (Mdn)} = \frac{N+১}{২}$$

$$= \frac{১০+১}{২}$$

$$= \frac{১১}{২}$$

$$= \text{৫.৫তম পদ।}$$

∴ মধ্যক হবে ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদের মধ্যবর্তী পদ। এখানে ৫ম পদ = ৮ ও ৬ষ্ঠ পদ = ৯

$$\therefore \text{ মধ্যক (Mdn)} = \frac{৮+৯}{২}$$

$$= \frac{১৭}{২}$$

$$= \frac{৮.৫}{২}$$

$$= \text{৮.৫।}$$

অবিন্যস্ত স্কোরের মধ্যক নির্ণয়ের ধাপসমূহ–

- স্কোরগুচ্ছের স্কোরগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজানো।
- স্কোরের সংখ্যা নির্ণয় (N)।
- $\frac{N+১}{২}$ এর মান নির্ণয় করে কততম পদটি মধ্যক হবে তা নির্ণয় করা।
- যে কোনো প্রান্ত থেকে শুরু করে $\frac{N+১}{২}$ তম পদ পর্যন্ত গণনা করা।

- স্কোরের সংখ্যা বিজোড় হলে মধ্যক হিসেবে ক্রমানুসারে সাজানো স্কোরগুচ্ছের ঠিক মাঝের স্কোরটি শনাক্ত করতে হবে।
- জোড় সংখ্যা হলে ঠিক মাঝের দুটি স্কোরের গড় নির্ণয় করে $\frac{N+১}{২}$ তম পদটি নির্ণয় করা।

বিন্যস্ত স্কোরের মধ্যক নির্ণয়

বিন্যস্ত স্কোর থেকে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র এবং ধাপ অনুসরণ করতে হয়–

$$\text{মধ্যক} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{f_m}\right) \times i$$

এখানে,

L = যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক পড়ে সে শ্রেণি ব্যবধানের প্রকৃত নিম্নসীমা।

$\frac{N}{2}$ = যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক পড়ে সে শ্রেণি ব্যবধানের প্রকৃত নিম্নসীমার মোট স্কোর সংখ্যার অর্ধেক।

F = যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক পড়ে তার নিচের (ছোট) শ্রেণি ব্যবধানগুলোর ফ্রিকোয়েন্সির যোগফল।

f_m= যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক পড়ে সে শ্রেণি ব্যবধানে ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যবিন্দু।

i = শ্রেণি ব্যবধান।

উদাহরণ :

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ফ্রিকোয়েন্সি বা গণসংখ্যা (f)	যোজিত গণসংখ্যা (CF)
৮১–৯০	৩	৫০
৭১–৮০	৬	৪৭
৬১–৭০	৮	৪১
৫১–৬০	১৫ (f_m)	৩৩
৪১–৫০	১১	১৮ (F)
৩১–৪০	৫	৭
২১–৩০	২	২

N=৫০

মধ্যক বের করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

১. প্রথমে $\frac{N}{2}$ বের করতে হবে। [$\frac{N}{2}$ = ২৫]

২. এরপর বণ্টনটির নিচ থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ বড় স্কোর শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে মধ্যক যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ দেখতে হবে $\frac{N}{2}$ কোনো শ্রেণিতে পড়ে। এটি হলো মধ্যক শ্রেণি [৫১–৬০]

৩. এরপর শ্রেণির প্রকৃত নিম্নসীমা L বের করতে হবে। [L= ৫০.৫]

৪. এরপর যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক পড়ে তার নিচের শ্রেণি ব্যবধানগুলোর ফ্রিকোয়েন্সির যোগফল বের করতে হবে। [F = ১৮]

৫. এরপর যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যকটি অবস্থিত তার ফ্রিকোয়েন্সি f_m বের করতে হবে। [f_m=১৫]

৬. এরপর যে শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য i বের করতে হবে। [i =১০]

৭. এরপর সূত্র প্রয়োগ করে মধ্যক নির্ণয় করতে হবে।

$\therefore$ মধ্যক = $L + \left(\frac{\frac{N}{২}-F}{f_m}\right) \times i$

$= ৫০.৫ + \left(\frac{২৫-১৮}{১৫}\right) \times ১০$

$= ৫০.৫ + \left(\frac{৭}{১৫}\right) \times ১০$

$= ৫০.৫ + .৪৭ \times ১০$

$= ৫০.৫ + ৪.৭$

$= ৫৫.২$

বিশেষ ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়

যখন মধ্যকের অবস্থান দুই শ্রেণি ব্যবধানের মাঝখানে হয় তখন মধ্যক নির্ণয়–

উদাহরণ :

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ফ্রিকোয়েন্সি বা গণসংখ্যা (f)
৪৯–৫২	১
৪৫–৪৮	৩
৪১–৪৪	৪
৩৭–৪০	১৪
৩৩–৩৬	১৮
২৯–৩২	১৪
২৫–২৮	৮
২১–২৪	৮
১৭–২০	৫
১৩–১৬	৩
৯–১২	১
৫–৮	১
	N= ৮০

এখানে $\frac{N}{2}$ = ৪০

বণ্টনটির নিচ থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ বড় স্কোর শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ৪০ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো (২৯–৩২) এবং বণ্টনটির উপর থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ ছোট শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ৪০ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো (৩৩–৩৬)। মধ্যক দুটি শ্রেণি ব্যবধানে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নিচ থেকে যে শ্রেণি ব্যবধানে $\frac{N}{2}$ আছে তার ঊর্ধ্বসীমা [৩২.৫] অথবা উপর থেকে গুণে যে শ্রেণি ব্যবধানে $\frac{N}{2}$ আছে তার নিম্নসীমা [৩২.৫] হবে মধ্যক।

$\therefore$ মধ্যক = ৩২.৫

মধ্যকের শ্রেণি ব্যবধান ফ্রিকোয়েন্সি যখন (০) শূন্য–

উদাহরণ :

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ফ্রিকোয়েন্সি বা গণসংখ্যা (f)
৪৫–৪৯	২
৪০–৪৪	৭
৩৫–৩৯	১৩
৩০–৩৪	০
২৫–২৯	১১
২০–২৪	৯
১৫–১৯	২
	N = ৪৪

এখানে $\frac{N}{2}$ = ২২

বণ্টনটির নিচ থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ বড় স্কোর শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ২২ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো ২৫–২৯ এবং বণ্টনটির উপর থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ ছোট শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ২২ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো (৩৫–৩৯)। মধ্যক দুটি শ্রেণি ব্যবধানে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে ৩০–৩৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত গণনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৩০–৩৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু হলো ৩২। ∴ মধ্যক = ৩২।

মধ্যকটি যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তার ফ্রিকোয়েন্সি যখন শূন্য (০)–

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ফ্রিকোয়েন্সি বা গণসংখ্যা (f)
২৯–৩১	১
২৬–২৮	৩
২৩–২৫	৫
২০–২২	৬
১৭–১৯	০
১৪–১৬	০
১১–১৩	৭
৮–১০	৬
৫–৭	২
	N = ৩০

এখানে $\frac{N}{2}$ = ১৫

বণ্টনটির নিচ থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ বড় স্কোর শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ১৫ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো ১১–১৩ এবং বণ্টনটির উপর থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শ্রেণি ব্যবধান থেকে ক্রমশ ছোট শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে $\frac{N}{2}$ বা ১৫ যে শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থিত তা হলো ২০–২২। ১১–১৩ শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমা ১৩.৫ এবং ২০–২২ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নসীমা ১৯.৫। একই বণ্টনে দুটি শ্রেণি ব্যবধানে থাকতে পারে না। শ্রেণি ব্যবধান ১৭–১৯ এবং শ্রেণি ব্যবধান ১৪–১৬ এর পৌনঃপুন্য (০) শূন্য হওয়াতে দুই ধরনের মধ্যক পাওয়া যায়।

এই বৈষম্য দূর করার জন্য ১১–১৩ শ্রেণির সঙ্গে ১৪–১৬ শ্রেণি যোগ করে একটি অধিক বিস্তৃক ১১–১৬ শ্রেণি ব্যবধানে তৈরি করতে হবে। একইভাবে ২০–২২ শ্রেণির সঙ্গে ১৭–১৯ শ্রেণি যোগ করে একটি অধিক বিস্তৃক ১৭–২২ শ্রেণি ব্যবধানে তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে নিচ থেকে যে শ্রেণি ব্যবধানে $\frac{N}{2}$ আছে তার উচ্চসীমা ১৬.৫ অথবা উপর থেকে গুণে যে শ্রেণিব্যবধানে $\frac{N}{2}$ আছে তার নিম্নসীমা ১৬.৫ একই হয়।

∴ মধ্যক = ১৬.৫।

মধ্যকের বৈশিষ্ট্য

- অল্প সংখ্যক নমুনার ক্ষেত্রে যদি প্রান্তবর্তী চরম প্রকৃতির স্কোর থাকে, সেক্ষেত্রে গড়ের চেয়ে মধ্যক সঠিক পরিমাপ দেয়।
- বণ্টনের প্রান্তবর্তী স্কোরগুলো যদি অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চিত প্রকৃতির থাকে, সেক্ষেত্রে একমাত্র মধ্যকই নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ।

মধ্যকের ব্যবহার

- যখন দীর্ঘ হিসাব করার জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে না। গড়ের তুলনায় সহজ ও দ্রুত মধ্যক নির্ণয় করা যায়।
- যখন বণ্টনের মধ্যে কতকগুলো স্কোর উপরের অর্ধেকে আছে আর কতকগুলো নিচের অর্ধেকে আছে তা বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন পড়ে।
- যখন বণ্টনটির ঠিক মধ্যবিন্দু জানার প্রয়োজন পড়ে।
- যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে বা তার প্রান্তে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির স্কোর থাকে এবং গড় বের করা সম্ভব হয় না।
- যখন বণ্টনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর অধিক সংখ্যায় থাকে। বণ্টনের প্রান্তে খুব বড় বা ছোট স্কোর যদি বেশি সংখ্যায় থাকে তবে গড় তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অস্বাভাবিকভাবে খুব বড় বা ছোট হতে পারে। কিন্তু মধ্যক এ জাতীয় স্কোর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

প্রচুরক (Mode)

ইংরেজি Mode শব্দের অর্থ রীতি বা প্রথা। সমাজের অধিকাংশ লোক যা করে তাই হলো রীতি বা প্রথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কোনো স্কোরগুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবার আসে তা হলো প্রচুরক। পরিসংখ্যানের ভাষায় স্কোরগুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি সর্বাধিকবার পুনরাবৃত্তি হয় তাকে প্রচুরক (Mode) বলা হয়।

প্রচুরক দুই প্রকার। যথা :

১. স্থূল প্রচুর (Imperical Mode)
২. প্রকৃত প্রচুরক (True Mode)

১. স্থূল প্রচুরক

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য যে প্রচুরক ব্যবহার করা হয় তাকে স্থূল প্রচুরক বলে।

অবিন্যস্ত স্কোর থেকে স্থূল প্রচুরক নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের স্থূল প্রচুরক হলো সেই স্কোরটি যেটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার আসে। যেমন– ১২ জন শিক্ষার্থী যথাক্রমে ১৫, ২৫, ২৭, ১৭, ২০, ২৬, ২৪, ২৫, ২৫, ২৫, ২৬, ২৮ নম্বর পেল। স্কোরগুলোকে ক্রমানুসারে সাজালে ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ২৫, ২৫, ২৫, ২৫, ২৬, ২৬, ২৭, ২৮ পাওয়া যায়। এখানে ২৫ স্কোরটি সর্বোচ্চ ৪ বার এসেছে। সুতরাং স্থূল প্রচুরক হলো ২৫।

বিন্যস্ত স্কোর থেকে স্থূল প্রচুরক নির্ণয়

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে স্থূল প্রচুরক হলো, যে শ্রেণি ব্যবধানে ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি সে শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু। যেমন–

শ্রেণি ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
৪০–৪৪	১
৩৫–৩৯	২
৩০–৩৪	৫
২৫–২৯	১
২০–২৪	১
	N = ১০

এখানে ৩০–৩৪ শ্রেণি ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। সুতরাং ৩০–৩৪ এর মধ্যবিন্দু ৩২ হলো স্থূল প্রচুরক।

২. প্রকৃত প্রচুরক

যে প্রচুরক একেবারে সঠিক প্রচুরক নির্দেশক বিন্দুটি নির্ণয় করে তাকে প্রকৃত প্রচুরক বলে।

অবিন্যস্ত স্কোর থেকে প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয়

কোনো ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনের প্রকৃত প্রচুরক বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটি যেখানে বণ্টনের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়। সেটিকে স্কোরের কেন্দ্রিকতার শীর্ষ বলা চলে।

প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্র :

প্রচুরক = ৩ মধ্যক - ২ গড়

যদি মধ্যক ও গড় কোনোটাই জানা না থাকে তাহলে প্রকৃত প্রচুরক নিচের সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।

$$\text{প্রকৃত প্রচুরক} = L + \frac{f_0 - f_1}{2f_0 - f_1 - f_2} \times i$$

এখানে,

L = প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা

i = শ্রেণি ব্যাপ্তি

f_0 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির পূর্ববর্তী [ছোট] শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির পরবর্তী [বড়] শ্রেণির গণসংখ্যা

উদাহরণ :

ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনের প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয়–

শ্রেণি ব্যবধান	৪০–৪৪	৩৫–৩৯	৩০–৩৪	২৫–২৯	২০–২৪	১৫–১৯	১০–১৪
পৌনঃপুন্য	১	২	৩	১০	২	১	১

শ্রেণি ব্যবধান (C.I)	পৌনঃপুন্য (f)	মধ্যবিন্দু X	বিচ্যুতি d	fd	যোজিত গণসংখ্যা (CF)
৪০–৪৪	১	৪২	৩	৩	২০
৩৫–৩৯	২	৩৭	২	৪	১৯
৩০–৩৪	৩	৩২	১	৩	১৭
২৫–২৯	১০ (f_m)	২৭	০	০	১৪
২০–২৪	২	২২	–১	–২	৪ (F)
১৫–১৯	১	১৭	–২	–২	২
১০–১৪	১	১২	–৩	–৩	১
	N = ২০			$\sum fd$ = ৩	

আমরা জানি,

গড় (Mean) $= AM + \frac{\sum fd}{N} \times i$

$= ২৭ + \frac{৩}{২০} \times ৫$

$= ২৭ + \frac{৩}{৪}$

$= ২৭ + ০.৭৫$

$= ২৭.৭৫$

এখানে, $AM = ২৭$

$\sum fd = ৩$

$i = ৫$

$N = ২০$

সুতরাং নির্ণেয় গড় = ২৭.৭৫

আমরা জানি,

মধ্যক (Median) $= L + \left(\frac{\frac{N}{২} - F}{f_m}\right) \times i$

$= ২৪.৫ + \left(\frac{\frac{২০}{২} - ৪}{১০}\right) \times ৫$

$= ২৪.৫ + \left(\frac{৬}{১০}\right) \times ৫$

$= ২৪.৫ + \frac{৬}{২}$

$= ২৪.৫ + ৩$

$= ২৭.৫$

এখানে,

$f_m = ১০$

$i = ৫$

$L = ২৪.৫$

$F = ৪$

∴ প্রচুরক (Mode) = ৩ মধ্যক – ২ গড়

= (৩ × ২৭.৫) – (২ × ২৭.৭৫)

= ৮২.৫ – ৫৫.৫

= ২৭

∴ নির্ণেয় প্রচুরক = ২৭

প্রচুরকের বৈশিষ্ট্য

- প্রচুরককে রাশিমালার একটি মাত্র মানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- এর গাণিতিক কোনো মূল্য নেই। ফলে গণিতের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব নেই।
- রাশিমালায় সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায় মাত্র।
- যখন সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি দুটি শ্রেণিতে থাকে, তখন রাশিমালার দুটি প্রচুরক হতে পারে।

প্রচুরকের ব্যবহার

- রাশিমালার কেন্দ্রীয় প্রবণতা খুব দ্রুত নির্ণয় করা যায়।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি পরিমাপ যখন জানার প্রয়োজন পড়ে।
- রাশিমালার কোন স্কোরটি বেশি আছে তা জানার জন্য।
- গুণগত ও সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে প্রবণতাকে প্রকাশ করার জন্য।

৭.২ : আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation)

আদর্শ বিচ্যুতি হলো বিষমতার নিখুঁত ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (d) বের করতে হয়। গাণিতিক চিহ্নের অসুবিধা দূর করার জন্য বিচ্যুতিকে (d) বর্গ করে নিতে হয়। এর ফলে ঋণাত্মক বিচ্যুতিগুলো (d) বর্গসংখ্যা হয়ে গিয়ে সবগুলো বিচ্যুতি d^2 ধনাত্মক হয়ে যায়। পরে d^2 এর সমষ্টি বের করে মোট স্কোর সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করে সে ভাগফলের বর্গমূল (Square Root) বের করতে হয়। এ বর্গমূল সংখ্যাটিকে আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) বলে। আদর্শ বিচ্যুতি সাধারণত গ্রিক চিহ্ন সিগমা (σ) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর সাহায্যে গড় থেকে স্কোরসমূহের বিচ্যুতি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়।

তাহলে আদর্শ বিচ্যুতি হলো কোনো স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে নেওয়া প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতিগুলোর বর্গকৃত (Squared) রূপের গড়ের বর্গমূল।

অবিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

সূত্র : আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) $= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

বা $\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

এখানে,

d = স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে প্রতি স্কোরের দূরত্ব বা বিচ্যুতি

d^2 = প্রতিটি বিচ্যুতির বর্গ

$\sum$ = **যোগফল**

N = মোট স্কোর সংখ্যা

√ = বর্গমূল চিহ্ন (Square sign)

আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের ধাপ (অবিন্যস্ত স্কোরের জন্য)

১. প্রথমে স্কোরগুচ্ছের গড় বের করতে হবে।

২. প্রতিটি স্কোর থেকে গড়ের দূরত্ব (বিচ্যুতি) বের করে একে d দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

৩. প্রতিটি বিচ্যুতি বর্গ (d^2) বের করতে হবে।

৪. এ বর্গগুলোর যোগফল ($\sum d^2$) বের করতে হবে।

৫. এ যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করতে হবে ($\frac{\sum d^2}{N}$)

৬. এ ভাগফলের বর্গমূল বের করে আদর্শ বিচ্যুতি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : নিচের স্কোরগুলোর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

১০, ৮, ৪, ৬, ১২, ১৬, ১৪

সমাধান :

প্রদত্ত উপাত্তগুলোর গড়,

$$M = \frac{\sum x}{N}$$

$$= \frac{১০+৮+৪+৬+১২+১৬+১৪}{৭}$$

$$= \frac{৭০}{৭}$$

$$= ১০$$

উপাত্তগুলোকে নিম্নবর্ণিতভাবে সাজানো হলো–

স্কোর বা উপাত্ত (X)	বিচ্যুতি (d= X- M)	d^2
১৬	১৬ –১০ = +৬	৩৬
১৪	১৪ –১০ = +৪	১৬
১২	১২ –১০ = +২	৪
১০	১০ –১০ = ০	০
৮	৮ –১০ = –২	৪
৬	৬ –১০ = –৪	১৬
৪	৪ –১০ = –৬	৩৬
		$\sum d^2$ = ১১২

এখানে, N= ৭

আদর্শ বিচ্যুতি, $\sigma = \pm\sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

$= \pm\sqrt{\frac{১১২}{৭}}$

$= \pm\sqrt{১৬}$

$= \pm ৪$

মূল স্কোর থেকে সরাসরি আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

সূত্র :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N} - M^2}$$

এখানে, X= স্কোর

M = গড়

N = মোট স্কোর

σ = আদর্শ বিচ্যুতি বা সিগমা

উদাহরণ :

নিচের স্কোরসমূহের সরাসরি আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়।

৮, ৬, ৪, ১০, ১২, ১৪, ১৬

সমাধান :

স্কোরগুলোকে নিম্নবর্ণিতভাবে সাজানো যায়।

স্কোর (X)	স্কোরের বর্গ (X^2)
১৬	২৫৬
১৪	১৯৬
১২	১৪৪
১০	১০০
৮	৬৪
৬	৩৬
৪	১৬
$\sum X$ = ৭০	$\sum X^2$ = ৮১২

$$M = \frac{\sum x}{N}$$

$$= \frac{৭০}{৭}$$

$$= ১০$$

তাহলে, $M^2 = ১০^২$

$$= ১০০$$

আবার, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N} - M^2}$

$$= \sqrt{\frac{৭০}{৭} - ১০০}$$

$$= \sqrt{১১৬ - ১০০}$$

$$= \sqrt{১৬}$$

$$= ৪$$

বিন্যস্ত স্কোরের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে দুভাবে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায়। যথা :

(ক) সরাসরি বা দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় (Standard Deviation by Direct method)

(খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় (Standard Deviation by Short-cut method)

(ক) দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

আদর্শ বিচ্যুতি $\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$

এখানে, f = পৌনঃপুন্য
d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি
N = মোট পৌনঃপুন্য

দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের পদ্ধতি

১. প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হয়।
২. গড় (Mean) নির্ণয় করতে হয়। এটা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ যে কোনো পদ্ধতিতেই নির্ণয় করতে হবে।
৩. প্রতিটি শ্রেণির মধ্যমান (X) নির্ণয় করতে হবে।
৪. গড় M থেকে প্রতিটি শ্রেণির মধ্যমানের বিচ্যুতি (X – M = d) নির্ণয় করতে হয়।
৫. প্রতিটি dকে সেই শ্রেণির f দিয়ে গুণ করে fd বের করতে হবে।
৬. প্রতিটি শ্রেণির fdকে সেই শ্রেণির d দিয়ে গুণ করে fd^2 নির্ণয় করতে হবে।
৭. এরপর fd^2 এর সমষ্টি ($\sum fd^2$) নির্ণয় করতে হবে।
৮. সব শেষে সূত্রানুযায়ী আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) = $\frac{\sum fd^2}{N}$ নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ :

নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টন থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়।

শ্রেণি ব্যবধান (C.I)	পৌনঃপুন্য (f)
৯০–৯৯	২
৮০–৮৯	৪
৭০–৭৯	৫
৬০–৬৯	৯
৫০–৫৯	১৪
৪০–৪৯	১২
৩০–৩৯	৯
২০–২৯	৩
১০–১৯	২
	N = ৬০

সমাধান :

শ্রেণি ব্যবধান (C.I)	মধ্যবিন্দু (x)	পৌনঃপুন্য (f)	বিচ্যুতি (d^1)	fd^1	d = X-M	fd	fd^2
৯০–৯৯	৯৪.৫	২	+৪	৮	৪১.৩৩	৮২.৬৬	৩৪১৬.৩৪
৮০–৮৯	৮৪.৫	৪	+৩	১২	৩১.৩৩	১২৫.৩২	৩৯২৬.২৮
৭০–৭৯	৭৪.৫	৫	+২	১০	২১.৩৩	১০৬.৬৫	২২৭৪.৮৪
৬০–৬৯	৬৪.৫	৯	+১	৯	১১.৩৩	১০১.৯৭	১১৫০.৩২
৫০–৫৯	৫৪.৫	১৪	০	০	১.৩৩	১৮.৬২	২৪.৭৬
৪০–৪৯	৪৪.৫	১২	–১	–১২	–৮.৬৭	–১০৪.০৪	৯০২.০৩
৩০–৩৯	৩৪.৫	৯	–২	–১৮	–১৮.৬৭	–১৬৮.০৩	৩১৩৭.১২
২০–২৯	২৪.৫	৩	–৩	–৯	–২৮.৬৭	–৮৬.০১	২৪৬৫.৯১
১০–১৯	১৪.৫	২	–৪	–৮	–৩৮.৬৭	–৭৭.৩৪	২৯৯০.৭৬
		N = ৬০		$\sum fd^1 = -৮$			$\sum fd^2 =$ ২০২৯৩.৩৪

আমরা জানি,

$$\text{গড় (Mean)} = AM + \frac{\sum fd^1}{N} \times i$$

$$= ৫৪.৫ + \frac{-৮}{৬০} \times ১০$$

$$= ৫৪.৫ - \frac{৪}{৩} = ৫৪.৫ - ১.৩৩$$

$$= ৫৩.১৭$$

এখানে, AM = অনুমিত গড় = ৫৪.৫

$\sum fd =$ পৌনঃপুন্য ও বিচ্যুতির গুণফলের সমষ্টি = – ৮

N= মোট পৌনঃপুন্য = ৬০

i = Class Interval (শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য) = ১০

আমরা জানি,

আদর্শ বিচ্যুতি (σ) বা সিগমা = $\frac{\sum fd^2}{N}$

এখানে, $\sum fd^2$ = ২০২৯৩.৩৪

N = ৬০

সুতরাং, $\sigma = \sqrt{\frac{২০২৯৩.৩৪}{৬০}}$

$= \sqrt{২০২৯৩.৩৪}$

= ১৮.৩৯

সুতরাং, নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি ১৮.৩৯

(খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

সূত্র : আদর্শ বিচ্যুতি $\sigma = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

এখানে,

i = শ্রেণির ব্যবধানের দৈর্ঘ্য (Class Interval)

f = পৌনঃপুন্য

d = কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি

N= মোট পৌনঃপুন্য

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বা কল্পিত গড় পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) নির্ণয়ের পদ্ধতি

১. বণ্টনের মাঝামাঝিতে অবস্থিত যে কোনো একটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত গড় ধরে প্রত্যেক শ্রেণির বিচ্যুতি (d) নির্ণয় করতে হবে।

২. প্রত্যেক শ্রেণির পৌনঃপুন্য (f) দ্বারা সেই শ্রেণির বিচ্যুতি (d)-কে গুণ করে fd বের করতে হয়।

৩. সব শ্রেণির fdগুলোর সমষ্টি $\sum fd$ বের করতে হয়।

৪. প্রত্যেক শ্রেণি ব্যবধানের d এবং fd কে গুন করে প্রাপ্ত মানকে fd^2 সারিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫. fd^2 সব এ সমষ্টি $\sum fd^2$ নির্ণয় করতে হবে।

৬. সব শেষে $\sigma = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$ সূত্রের মাধ্যমে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হয়।

উদাহরণ :

নিচের বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) নির্ণয় করতে হবে।

শ্রেণি ব্যবধান (C.I)	পৌনঃপুন্য (f)
৮৬–৯৫	২
৭৬–৮৫	৫
৬৬–৭৫	৭
৫৬–৬৫	৯
৪৬–৫৫	১৫
৩৬–৪৫	১০
২৬–৩৫	৭
১৬–২৫	৩
৬–১৫	২
	N = ৬০

সমাধান :

শ্রেণি ব্যবধান (C.I)	পৌনঃপুন্য (f)	শ্রেণির মধ্যবিন্দু (X)	বিচ্যুতি d	fd	fd^2
৮৬–৯৫	২	৯০.৫	+৪	+৮	৩২
৭৬–৮৫	৫	৮০.৫	+৩	+১৫	৪৫
৬৬–৭৫	৭	৭০.৫	+২	+১৪	২৮
৫৬–৬৫	৯	৬০.৫	+১	+৯	৯
৪৬–৫৫ (অনুমিত গড়ের শ্রেণি)	১৫	৫০.৫	০	০	০
৩৬–৪৫	১০	৪০.৫	–১	–১০	১০
২৬–৩৫	৭	৩০.৫	–২	–১৪	২৮
১৬–২৫	৩	২০.৫	–৩	–৯	২৭
৬–১৫	২	১০.৫	–৪	–৮	৩২
	N = ৬০			$\sum fd$ = ৫	$\sum fd^2$ = ২২১

$\therefore$ আদর্শ বিচ্যুত $\sigma = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

$= ১০ \times \sqrt{\frac{২২১}{৬০} - \left(\frac{৫}{৬০}\right)^2}$

$= ১০ \times \sqrt{\frac{২১৪}{৬০} - \frac{২৫}{৩৬০০}}$

$= ১০ \times \sqrt{\frac{১২৮৪০ - ২৫}{৩৬০০}}$

$= ১০ \times \sqrt{\frac{১২৮১৫}{৩৬০০}}$

$= ১০ \times \sqrt{৩.৫৫৯}$

$= ১০ \times ১.৮৭৩৪$

$= ১৮.৭৩$

$\therefore$ নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি = ১৮.৭৩

আদর্শ বিচ্যুতির ফলাফলের ব্যাখ্যা

আদর্শ বিচ্যুতির ফলাফলের ব্যাখ্যা করার জন্য স্বাভাবিক বণ্টনের কথা বিবেচনায় আনতে হবে। স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রসহ বিশদ বর্ণনা ৭.৩ পাঠে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মানগুলো উল্লেখ করা হলো।

গড় $\pm$ ১σ (M $\pm$ 1σ) অর্থাৎ (গড় - ১σ) থেকে (গড় + ১σ) এর মধ্যে শতকরা ৬৮.২৬ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় $\pm$ ২σ (M $\pm$ 2σ) অর্থাৎ (গড় - ২σ) থেকে (গড় + ২σ) এর মধ্যে শতকরা ৯৫.৪৪ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় $\pm$ ৩σ (M $\pm$ 3σ) অর্থাৎ (গড় - ৩σ) থেকে (গড় + ৩σ) এর মধ্যে শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ স্কোর থাকে;

গড় ± ১σ কে স্বাভাবিক পারদর্শিতার স্তর হিসেবে ধরা হয়।

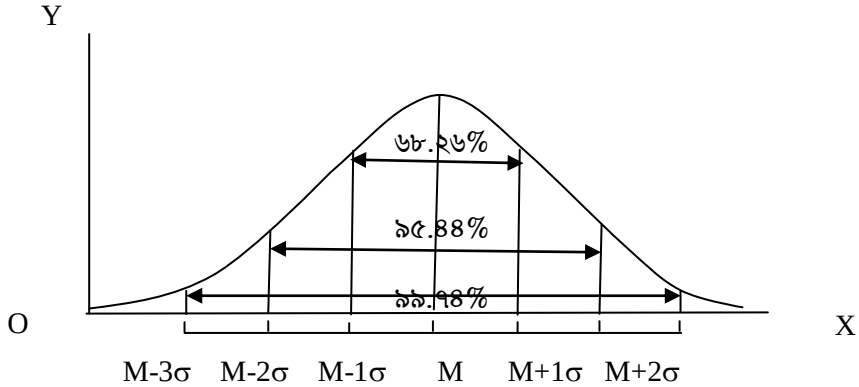

চিত্র : স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

উদাহরণ :

কোনো পরীক্ষায় নবম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের বণ্টন দেওয়া হলো। বণ্টনটি থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

সমাধান :

শ্রেণি	শ্রেণির মধ্যবিন্দু (X)	বণ্টন সংখ্যা (f)	বিচ্যুতি (d)	fd	fd^2
৭০–৭৪	৭২	২	+৪	+৮	+৩২
৬৫–৬৯	৬৭	৩	+৩	+৯	+২৭
৬০–৬৪	৬২	৮	+২	+১৬	+৩২
৫৫–৫৯	৫৭	১১	+১	+১১	+১১
				(=+৪৪)	
৫০–৫৪	৫২	১৫	০	০	০
৪৫–৪৯	৪৭	৭	–১	–৭	+৭
৪০–৪৪	৪২	৭	–২	–১৪	+২৮
৩৫–৩৯	৩৭	৫	৩	–১৫	+৪৫
৩০–৩৪	৩২	২	–৪	–৮	+৩২
				(=–৪৪)	
		N = ৬০		$\sum fd = 0$	$\sum fd^2 = ২১৪$

∴ আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) $\sigma = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$

$= ৫ \times \sqrt{\frac{২১৪}{৬০} - \left(\frac{০}{৬০}\right)^2}$

$= ৫ \times \sqrt{\frac{১০৭}{৩০}}$

$= ৫ \times \sqrt{৩.৫৬৬৬}$

$= ৫ \times ১.৮৮৮$

$= ৯.৪৪২৮$

∴ নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুত σ = ৯.৪৪

আবার, আমরা জানি, গড় (M) = AM + $\left(\frac{\sum fd}{N}\right) \times i$

এখানে, AM = ৫২

$\sum fd$ = ০

N = ৬০

i = ৫

$\therefore$ M = ৫২ + $\frac{০}{৬০}$ × ৫

= ৫২ + ০

= ৫২

$\therefore$ গড় = ৫২

M±1σ এর মধ্যে মোট ৬৮% স্কোর থাকে। ৬০ এর ৬৮.২৬ %= ৪০.৯৬

$\therefore$ M+1σ = ৫২ + ১×৯.৪৪ (৪০.৯৬কে পূর্ণ সংখ্যা ৪১ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে)

= ৫২ + ৯.৪৪

= ৬১.৪৪

$\therefore$ M-1σ = ৫২–১ × ৯.৪৪

= ৫২–৯.৪৪

= ৪২.৫৬

$\therefore$ ৪২.৫৬ থেকে ৬১.৪৪ এর মধ্যে ৬৮.২৬% অর্থাৎ ৪০.৯৬ জনের স্কোর রয়েছে।

M±2σ এর মধ্যে মোট ৯৫% স্কোর থাকে। ৬০ এর ৯৫.৪৪%= ৫৭.২৬

$\therefore$ M+2σ = ৫২ + ২ × ৯.৪৪ (৫৭.২৬কে পূর্ণ সংখ্যা ৫৭ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে)

= ৫২ + ১৮.৮৮

= ৭০.৮৮

$\therefore$ M-2σ = ৫২–২ × ৯.৪৪

= ৫২–১৮.৮৮

= ৩৩.১২

$\therefore$ ৩৩.১২ থেকে ৭০.৮৮ এর মধ্যে ৯৫.২৬% অর্থাৎ ৫৭.২৬ জনের স্কোর রয়েছে।

M±3σ এর মধ্যে মোট ৯৯% স্কোর থাকে। ৬০ এর ৯৯.৭৪%= ৫৯.৮৪

$\therefore$ M+3σ = ৫২ + ৩×৯.৪৪ (৫৯.৮৪কে পূর্ণ সংখ্যা ৬০ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে)

= ৫২ + ২৮.৩২

= ৮০.৩২

$\therefore$ M-3σ = ৫২ – ৩ × ৯.৪৪

= ৫২ – ৮০.৩২

= ২৩.৬৮

$\therefore$ ২৩.৬৮ থেকে ৮০.৩২ এর মধ্যে ৯৯% অর্থাৎ ৫৯.৮৪ জনের স্কোর রয়েছে।

গড় ±1σ অর্থাৎ (গড় ±৯.৪৪)-কে স্বাভাবিক পারদর্শিতার স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়।

আদর্শ বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য

- নিবেশনের প্রত্যেকটি স্কোরের উপর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিবেশনের কোনো একটি মান পরিবর্তন করলে আদর্শ বিচ্যুতির মানও পরিবর্তিত হবে।
- কোনো নিবেশনে চরম প্রকৃতির স্কোর থাকলে আদর্শ বিচ্যুতি বেড়ে যাবে।
- নিবেশনে খুব বড় অথবা খুব ছোট কোনো স্কোর থাকলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।
- আদর্শ বিচ্যুতি গড় ব্যবধানের চেয়ে বড় হয়।
- দুটি সংখ্যার আদর্শ বিচ্যুতি সর্বদা গড় ও পরিসরের চেয়ে ছোট হয়।
- আদর্শ বিচ্যুতি নমুনার তারতম্য দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার

- আঞ্চলিক পর্যালোচনায় দুই বা ততোধিক বিষয়ের পার্থক্যের মান ও মাত্রা জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- শিল্প ও কলকারখানায় তথ্য বিশ্লেষণে এবং উৎকর্ষতা যাচাইয়ে আদর্শ বিচ্যুতির প্রয়োজন রয়েছে।
- প্রতিযোগিতামূলক দলগত খেলায় ভালোমন্দ বিশ্লেষণে, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা এবং ফলাফলের পূর্বাভাসের জন্য আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার রয়েছে।
- বিষমতার নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপের জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- নমুনা বিচার বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও সম্ভাবনার স্বাভাবিক লেখচিত্র বিশ্লেষণে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।
- কৃষিক্ষেত্রে জমির পরিমাণের সাথে উৎপাদন, বৃষ্টিপাতের সাথে উৎপাদন, সার প্রয়োগ, কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার, ফসল আবর্তন, ভূমি আবর্তন ইত্যাদির সাথে উৎপাদনের পার্থক্য জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।
- স্থানিক বিশ্লেষণে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।
- বণ্টনের স্কোরগুচ্ছের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি জানার জন্য আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার রয়েছে।

আদর্শ বিচ্যুতির সুবিধা

- ইচ্ছাকৃতভাবে গড় ব্যবধান নির্ণয়ের সময় চিহ্ন অগ্রাহ্য করায় যে অসুবিধা হয় তা আদর্শ বিচ্যুতির দ্বারা দূরীভূত হয়।
- এটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বণ্টনের সকল রাশির উপর নির্ভর করা হয়।
- দ্রুত ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।
- নমুনার তারতম্য কম প্রভাবিত হয়।

আদর্শ বিচ্যুতির অসুবিধা

- এর মান অস্বাভাবিক বেড়ে যায় যখন বণ্টনে চরম প্রকৃতির স্কোর থাকে।
- এর জন্য যথেষ্ট সময় ও গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।
- অস্বাভাবিক স্কোর বণ্টনের ক্ষেত্রে বিষমতার পরিমাপ হিসেবে এটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

৭.৩ : স্বাভাবিক বণ্টন

স্বাভাবিক বণ্টন (Normal Distribution)-এর বোধগম্যতা

একটি ঘটনা ঘটার প্রত্যাশাকে বলে ঘটনাটির সম্ভাবনা (Probability)। প্রতিটি ঘটনাই একটি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে। তাই এ সম্ভাবনাকে স্বাভাবিক সম্ভাবনা বলা হয়ে থাকে। তবে ব্যতিক্রমী ঘটনা অপ্রত্যাশিত বলে তা ধর্তব্য নয়।

একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি বড় দলের উপর কোনো অভীক্ষা প্রয়োগ করলে তাদের প্রাপ্ত স্কোর থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাঝামাঝি গড়ের কাছাকাছি স্কোর পায়। উচ্চ ও নিম্ন স্কোর পায় খুব কম শিক্ষার্থী। একই ধরনের বয়সের শিক্ষার্থীর উচ্চতা মাপলে বা একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স মাপলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের স্কোর বা বয়স বা উচ্চতার এ রকম বণ্টনকে বলে স্বাভাবিক বণ্টন (Normal Distribution)। এই বণ্টন দ্বারা অঙ্কিত লেখচিত্রকে বলা হয় স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র।

স্বাভাবিক বণ্টনের সঙ্গে সম্ভাবনা (Laws of chance) এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্বন্ধকে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। কোনো একটা ঘটনার সম্ভাবনা বলতে বোঝা যাবে, একই ধরনের ঘটনার মধ্যে বিশেষ একটি ঘটনা যতবার ঘটার আশা বা প্রত্যাশা থাকে।

একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করার পর প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছকে বণ্টনে সাজিয়ে যদি তার একটি বহুভুজ অংকন করা হয়, তবে সে চিত্রটি অনেকটা ঘণ্টার আকৃতির মতো এক ধরনের চিত্রে পরিণত হয়। এ চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাঝের অংশ স্ফীত ও উঁচু আর শীর্ষবিন্দুর দুই পাশ থেকে রেখাটি দুই দিকে ধীরে ধীরে নেমে আসার ফলে চিত্রটি দুপাশে সরু হয়ে যায়। কিন্তু অক্ষরেখাকে স্পর্শ করে না। চিত্রটি থেকে বোঝা যায়, বামদিকের প্রান্তে থাকে নিচু স্কোরগুলো এবং তাদের সংখ্যা স্বল্পতম। ক্রমশ যতই মাঝের দিকে এগোনো যায় স্কোরগুলো আয়তনে তত বাড়তে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বেশি হতে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানে ও তার আশপাশে থাকে মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলো এবং তাদের সংখ্যা বণ্টনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হওয়ায় চিত্রটি মাঝখানটা স্ফীত ও উঁচু থাকে। ডানদিকের শেষপ্রান্তে সর্বোচ্চ স্কোরগুলো থাকে এবং সেগুলো বাম দিকের সর্বনিম্ন স্কোরগুলোর মতোই সংখ্যাতে বেশ কম। এ ধরনের সুষম রেখাকে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র বা গসিয়ান (Gaussian) বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কার্ল ফ্রেড্রিক গস (Carl Friedrich Gauss) এ ধরনের চিত্র পরিমাপের ত্রুটি নির্ণয়ে প্রয়োগ করেন। তাঁর নামানুসারে একে গসিয়ান চিত্র বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

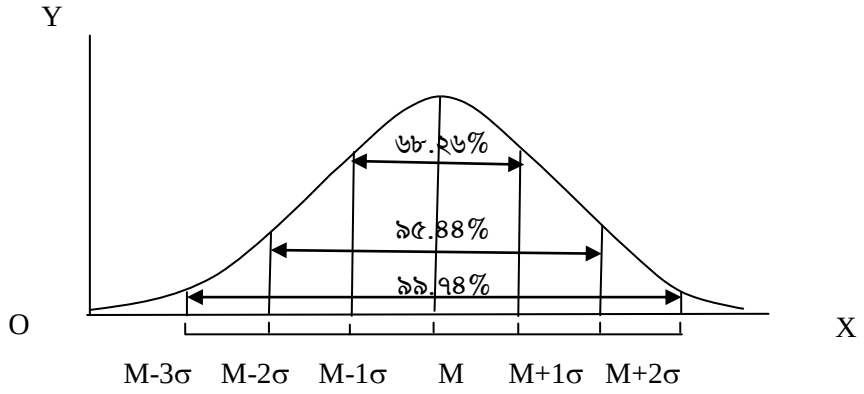

চিত্র : স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য

- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের দুই প্রান্ত X অক্ষের কাছাকাছি অবস্থানে আসলেও কখনো X অক্ষের সাথে একেবারে মিলে যায় না।
- সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, লেখচিত্রটি একটি প্রতিসম আকৃতির (Symmetric)।
- X এর মান ০ (শূন্য) হলে Y এর মান সর্বোচ্চ হয় এবং গড় বা মানের উপর Y এর বৃহত্তম মান পাওয়া যায়।
- X এর মান অনেক বড় হলে Y এর মান সর্বনিম্ন হয়, সেটি বাস্তবে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ X এর মান অসীম হলে Y এর মান ০ হয়।

- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রে গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের মান সমান হয়, তবে বাস্তবে এ ধরনের চিত্র খুব কম পাওয়া যায়।
- লেখচিত্রটি গড় বরাবর Convex এবং দুই প্রান্ত বরাবর Concave হয়ে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
- গড় হতে বাম দিকে লেখচিত্রটি যে বিন্দুতে Convex হতে Convave রূপ ধারণ করেছে সে বিন্দুটিকে পথচ্যুতি বিন্দু বা Point of inflection বলে। ওই বিন্দু হতে x অক্ষে লম্ব টানলে যে বিন্দুতে লম্বের পাদবিন্দু অবস্থিত হয় সে বিন্দুতে গড় হতে -১σ দূরত্বে অবস্থিত হবে। অনুরূপভাবে ডানদিকের পথচ্যুতি বিন্দু হতে x অক্ষে লম্ব টানলে লম্বটির পাদবিন্দু গড় হতে +১σ দূরত্বে অবস্থিত হবে।
- গড় হতে $\pm$১σ দূরত্বের মধ্যে বণ্টনটির ৬৮.২৬% গড় $\pm$২σ দূরত্বের মধ্যে ৯৫.৪৪% এর গড় হতে $\pm$৩σ দূরত্বের মধ্যে ৯৯.৭৪% স্কোর অবস্থান করে।
- লেখচিত্রটির একাধিক সর্বোচ্চ বিন্দু থাকে না।
- লেখচিত্রটির সর্বোচ্চ বিন্দু হতে x অক্ষে লম্ব টানলে তা চিত্রটিকে দুটি সমানভাবে ভাগ করে এবং লম্বের পাদবিন্দুটি গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্দেশ করে।
- লেখচিত্রটির বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক সব সময় বজায় থাকে।
- লেখচিত্রটি উপুড় করা ঘণ্টার মতো দেখায়।
- স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র একটি আদর্শ লেখচিত্র। বাস্তব লেখচিত্রগুলো এর কাছাকাছি মানের হয়।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের ব্যবহার

- এর লেখচিত্র কোনো তথ্য বিশ্বের (Population) সঠিক নমুনা হিসেবে কাজ করে।
- অভীক্ষার কাঠিন্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে সাজাতে, অভীক্ষা পদ নির্বাচন এবং অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করতে এটি ব্যবহার করা হয়।
- স্কোরকে গ্রেডে রূপান্তর করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- পরিমাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম কোনো্টি তা নির্ধারণে এটি ব্যবহার করা হয়।
- বণ্টনের দুই সীমার মধ্যে শতকরা কতভাগ স্কোর আছে তা নির্ধারণে Normal curve ব্যবহার করা হয়।
- বিভিন্ন বণ্টনের তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।
- একাধিক বণ্টন Overlap করলে Normal curve এর সাহায্যে তাদের তুলনা করা হয়।

৭.৪ : নম্বর বণ্টনের ব্যাখ্যাকরণ বা বিশ্লেষণ

নম্বর বণ্টনের ব্যাখ্যাকরণ বা বিশ্লেষণ

একই মেধা, বয়স, শিক্ষা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা একদল শিক্ষার্থী বা একদল লোকের উপর কোনো অভীক্ষা প্রয়োগ করে প্রাপ্ত স্কোরগুলো দিয়ে একটি বহুভুজ অংকন করা হলে তা হবে একটি উপুড় করা ঘণ্টার মতো। মাঝখানে উঁচু দুপাশে ক্রমশ নিচু হয়ে অক্ষরেখার নিকটবর্তী হবে কিন্তু কোনো স্কোর অক্ষরেখা স্পর্শ করবে না। চিত্রটির ঠিক মাঝখানে ও তার আশপাশে থাকে মধ্যম মানের স্কোরগুলো এবং তাদের সংখ্যা বেশি বলেই লেখচিত্রের মাঝখানটা উঁচু ও স্ফীত হয়। এ ধরনের সুষম বণ্টনের লেখচিত্রকে স্বাভাবিক সম্ভবনার লেখচিত্র বলে। এই চিত্রের সাহায্যে আদর্শ বিচ্যুতির সংব্যাখ্যান দেওয়া সহজ হয়। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রটির শীর্ষবিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু বণ্টনের গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের মান নির্দেশ করবে। কাজেই একটি সুষম বণ্টনের গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের মান সমান হবে।

গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি যে কোনো মানের জন্য সকল স্বাভাবিক বণ্টনের গড়ের ডান পাশে +1σ দূরত্বে শতকরা ৩৪.১৩; গড়ের বাম পাশে পারদর্শিতার শতকরা ৩৪.১৩ স্কোর থাকবে। অর্থাৎ গড় ±1σ (M ±1σ) এর মধ্যে মোট স্কোরের ৬৮% স্কোর থাকে, একে স্বাভাবিক পারদর্শিতার স্তর বলা হয়। গড় ±2σ (M ±2σ) এর মধ্যে মোট স্কোরের ৯৫% স্কোর থাকে। গড় ±3σ (M ±3σ) এর মধ্যে মোট স্কোরের ৯৯% স্কোর থাকে (এখানে 'σ' সিগমা চিহ্ন দিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি বোঝানো হয়েছে)।

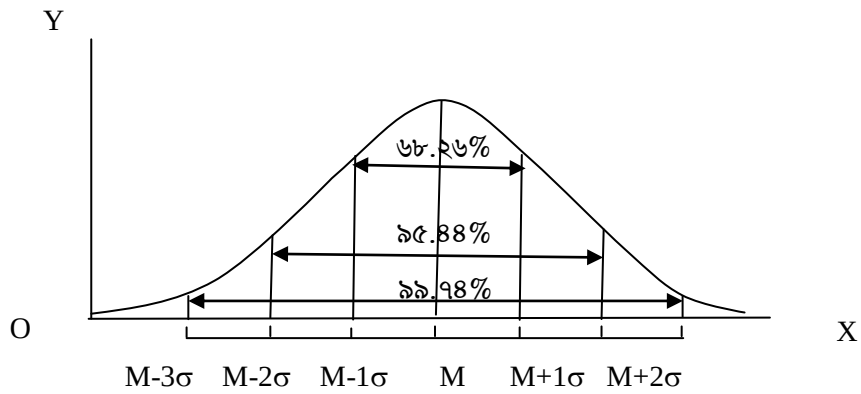

চিত্র : স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

কিন্তু স্কোরের সংখ্যা সব জায়গায় ভিন্ন। বণ্টনের ক্ষেত্রফলও সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও এক নয়। নিচে লেখচিত্রের অন্তর্গত ক্ষেত্র ও শতকরা স্কোর বণ্টনের তালিকা দেওয়া হলো।

M +১σ এর মধ্যে M - ১σ এর মধ্যে M ±১σ এর মধ্যে	৩৪.১৩% স্কোর ৩৪.১৩% স্কোর ৬৮.২৬% স্কোর
M +২σ এর মধ্যে M - ২σ এর মধ্যে M ±২σ এর মধ্যে	৪৭.৭২% স্কোর ৪৭.৭২% স্কোর ৯৫.৪৪% স্কোর
M +৩σ এর মধ্যে M - ৩σ এর মধ্যে M ±৩σ এর মধ্যে	৪৯.৮৭% স্কোর ৪৯.৮৭% স্কোর ৯৯.৭৪% স্কোর

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের অন্তর্গত সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের সীমার (-3σ থেকে +3σ) মধ্যে প্রায় সমস্ত স্কোর (৯৯.৭৪%) থাকে। এর বাইরে মাত্র ০.২৬% স্কোর। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, M ±১σ এর মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ৬৮.২৬% স্কোর থাকে। অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক বণ্টনের M যদি ১০০ হয় এবং σ যদি ২০ হয়, তাহলে ওই বণ্টনের শতকরা ৬৮.২৬% ভাগ স্কোর ৮০–১২০ মানের মধ্যে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী? উদাহরণ দিন।
(খ) কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপকগুলো লিখুন।

২. (ক) গড় কী?
(খ) নিম্নলিখিত স্কোরগুলোকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজিয়ে গড় নির্ণয় করুন।
৫৭, ৫৪, ৬৩, ৫৮, ৭৮, ৩৩, ৭৩, ৫০, ৬২, ৫৭, ৯৮, ৩৯, ৭৩, ৫৫, ২৭, ৪২, ৪০, ৬৮, ৫২, ২৩, ৫১, ১৮, ৪৮, ২২, ৯০, ৭২, ৭০, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৩৮, ৭৮, ৫৮, ৯১, ৬৮, ৮৫, ৫৩, ১১, ৩৩, ৩৮।

৩. (ক) মধ্যক বলতে কী বোঝায়? মধ্যক কেন ব্যবহার করা হয়?
(খ) গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রগুলো লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) আদর্শ বিচ্যুতি বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
(খ) নিম্নলিখিত বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ফ্রিকোয়েন্সি বা গণসংখ্যা (f)
৯০–৯৯	১
৮০–৮৯	১০
৭০–৭৯	১২
৬০–৬৯	১৬
৫০–৫৯	১১
৪০–৪৯	৬
৩০–৩৯	৩
২০–২৯	১
	N= ৬০

২. (ক) স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
(খ) একটি স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র অঙ্কন করে বিশ্লেষণ করুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০০০), মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ১ এবং ৩), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ৪ এবং ৫), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০০৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঢালী, স্বপন কুমার, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০১৩), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

হাবীব, মোঃ আহসান এবং আন্যান্য, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৩), মিতা ট্রেডার্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ), সেসিপ, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৪।

হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ।

ইউনিট ৮ : ধারাবাহিক শিখনযাচাই

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৮.১: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৮.২: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ

৮.৩: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব

৮.৪: ধারাবাহিক শিখনযাচাই লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ।

ইউনিট ৮ : ধারাবাহিক শিখনযাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি, পরিমাপ ও মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার্থীরা কী শিখল তা যাচাই করা। এক কথায় কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা নিরূপণ করাই হলো শিখনযাচাই। সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর শিখনযাচাই হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত পূর্বনির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করাই হলো শিক্ষার্থীর শিখনযাচাই। এমনকি কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পারল না এবং কেন শিখতে পারল না সেটাও জানা যায় শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম বা পাঠদান প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা জানতে হলেও শিক্ষার্থীদের শিখনের মাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি বা উপায় রয়েছে। এসব পদ্ধতি বা উপায় ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করে থাকেন। ধারাবাহিক শিখনযাচাই এ রকম একটি উপায় যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত পরীক্ষার বিকল্প হিসেবেও এটি বিবেচিত হতে পারে।

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি জানার জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ। এ ছাড়া দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যক্রমে পরিচালিত শ্রেণির কাজ, কোর্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট পরিচালনা এবং ব্যবহারিক কাজও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে পরীক্ষা বা অন্য যে ধরনের কার্যক্রমই পরিচালনা করা হোক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পারল এবং এই শিখনের পর তাদের আচরণের কী পরিবর্তন ঘটল সে সম্পর্কে জানা। সুতরাং বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক অর্জনের মাত্রা জানা যায় সেটাই ধারাবাহিক শিখনযাচাই।

শিখনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে তাদের শিখনের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে যাচাই করতে হবে। এমনকি শিখনে তাদের কোনো্ কোনো্ দিক বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলোও জানতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাদের শিখনকে ত্বরান্বিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য ধারাবাহিক শিখনযাচাই কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এক কথায় ধারাবাহিক শিখনযাচাই সম্পর্কে বলা যায় যে, কোনো কোর্স বা পাঠদান চলাকালে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের চূড়ান্ত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য ক্রমাগতভাবে যে ধরনের যাচাই করা হয় তাকে ধারাবাহিক শিখনযাচাই (Continuous Assessment) বলা হয়। এ ধরনের শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (Feedback) দিয়ে তাদের শিখনের চূড়ান্ত বা সামষ্টিক যাচাই করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত যাচাইয়ের আগে তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমেই শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা জানা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিয়ে তাদের শিখনের মাত্রাকে আরও উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং তাদের শিখনে সহযোগিতা করা হয়।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ানো এবং শিখনে প্রেষণা সৃষ্টিতে ধারাবাহিক শিখনযাচাই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ ধরনের শিখন যাচাইকালে স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থী, ক্ষীণবুদ্ধি ও পাঠে ধীরগতির শিক্ষার্থীদের যাচাই করা সহজ হয় এবং এর আলোকে তাদের পাঠে অগ্রগতি আনয়ন সম্ভব হয় এবং এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যায়নভীতি দূর করতে সহায়তা করে। এছাড়া ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যায়। অন্যদিকে এ ধরনের শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করার কারণে সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন ও তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। ধারাবাহিক শিখনযাচাই অপেক্ষাকৃত সঠিক ও তথ্যভিত্তিক হয় এবং নিয়মিতভাবে এটা প্রয়োগের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ধারাবাহিক শিখনযাচাই পাঠের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক সূচক হিসেবে কাজ করে। এটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া কোনো একটি বিশেষ স্তরে কী শেখা হয়েছে তাও জানা যায় ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে।

এ ইউনিটে ধারাবাহিক শিখনযাচাই সম্পর্কিত যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো–

৮.১: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৮.২: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ

৮.৩: ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব

৮.৪: ধারাবাহিক শিখনযাচাই লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ।

৮.১ : ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি হলো শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তা ও অন্যটি হলো তার দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা হলো শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে এবং সহজে শিখন সম্ভব হয়। আর এটা নিশ্চিত করা যায় ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে যাচাই করার জন্য ধারাবাহিক শিখনযাচাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের ধারণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একদিকে ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের যাচাই যে কোনো সময় করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এর মাধ্যমে তাদের পুরো কোর্স চলাকালে কোর্সের অগ্রগতি এবং কোর্স পরিচালনায় যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেগুলোও শনাক্ত করা সম্ভব হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষক যে কোনো সময় শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে পারেন। এক্ষেত্রে ধারাবাহিক শিখনযাচাই একদিকে যেমন শিক্ষককে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এগুলোই ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **ধারাবাহিক শিখনযাচাই ব্যাপক :** শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালে পাঠদানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা যায় বলে এটি প্রয়োগের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অনেক বেশি হয়ে থাকে। কোনো একটি নির্দিষ্ট কোর্স আরম্ভ হওয়ার পর কোর্সটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোর্স চলাকালে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নানাভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হতে পারে। কোর্সের অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু আগ্রহী, তাদের উপর অর্পিত কোর্স সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনে তারা কতটুকু দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে কিংবা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় তারা কতটুকু সক্রিয় রয়েছে এসব দিক বিস্তৃতভাবে জানা যায় বলে ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর ব্যাপকতা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা নির্দিষ্ট কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নানামুখী যাচাই করা সম্ভব হয়। ধারাবাহিক শিখনযাচাই পরিচালনাকালে শিক্ষক মূল্যায়নের জন্য শুধু কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর নির্ভর করেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষককে সময়ের প্রয়োজনে এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার আলোকে শিখনযাচাই মানদণ্ড পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে হয়। এ কারণে এটি কখনো সীমিত থাকে না। শিখনযাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা যাচাই করার জন্যও ব্যাপকভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়।

২. **এটি ক্রমযোজিত :** শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার ভিত্তিতে তাদের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করা হয় বলে ধারাবাহিক শিখনযাচাই প্রক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন– শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রথমে শ্রেণির কাজ দেওয়ার পর ধীরে ধীরে সাপ্তাহিক, মাসিক বা ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে তাদের শিখনযাচাই করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক সক্রিয়তার পাশাপাশি শিখনে তাদের শারীরিক সক্রিয়তার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে শিখনযাচাই প্রক্রিয়াও নানামুখী হতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কখনও তাদের মৌখিকভাবে শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, আবার কখনও লিখিতভাবে তাদের শিখনযাচাই করা হয় বলে এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধারাবাহিকভাবে এটি বর্ধিত হয়। অর্থাৎ এটি পরিচালনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ প্রক্রিয়ার মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. **সমস্যা নির্ণায়ক :** যে কোনো শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করা। পাশাপাশি শিখনে বাধা সৃষ্টিকারী যেসব উপাদান কাজ করে সেগুলো শনাক্ত করাও শিখন যাচাইয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য। এ কারণে শিক্ষার্থীদের শিখনে যেসব সমস্যা বা দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করা ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে চিহ্নিত সমস্যাগুলো কীভাবে দূর করা যায় তার সম্ভাব্য উপায় নির্দেশ করা যায় ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে। এ জন্য ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমস্যা নির্ণায়ক।

   সব স্তরের শিক্ষার্থীরাই পড়ালেখায় নানা রকম সমস্যা বা বাধার মুখোমুখি হতে পারে। কেন তারা পড়ালেখায় বাধার মুখে পড়ে সেটা জানা জরুরি। মোট কথা, শিখনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা শনাক্ত করতে হবে। এটা করা যায় তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করার মাধ্যমে। শিখনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা নির্ণয় করার পর সেগুলো নিরাময়ের জন্য পথনির্দেশ করে দেওয়াও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের কাজ। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী উচ্চতর মেধার অধিকারী আবার কোনো কোনো শিক্ষার্থী মধ্যম মানের মেধার অধিকারী। এ দুয়ের মধ্যে শিখনে সমন্বয় সাধনের জন্য শিক্ষককে শিখন যাচাইয়ে যথেষ্ট দক্ষ হতে হয়। তবে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, উপযুক্ত নির্দেশনা এবং সহায়তা পেলে মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদেরও উচ্চ মানের শিক্ষার্থী হিসেবে তৈরি করা সম্ভব। তবে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিখনে কোন্ কোন্ দিক বাধা হিসেবে কাজ করে তা আগে শনাক্ত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য ধারাবাহিক শিখন যাচাইকে সমস্যা নির্ণায়ক বলা হয়।

৪. **এটি একটি গঠনকালীন শিখনযাচাই :** শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালেই তাদের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেওয়ার সুযোগ থাকে। ধারাবাহিক শিখনযাচাই (Assessment for Learning)-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব দুর্বলতা সংশোধনের সুযোগ থাকে। এ ধরনের শিখন যাচাইকালে স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থী, ক্ষীণবুদ্ধি ও পাঠে ধীরগতির শিক্ষার্থীদের যাচাই করা সহজ হয় এবং এর আলোকে তাদের পাঠে অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা, মৌখিক উপস্থাপন, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, ব্যক্তির আচরণ, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা ইত্যাদি দিকগুলোর বিকাশ ঘটানো যায়। এসব কারণে ধারাবাহিক শিখনযাচাইকে গঠনকালীন শিখনযাচাই বলা হয়ে থাকে।

৫. **নির্দেশনা-কেন্দ্রিক :** শিক্ষার্থীদের শিখনে যেসব দিক বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলো চিহ্নিত করা সবচেয়ে জরুরি। কারণ শিক্ষার্থীরা কেন নির্দিষ্ট সময়ে শিখতে পারে না কিংবা তাদের শিখনের অগ্রগতি যতটুকু প্রত্যাশিত ছিল তা কেন পূরণ হয়নি অথবা শিখনে তাদের কী কী দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করে নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় বলে এটিকে নির্দেশনা-কেন্দ্রিক শিখনযাচাই হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়াই হলো ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে অনাগ্রহের কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যেভাবে নির্দেশনা দেবেন শিক্ষার্থীরাও সেভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে।

৬. **এটি প্রকৃতিগতভাবেই পদ্ধতিসম্মত :** ধারাবাহিক শিখনযাচাই পরিচালনাকালে এর পরিচালনাকারীকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। যেমন– শিখনে শিক্ষার্থীর যেসব দক্ষতা যাচাই করা হবে সেগুলো আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং কখন তা প্রয়োগ করতে হবে, কত সময় ধরে শিখনযাচাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে এবং কীভাবে শিখনযাচাই করা হবে এগুলো প্রয়োগ করার আগেই নির্দিষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ এটি কখনোই এলোমেলো বা বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালনা করা যাবে না। কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা পরিচালনা করতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এ ধরনের শিখনযাচাই প্রক্রিয়া ভেঙে ভেঙে করা যায় না। সব সময় এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। এ জন্য দেখা যায় ধারাবাহিক শিখনযাচাই বৈশিষ্ট্যগতভাবেই পদ্ধতিসম্মত।

এসব ছাড়াও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের আরও কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো–

- এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে স্বল্প সময়ে বিস্তৃত ধারণা লাভ করা যায়।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
- ধারাবাহিক শিখনযাচাই হতে পারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে।
- এর মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে শিক্ষক তা ঠিক করতে পারেন।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে সফলতা ও ব্যর্থতা শনাক্ত করে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যায়।
- শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর ধারণা গঠনের জন্য এটি একটি ধারাবাহিক ও নিরন্তর প্রক্রিয়া।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কতটা সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে এটি তার একটি তদারকি প্রক্রিয়া।
- এটি পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বা প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও সবলতার মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারাবাহিক শিখনযাচাই একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক উপকরণ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- এটি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের হতে পারে।
- শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো জানা যায় এবং এটি শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জনে সহায়তা করে।
- হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা যেমন– কোনো, বলা, পড়া ইত্যাদি কম সময়ে, কম খরচে ও সহজে পরিমাপ করে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া এবং নিরাময়মূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যায়।

ধারাবাহিক শিখনযাচাই শিক্ষার্থীর শিখনে যেভাবে সহায়তা করে

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করা এবং তাদের শিখন ত্বরান্বিত করা। একই সঙ্গে শিখনে তাদের যেসব দুর্বল দিক রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের আরেকটি কাজ। তবে এর বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এটি শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি সাধারণত নিম্নবর্ণিত ছয়টি উপায়ে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করে–

১. **একীভূত ধারণার বৃদ্ধিকরণ :** ধারাবাহিক শিখনযাচাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন এক ধারণার সৃষ্টি করে যে, সব শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত সময় এবং অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ পেলে তারা শিখনে তাদের দক্ষতার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এটি পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও ভীতি হ্রাস করে এবং শিখনে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। যখন অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রাধান্য পায় তখন সত্যিকারের শিখন সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একীভূত ধারণার বিকাশ ঘটে। পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু ভালো ফল করার ধারণার পরিবর্তে যখন জ্ঞান অর্জনের মাত্রা যাচাই করার ব্যবস্থা থাকে তখন তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। সহপাঠীদের মধ্যে আন্তঃপ্রতিযোগিতার পরিবর্তে জ্ঞান অর্জন এবং পরস্পর সহযোগিতা করার মনোভাব গঠিত হয়। ফলে তাদের ভেতর একীভূত শিখনের ধারণার বৃদ্ধি ঘটে।

২. **সবার জন্য উচ্চতর শিখন মান নিশ্চিতকরণ :** ধারাবাহিক শিখনযাচাই প্রক্রিয়ায় উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নিজেরা শিখনের উপকরণ ব্যবহার করে জ্ঞানের চর্চা করতে পারে এবং তারা তাদের আরও চ্যালেঞ্জিং কাজে নিয়োজিত রাখতে পারে। এই অর্থে, এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আদর্শ মান প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনে সর্বোচ্চ সাহায্য করে থাকে, যা সবার জন্য উচ্চতর শিখন মান হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কারণ শিখনে তাদের সাফল্যকে একটি পরম ও স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখনে উৎসাহিত হয় এবং সবার জন্য উচ্চতর শিখনের একটি নির্দিষ্ট মান বজায় থাকে। এ ধরনের শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করার সুযোগ থাকে বলে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও আদর্শ মানের শিখন কার্যক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৩. **মূল্যায়নের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ :** শিখনযাচাই পরিচালনার একটি সমস্যা হলো এই যে, একবার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পরস্পর তুলনা করা, একই সময়ে তাদের পরবর্তী কোর্সে উত্তীর্ণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে এটা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যকেই বিপর্যস্ত করে; কারণ মূল্যায়নের প্রবণতাই থাকে শিক্ষার্থীদের স্তর উন্নীত করা, অথচ কোনোরূপ মানদণ্ডের উপর নির্ভর না করে সবাই তাদের স্তর উন্নয়ন করতে চায়, যদিও তারা শিখনের নির্ধারিত বিষয়বস্তু যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এ জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনের দুর্বলতাগুলো সংশোধনের সুযোগ না নিয়ে পরবর্তী শিখনে অগ্রগামী হয়। এ পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন কেন করা দরকার তার স্পষ্ট উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে। শুধু শিখনস্তর উন্নয়ন নয়, শিখনের সমস্যা সমাধান করে শিখনমান উন্নয়নই হবে মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য। কারণ এ দিকটিই শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করে।

৪. **সবল দিকের মাধ্যমে দুর্বল দিকগুলোর প্রতিকার প্রদানের সামর্থ্য :** শিখন যাচাইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীদের শিখনের দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেসব সবল দিক রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে তাদের শিখনের অন্তরায় হিসেবে যেসব উপাদান কাজ করে সেগুলো দূর করার জন্য তাদের ভেতরে সামর্থ্য গড়ে তোলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে শ্রেণিতে গণিতে প্রতিভাধর শিক্ষার্থী রয়েছে তার মাধ্যমে অন্য শিক্ষার্থীদের গণিত শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। আবার শ্রেণিতে এমন অনেক শিক্ষার্থী থাকে যারা বইপত্র পড়ে গণিতে ভালো করতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে উভয় ধরনের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে নানা ধরনের প্রশ্ন করে থাকে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব শিক্ষার্থীর ভেতর সবল দিকগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা সম্ভব।

৫. **আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে :** এটি ওইসব শিক্ষার্থীর জন্য আত্মসচেতনতার সৃষ্টি করে যারা ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যবধান বা দূরত্ব রয়েছে সেটি অনুধাবন করতে পারে। আত্মসচেতনতা এমন এক ধরনের অনুভূতি ও চিন্তা যা পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক গার্নার (Prof. Gardner) যুক্তি দেন যে, আত্মসচেতনতা–অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (intra-personal skill)– যা ৮ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত দক্ষতা [অন্য দক্ষতাগুলো হলো ভাষাগত (linguastic), গাণিতিক যুক্তিভিত্তিক (logical-mathematical), প্রকৃতিবাদী (naturalist), দৈহিক-গতিসম্বন্ধীয় (bodily-kinesthetic), স্থানিক (spatial), বাদ্যযান্ত্রিক (musical) এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (interpersonal skill)]। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, কীভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞান অর্জন করে এবং কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে। মূলত এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতন হতে সহায়তা করা হয়।

৬. **বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র এবং ধারণার মধ্যে আন্তঃক্ষেত্রগুলোর সম্পর্ক উন্মোচন করার সামর্থ্য :** ধারাবাহিক শিখনযাচাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু কতটুকু আয়ত্ত করতে পারল সে সম্পর্কে শিক্ষকের বোধগম্যতাকে পরিমার্জন করতে সহায়তা করে। শিক্ষক কোনো বিষয়ের সমস্যা সমাধানের এমন একটি কার্যকর প্রতিকার খুঁজে বের করতে পারেন যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাধারণ ভুল ধারণার অবসান করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে জানা এবং তাদের শিখনে যেসব দিক বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলো শনাক্ত করার পর তা দূর করার যথাযথ উদ্যোগ নিতে হলে ধারাবাহিক শিখন যাচাই প্রয়োগ করতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী কোর্সের জন্য উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা হয়।

৮.২ : ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ

শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করার জন্য নানা ধরনের উপায় রয়েছে। যেমন– শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপর শ্রেণির কাজ দিয়ে অথবা তাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অভীক্ষা তৈরি করে তা প্রয়োগ করার মাধ্যমেও তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়। তবে অভীক্ষা তৈরির পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অথবা ঘোষণা না দিয়েও ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা যেতে পারে। অভীক্ষা ছাড়া তাদের শিখনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, চেকলিস্ট তৈরি করে তা প্রয়োগ করা, প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা, বাড়ির কাজ প্রদান, কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং ক্লাস-টেস্ট নেওয়া ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের উপর ধারাবাহিক শিখনযাচাই পরিচালনা করা যায়। ধারাবাহিক শিখনযাচাই আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবেই ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত শিখনযাচাই সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

১. পর্যবেক্ষণমূলক শিখনযাচাই
২. মৌখিক শিখনযাচাই
৩. লিখিত শিখনযাচাই।

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ একটি চিত্রের সাহায্যে নিচে দেখানো হলো–

চিত্র : ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. পর্যবেক্ষণমূলক শিখনযাচাই

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ের জন্য নানা ধরনের উপায় রয়েছে। এসব উপায়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অভীক্ষার প্রয়োগ একটি উপায়। কিন্তু অভীক্ষা ছাড়াও শুধু পর্যবেক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে শিখন যাচাইয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীর আচরণ এবং শিখন সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হলে শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে পর্যবেক্ষণ অবশ্যই ধারাবাহিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থী কখন কী করছে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে একটি লিখিত রেকর্ড রাখা দরকার। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের সাড়া প্রদান, শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা, পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ইত্যাদি দিকের প্রতি শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হয়। এর ফলে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, আগ্রহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। এর উপর ভিত্তি করেই

তাদের শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্ভব হয়। সুতরাং দেখা যায় শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণের আরও নানা ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে। পর্যবেক্ষণ যে শুধু শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ তা নয়। বরং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

২. মৌখিক শিখনযাচাই

শিক্ষার্থীদের প্রায়ই মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের যে যাচাই করা হয় তাকে মৌখিক শিখনযাচাই বলা হয়। মৌখিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিখনের বিষয়বস্তুসহ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়ন সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। নিম্নবর্ণিত উপায় অনুসরণ করে মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের যাচাই করা যেতে পারে–

মৌখিক প্রশ্নকরণ

শুধু পড়ালেখা নয় বরং পড়ালেখার বাইরে আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা বা চিত্র পাওয়া যেতে পারে। যেমন– চাকরির ক্ষেত্রে চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কর্মী নিয়োগ করতে চান তাদের আবেদনপত্র আহ্বান করার পর বাছাইকৃত প্রার্থীদের অনেক সময় মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট পেশা সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাই করার পাশাপাশি তার প্রশ্নের উত্তরদানের কৌশল, প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে রুচি ইত্যাদি বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। এমনকি ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের প্রতি প্রার্থীর কতটুকু মনোযোগ রয়েছে, চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রার্থীর আগ্রহ কতটুকু এসব জানতে হলেও মৌখিক প্রশ্ন করতে হয়। একইভাবে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পারল বা পাঠের কোনো্ কোনো্ অংশ বুঝতে পারল না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এ ছাড়া পাঠদানকালে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হলে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে প্রশ্ন করলে শ্রেণিকক্ষও বক্তৃতাদানের ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয় না। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি জানা সম্ভব হয় বলে শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন করাও এক ধরনের শিখনযাচাই প্রক্রিয়া।

৩. লিখিত শিখনযাচাই

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য লিখিতভাবে যে ধরনের যাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় সেগুলোই হলো লিখিত শিখনযাচাই। লিখিত শিখন যাচাইয়ের মধ্যে রয়েছে শ্রেণি অভীক্ষার প্রয়োগ, শ্রেণির কাজ, শিক্ষার্থীদের উপর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে অভীক্ষার প্রয়োগ, টার্ম পেপার প্রণয়ন, বাড়ির কাজ সম্পাদন, চেকলিস্ট তৈরি ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো–

শ্রেণির কাজ

শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় রাখতে হলে শ্রেণিতে নানা ধরনের কাজ দিতে হয়। যেমন– লিখতে দেওয়া, জোড়ায় কাজ করতে দেওয়া, কখনো কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে দলগত আলোচনা করতে দেওয়া, আবার কখনো তাদের দিয়ে কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। এসব কাজকে শ্রেণির কাজ বলা হয়। মোট কথা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট যে ধরনের কাজই করতে দেওয়া হোক না কেন সবগুলোই শ্রেণির কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে দিলেও তাদের শিখনের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা যায়। মূলত শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কাজগুলো শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এজন্য শ্রেণির কাজ এক ধরনের শিখনযাচাই।

শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণি অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ব্যস্ত রাখা যায়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপর দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে শ্রেণি অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শিখন সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। তবে শ্রেণি অভীক্ষা প্রয়োগের আগে শিক্ষককে যথেষ্ট সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অভীক্ষা প্রস্তুত করতে হবে। অভীক্ষার বিষয়বস্তু যাতে অতি মাত্রায় কঠিন কিংবা অধিকতর সহজ না হয় অথবা এটি যাতে বিষয়বস্তু বহির্ভূত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শ্রেণি অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতির একটি সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় বলে এটিও এক ধরনের শিখনযাচাই প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শ্রেণি অভীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন পাঠের অগ্রগতি এবং তার লিখিত প্রকাশভঙ্গির একটি চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীরা যাতে বাড়িতে পড়ালেখায় কিছুটা হলেও ব্যস্ত থাকে সে জন্য তাদেরকে বাড়ির কাজ দিতে হয়। দৈনন্দিন বাড়ির কাজ দিয়ে বা বিশেষ কাজ দিয়েও শিক্ষার্থীদের শিখনের ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তাদের বাড়িতে পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে তাদের শিখনে গতি সঞ্চার হয় এবং তারা নিয়মিত পড়ালেখায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে তাদের পড়ালেখা করতে এক রকম বাধ্য করা হয় এবং এর ফলে তাদের পড়ালেখার অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। এ কারণে বাড়ির কাজও এক ধরনের শিখনযাচাই প্রক্রিয়া। তবে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, বাড়ির কাজ যাতে তাদের জন্য বোঝা হিসেবে দেখা না দেয়। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব বিষয় মিলিয়ে যদি অল্প অল্প করে বাড়ির কাজ দেওয়া হয় তাহলেও তা তাদের জন্য বেশ চাপ হিসেবে দেখা দেবে। এ জন্য বাড়ির কাজ কম পরিমাণে দেওয়া উচিত যাতে একদিকে তারা পড়ালেখায় সম্পৃক্ত থাকে এবং অন্যদিকে তাদের কাছে এটা বোঝা না হয়।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষা

মাধ্যমিক স্তরের কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাস পর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করা যেতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষাকে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা বলে। বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে ষাণ্মাসিক পরীক্ষার প্রচলন রয়েছে। এই পরীক্ষাকে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বলা হয়। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার মধ্যে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পড়ালেখার অগ্রগতি জানা যায়। এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং তাদের যথাযথ পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে বলে এটিও এক ধরনের ধারাবাহিক শিখনযাচাই। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের শেষে পরবর্তী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

অর্পিত কাজ

শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের যে কাজ দেওয়া হয় তাকে অর্পিত কাজ বলে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত অর্পিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা যায়। তবে অর্পিত কাজ শ্রেণিকক্ষের বাইরেও করার জন্য দেওয়া যেতে পারে। অর্পিত কাজ যেখানেই সম্পন্ন করার জন্য দেওয়া হোক না কেন শিক্ষক নিজে অর্পিত কাজের তদারকি করবেন। কারণ অর্পিত কাজের মাধ্যমে তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করা হয়ে থাকে।

টার্ম পেপার

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক ক্লাসের বিভিন্ন বিষয়ের উপর টার্ম পেপার তৈরি করে আনার নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে এবং তারা তা যথাযথভাবে করেছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পারল টার্ম পেপারের উপর নির্ভর করে তা জানা সম্ভব হয়। টার্ম পেপার রচনার মাধ্যমে তাদের লেখার দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন পড়ায় অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শিখনেরও ধারাবাহিক যাচাই করা সম্ভব হয়।

সেমিনার

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে পারেন। এতে তাদের পাঠে অগ্রগতি হয় এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি শিখন পরিবেশ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মুক্তি লাভ করে। এভাবে বিকল্প পদ্ধতিতে তাদের শিখনে গতি সঞ্চার করা যায়। এর মাধ্যমেও তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়। এ কারণে সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করাকেও এক ধরনের ধারাবাহিক শিখনযাচাই হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফর

আনুষ্ঠানিক শিখন কার্যক্রমের বাইরে শিক্ষা সফর কার্যকর শিখনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে শিক্ষা সফরে গমনের আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, সাংগঠনিক দক্ষতার উন্নয়ন, সহযোগিতার মনোভাব গঠন হয় বলে শিক্ষা সফরকে শিখনের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বাস্তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব গুণাবলির বিকাশ ঘটল কিনা সেটা জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হয়। এ কারণে শিক্ষা সফরকেও এক ধরনের ধারাবাহিক শিখনযাচাই বলা যেতে পারে।

কুইজ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করে ধাঁধার আকারে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা যায়। এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কুইজের আয়োজন করার মাধ্যমে ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা যেতে পারে। কুইজ প্রয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এটি শিক্ষার্থীদের ভেতর কোনোকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে।

ইনভেন্টরি বা চেকলিস্ট

সব শিক্ষার্থী একই সময়ে সমানভাবে পাঠের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে না। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় কোনো শিক্ষার্থীর কম সময় লাগে আবার কোনো শিক্ষার্থীর সময় অনেক বেশি প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সবার শিখনের অগ্রগতি সমান হয় না। এ কারণে কে কোনো্দিন কী শিখল তার একটি তালিকা তৈরি করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে করার দায়িত্ব দিতে পারেন। এমনকি শিক্ষক নিজে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের একটি ইনভেন্টরি বা চেকলিস্ট তৈরি করতে দিয়েও তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন। এভাবে শিখনের বিষয়বস্তুর উপর একটি ইনভেন্টরি বা চেকলিস্ট তৈরি করার সুযোগ থাকলে তারা নিজেরাই নিজেদের শিখনের মাত্রা নিরূপণ করতে পারে। এই চেকলিস্ট সহপাঠীদের সাথে তুলনা করে নিজের শিখনের গতি বাড়ানো যায়।

রেটিং স্কেল

শিক্ষার কোনো বিষয়ের উপর প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতার নিজস্ব মতামত প্রকাশের প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যম হলো রেটিং স্কেল (Rating scale)। সাধারণত উত্তরদাতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশ্নের উত্তরে এর পক্ষে বা বিপক্ষে বলে কিংবা উত্তর না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকে। তবে অনেক সময় নানা কারণে মতামতের মাত্রাগত পার্থক্য দেখা যায়। উত্তরদাতা কর্তৃক মতামত যা-ই দেওয়া হোক না কেন তা একটি স্কেলে প্রকাশ করা যায়। এটিকে রেটিং স্কেল বলা হয়। যেমন– শিক্ষার্থীর যে কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কতকগুলো সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে বা স্কেলে বিভক্ত করা যায়। রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ওইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে মাত্রা অনুযায়ী সুসংহতরূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মাঝে মাঝে তাদের শিক্ষার্থীদের সততা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, আগ্রহ, প্রকাশক্ষমতা, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপন কৌশল, নৈতিকতা ইত্যাদি দিকগুলো নিয়ে রেটিং করতে হয়। রেটিং সাধারণত ৩ বা ৫ মাত্রার হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও সাত মাত্রারও রেটিং স্কেল করার প্রয়োজন হতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ের জন্য পাঠের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর ৩ বা ৫ মাত্রার রেটিং স্কেল করে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট দিকের মান যাচাই করা যেতে পারে।

এখানে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র সম্পর্কিত 'আবেগ প্রবণতা' বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিন ও পাঁচ মাত্রার দুটি পৃথক নমুনা রেটিং স্কেল তুলে ধরা হলো–

তিন মাত্রার রেটিং স্কেল

আবেগপ্রবণ	মোটামুটি আবেগপ্রবণ	আবেগহীন

পাঁচ মাত্রার রেটিং স্কেল

খুব আবেগপ্রবণ	আবেগপ্রবণ	মোটামুটি আবেগপ্রবণ	আবেগহীন	খুব আবেগহীন

বিতর্ক ও আলোচনা সভা

বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তিদানের ক্ষমতা ও দক্ষতা উভয়েরই বিকাশ ঘটে। এজন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক এবং আলোচনা সভার আয়োজন করেও শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অগ্রগতি যাচাই করা যেতে পারে। বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, যুক্তিদানের ক্ষমতা, নতুন নতুন তথ্য খোঁজার অভ্যাস গঠন এবং অন্যের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের শিখনে বিতর্ক ও আলোচনা সভা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এসব ছাড়াও নিম্নবর্ণিত উপায়ে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা যেতে পারে–

- দৈনন্দিন উপস্থিতি বা ক্লাসের হাজিরাও ধারাবাহিক যাচাইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল।
- শিক্ষার্থীদের ডায়েরি লিখতে দিয়েও ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা যায়।
- একেকজন শিক্ষক একেকটি শাখার দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত বা Cumulative রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারেন। এটিও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের একটি কার্যকর কৌশল।
- Anecdotal (ক্ষুদ্র উপাখ্যান) রেকর্ড বা শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ কৃতকার্যের বিবরণের রেকর্ড সংরক্ষণ করাও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের আরেকটি কৌশল। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো ঘটনা বা আচরণের নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাকে ক্ষুদ্র উপাখ্যান বলা হয়। ক্ষুদ্র উপাখ্যানের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হয় এবং কেবল একটি ঘটনা বা আচরণকে কেন্দ্র করে এটা লিখতে হয়। সাধারণত ঘটনা বর্ণনার সাথে এর একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধেও সুপারিশ করা হয়।
- বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থীদের যে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেওয়া হয় এটিও এক ধরনের ধারাবাহিক শিখনযাচাই। একমাত্র চূড়ান্ত প্রোগ্রেস রিপোর্ট ছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার অন্য সময়ে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের সমস্যা শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে যাচাই করার জন্য এখানে যেসব উপায় বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করে তোলে। প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদের শিখনে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়।

৮.৩ : ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের কার্যকর প্রয়োগ করতে হলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের সফল প্রয়োগ নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক যদি আন্তরিকভাবে ধারাবাহিক শিখনযাচাই প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রয়োগ করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনের অগ্রগতি আশানুরূপভাবে অর্জন করতে সক্ষম হবে। শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যেসব দুর্বল দিক রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করার পর কীভাবে তা দূর করা যায় এবং কীভাবে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব এ বিষয়ে শিক্ষকই প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হলো শিক্ষকের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা।

শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু তাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ বা জ্ঞানের সরবরাহ করা নয়। কারণ শুধু জ্ঞান অর্জন শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ হলে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানামুখী সমস্যার সমাধানে দক্ষ করে গড়ে তোলা। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করতে হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে পাঠক্রমিক কার্যক্রম যেমন থাকে তেমনি থাকে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই উভয় ধরনের কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়। এ কারণে ধারাবাহিক শিখনযাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণের মাত্রা মূল্যায়ন করতে হবে। নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হলো– নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা। এসব দিকের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হলে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষার্থীর

এসব দিকের যাচাই করতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইকালে শিক্ষককে নিম্নের চিত্রে বর্ণিত দিকগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে–

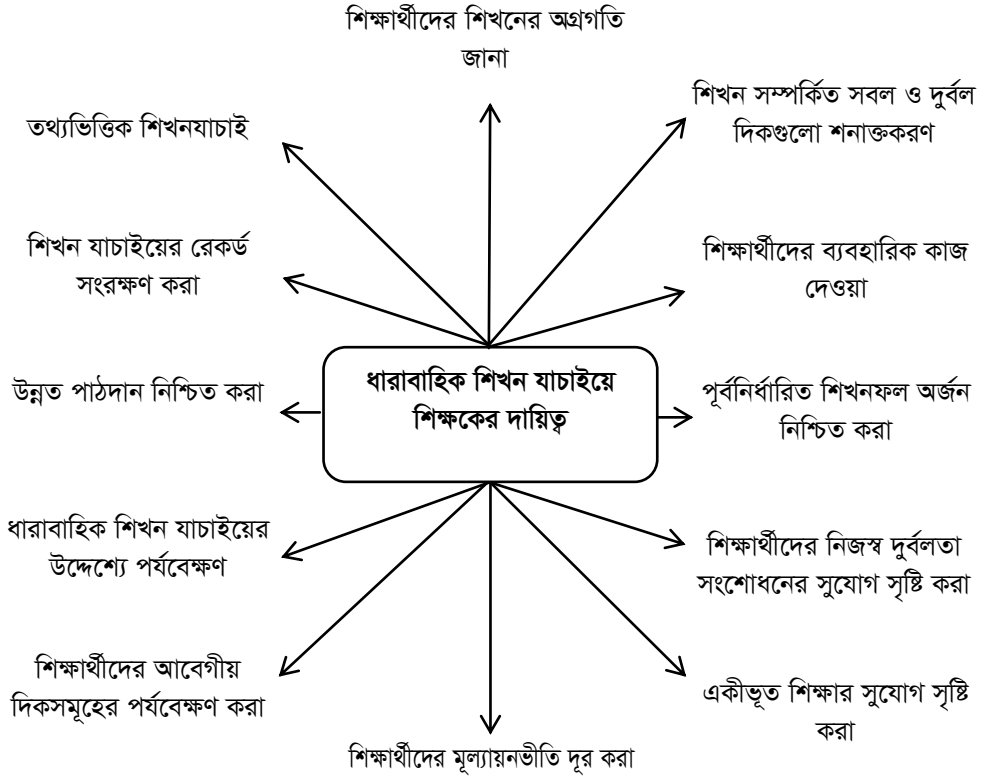

চিত্র : ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব

ধারাবাহিক শিখনযাচাই সম্পর্কিত শিক্ষকের দায়িত্বের দিকগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. **শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি জানা :** নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদান করেন। পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর কতটুকু শিখতে পারল তা শিক্ষকের জন্য জানা জরুরি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি জানার মাধ্যমে শিক্ষক তার পাঠদানের সফলতা সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি কতটুকু হলো তা তাৎক্ষণিকভাবে জানার উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি জানতে হবে।

২. **শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কিত সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্তকরণ :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যতই ভালোভাবে পাঠদান করুন না কেন শিক্ষার্থীদের একটা অংশ যথাযথভাবে শিখতে পারে না। কেন ওইসব শিক্ষার্থী শিখতে পারে না তার কারণ অনুসন্ধান করা শিক্ষকের জন্য অবশ্যই জরুরি। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের শিখনের দুর্বল দিকগুলো শিক্ষককে শনাক্ত করতে হবে এবং সেগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। তবে শিখনে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিকগুলো জানার পাশাপাশি তাদের সবল দিকগুলোও জানতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের সবল দিকগুলো জেনে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে দুর্বল দিকগুলো নিরসন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালেই তাদের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই শিক্ষককে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. **শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কাজ দেওয়া :** শিক্ষার্থীরা যাতে হাতে-কলমে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদের ব্যবহারিক কাজ দিতে হবে এবং তাদের কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের উপর অর্পিত কাজ শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক কতটুকু সম্পন্ন করতে পারল তা শিক্ষককে জানতে হবে। তারা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করবে তা বাস্তবভিত্তিক হয় এবং অর্জিত জ্ঞান যথার্থ হয়। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই শিক্ষককে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই সহজ হবে।

৪. **পাঠের পূর্বনির্ধারিত শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা :** শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বেই শিক্ষককে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর কতকগুলো শিখনফল শনাক্ত করে নিতে হবে। শিখনফলকে সামনে রেখে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদান করবেন। পাঠদান শেষে শিক্ষকের জন্য এটা জানা খুব জরুরি যে, শিক্ষার্থীরা পাঠের নির্ধারিত শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পারল কিংবা তারা আদৌ শিখনফল অর্জন করতে পারল কিনা। শিক্ষার্থীরা যদি পূর্বনির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে না পারে তাহলে শিক্ষককে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই শিক্ষার্থীরা পাঠের পূর্বনির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারল কিনা তা জানতে হবে। শিক্ষক যদি নিশ্চিত হন যে, শিক্ষার্থীরা পাঠের পূর্বনির্ধারিত শিখনফল যথাযথভাবে অর্জন করতে পারেনি তাহলে শিক্ষককে ওই বিষয়বস্তুর উপর পুনরায় পাঠদান করতে হবে। এরপর একইভাবে শিক্ষককে যাচাই করতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে।

৫. **শিক্ষার্থীদের নিজস্ব দুর্বলতা সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনে আলাদা আলাদা অন্তরায় থাকে। এগুলোকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দুর্বলতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শিখনে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বা ব্যক্তিগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। অর্থাৎ শিক্ষককে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দুর্বলতা সংশোধনের জন্য যথাযথ পরামর্শ দিতে হবে এবং সেগুলো সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এরপর শিক্ষক তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের পদক্ষেপ নেবেন। অন্য কথায় বলা যায়, ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের জন্যই শিক্ষককে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। এটা শিক্ষাদান নীতির আওতায় শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬. **একীভূত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা :** শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে যে পঠন-পাঠন কার্যক্রমে যাতে স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থী, ক্ষীণবুদ্ধি ও পাঠে ধীরগতির শিক্ষার্থীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ সব শ্রেণিতে নানা ধরনের নানা মেধার শিক্ষার্থী থাকে। তাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম নয়। তাদের সবাই একইভাবে শিখতে পারে না। এ কারণে শ্রেণিকক্ষে যাতে সব ধরনের শিক্ষার্থী শেখার সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে ভিন্ন ভিন্ন শিখন-কৌশল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে তাদের সবার ধারাবাহিক শিখনযাচাই করার সুযোগ রাখতে হবে এবং এর আলোকে তাদের পাঠের অগ্রগতি সাধন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নভীতি দূর করা :** প্রায় সব ধরনের শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন নিয়ে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়ে যদি কোনো ধরনের ভয়ভীতি থাকে তাহলে তা তাদের শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিখনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কিছু কিছু শিক্ষার্থী পড়ালেখার মূল ধারা থেকে ঝরে পড়ে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার কারণে অহেতুক ভয়ভীতি না পায় এবং এর কারণে তারা যাতে ঝরে না পড়ে তার জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। মূলকথা হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে মূল্যায়নভীতি না থাকে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শিক্ষককেই করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের জন্য তাদের মধ্য থেকে মূল্যায়নভীতি দূর করতে হবে।

৮. **শিক্ষার্থীদের আবেগীয় দিকসমূহের পর্যবেক্ষণ করা :** শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য শুধু সাধারণভাবে তাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না, বরং শিক্ষার্থীদের আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন করা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কার্যকর ও সফল পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন করা সম্ভব। এটাকে এক ধরনের পরিচর্যামূলক নির্দেশনা বলা যেতে পারে। শিক্ষকের দেওয়া এ নির্দেশনার ফলে শিক্ষার্থীরা যথাযথ আচরণ করায় অভ্যস্ত হয় এবং এর ফলে তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ হয়।

৯. **ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ :** কেন শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করা প্রয়োজন তা শিক্ষককেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এরপর শিক্ষক তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠদানের তার নিজস্ব কৌশল ও গতির পরিবর্তন করতে পারেন। মূলত শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এটা শিক্ষকের দায়িত্ব।

১০. **উন্নত পাঠদান নিশ্চিত করা :** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের উদ্দেশ্য থাকে শিখনের বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে মনোযোগী থাকে তা বিবেচনায় রেখে উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। এর জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনে তার পাঠদানের মধ্যেও পরিবর্তন

আনতে হতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান যদি দুর্বল হয় তাহলে ওই দুর্বল পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের যেমন অগ্রগতি হয় না, ঠিক তেমনি তা যাচাই করাও সম্ভব হয় না। এজন্য ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষককে উন্নত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। কারণ শিক্ষকের উন্নত ও পদ্ধতিসম্মত পাঠদানের উপর শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নির্ভর করে।

১১. **শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করা :** শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য নির্ধারিত ছক মোতাবেক রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। একই সঙ্গে শিখন যাচাইয়ের উপর সংরক্ষিত রেকর্ড পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ এ ধরনের শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করার মাধ্যমে সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই রেকর্ড সংরক্ষণ করা জরুরি। তবে রেকর্ড শুধু সংরক্ষণ করলেই হবে না তা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১২. **শিখনযাচাই হতে হবে তথ্যভিত্তিক :** শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই করতে গেলে নানা ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এসব প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। আবার তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। যেমন– কোনো শিক্ষার্থী কখন বা কোনো্ সময়ে পড়ালেখায় বেশি মনোযোগী থাকে, কিংবা কোনো্ বিষয়টি তার কাছে সবচেয়ে সহজ মনে হয় বা কোনো্ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল বলে মনে হয় এবং কেন তা মনে হয় এসব দিকের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আবার এমন তথ্যও সংগ্রহ করা যেতে পারে যে, পাঠ্য বিষয়ের কোনো্ দিকগুলো তার কাছে সহজ মনে হয় এবং কোনো্ দিকগুলো সে সহজে মনে রাখতে পারে। তবে দরকারি তথ্য ও উপাত্ত যেভাবেই সংগ্রহ করা হোক না কেন তা হতে হবে অপেক্ষাকৃত সঠিক ও তথ্যভিত্তিক। এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই যাতে যথার্থ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

এখানে যেসব দিকের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের যেসব স্তর রয়েছে শিক্ষককে সেগুলোও বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যেই তাদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করা এবং যেসব কারণ বা উপাদান তাদের শিখনের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলো শনাক্ত করে তা দূর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই শিখন কার্যক্রমে সক্রিয় রাখা যায়। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো অন্তরায় বিরাজ করছে কিনা সেটাও জানা যায় শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে।

শিখনের ক্ষেত্রভিত্তিক শিখনযাচাই

আমেরিকার শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী **বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম** (Benjamin Samuel Bloom) **১৯১৩** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যান্সফোর্ডে (Lansford, Pennsylvania) জন্মগ্রহণ করেন এবং **১৯৯৯** সালের **১৩** সেপ্টেম্বর ইলিনয়ের শিকাগোতে (Chicago, Illinois) মৃত্যুবরণ করেন। ব্লুম অনেক গবেষণা করে ব্যক্তির শিখনের উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি ক্ষেত্র বা ডোমেইনে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো–

১. বুদ্ধিবৃত্তীয় বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive domain)
২. আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective domain) এবং
৩. মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor domain)।

Benjamin Samuel Bloom

ব্লুম প্রদত্ত এই তিনটি ক্ষেত্রের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে ধারাবাহিক শিখনযাচাই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রভিত্তিক শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করার জন্য শিক্ষককে পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে। যেমন– বুদ্ধিবৃত্তীয় বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করার জন্য শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বুদ্ধিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের অর্জন পরিমাপের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অর্জন যাচাই করা হয়। আবেগীয় ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর আবেগ বা অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। মনোপেশিজ ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে কাজ করার সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র এবং মনোপেশিজ ক্ষেত্রের দক্ষতার উন্নয়ন পরিমাপ করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে।

তিনটি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. **বুদ্ধিবৃত্তীয় বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই :** জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র বা জ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্র ব্যক্তির চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এটি ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তীয় কার্যকলাপ বা প্রক্রিয়ার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে এটিকে বোধগম্য ক্ষেত্রও বলা হয়ে থাকে। বেঞ্জামিন এস ব্লুম তার Taxonomy of Educational Objectives নামক বইয়ে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'যেসব শিখন উদ্দেশ্য মননশীল ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো জ্ঞানের স্মরণ, চিনে নেওয়া বা শনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য বিকাশের সাথে সম্পর্কিত।' জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুনির্দিষ্ট বা সার্বজনীন কোনো কিছুর স্মরণ, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, প্যাটার্ন, কাঠামোর সেটিং-এর স্মরণ বা মনে করা। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, এই স্তরে জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মানসিক অবস্থাকে বোঝায়। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের প্রথম স্তর। এই জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সুতরাং শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ কতটুকু ঘটল সেটা যাচাই করার জন্য শিক্ষককে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২. **আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই :** ব্লুম তার বইয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। এটি হলো আবেগীয় ক্ষেত্র। তার মতে, এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ ও যথাযথ গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন। তিনি আবেগীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'আবেগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং যথাযথ গুণ বিচার ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বিকশিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বোধগম্যতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।' বাস্তবে শিক্ষার্থীর মধ্যে এগুলোর কতটুকু পরিবর্তন বা উন্নয়ন ঘটেছে তা নিরূপণ করার জন্যই শিক্ষককে ধারাবাহিকভাবে তাদের শিখনযাচাই করতে হবে। কারণ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তির এক ধরনের সামর্থ্য অথবা ধারণাশক্তি বা দক্ষতা যার সাহায্যে কোনো কিছু শনাক্ত করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে, মূল্যায়ন করতে পারে এবং নিজের বা অন্যের বা দলের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীরা তা করতে পারে কিনা এটা জানার জন্যই তাদের আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কতটুকু থাকে সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু সেটাও তারা বিবেচনা করতে পারে কিনা তা জানার জন্য আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করা দরকার।

৩. **মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই :** ব্যক্তির সক্রিয়তা বা ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো কিছু কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। এটাকে এক ধরনের সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বলা হয়। মনোপেশিজ ক্ষেত্রের বিকাশ মূলত ব্যক্তির দৈহিকভাবে বা শারীরিকভাবে কাজ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। এই ক্ষেত্র নিয়ে বেঞ্জামিন ব্লুম বলেন, 'যেসব উদ্দেশ্য ব্যক্তির দৈহিক ও পেশি সঞ্চালনমূলক দক্ষতাকে তাদের বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো ক্রিয়ামূলক বা সক্রিয়তাভিত্তিক ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত।' শিক্ষার্থীদের যেসব আচরণ পেশিজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কারণে ব্যক্তির মধ্যে স্নায়ুপেশিজ সমন্বয় প্রয়োজন সেগুলো ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মনোপেশিজ ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়। এ কারণে শিক্ষককে মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করতে হবে। যেমন– শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ক্রিয়া বা কাজকে সুনিপুণভাবে পরিচালনা করতে পারে কিনা কিংবা শিক্ষকের নির্দেশমতো পৃথকীকরণ করতে পারে কিনা বা উপযুক্ত ক্রিয়া বা কাজকে নির্বাচন করতে পারে কিনা এগুলো যাচাই করা মনোপেশিজ ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত।

এসব আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের গুণগত শিখন পরিমাপ করার জন্য ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষককে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ শুধু একটি স্তরে ঘটে না। বরং বেঞ্জামিন ব্লুমের শিখনের উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ কারণে এ তিনটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটল কিনা সেটা যাচাই করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। একদিকে শিক্ষার্থীদের শিখন যেমন নির্ভর করে শিক্ষকের কার্যকর পাঠদানের উপর, ঠিক তেমনি তাদের জ্ঞানমূলক, আবেগীয় এবং মনোপেশিজ ক্ষেত্রের যথাযথ বিকাশও শিক্ষকের সহায়তার উপর নির্ভর করে। এজন্য শিক্ষককে এমন সব শিক্ষামূলক পরিকল্পনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটে এবং একই সঙ্গে তাদের আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের দক্ষতাগুলো উন্মোচিত হয়। পাশাপাশি তাদের শিখন যাচাইয়ের জন্য এই তিনটি ক্ষেত্রের অর্জিত দক্ষতার উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে সেটা যাতে জানা যায় তারও ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্যের সব ক্ষেত্রের বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটানো যেমন জরুরি, তেমনি তাদের ওইসব ক্ষেত্রের শিখনদক্ষতার যাচাই করাও শিক্ষকের জন্য দরকার। তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে একটি গ্রহণযোগ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। এ কারণে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৪ : ধারাবাহিক শিখনযাচাই লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ধরনের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক শিখনযাচাই প্রয়োগ করা হয়। তবে বাংলাদেশে ২০১২ সালে প্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত দুটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক শিখনযাচাই কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে–

১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই এবং
২. আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনযাচাই।

বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই

শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণও করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য শতকরা ২০ ভাগ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। এ নম্বর নির্ধারিত তিনটি কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনযাচাই করতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতিদিন শ্রেণি বা বাড়িতে পাঠ সম্পর্কিত যেসব কাজ সম্পন্ন করে সেগুলোকে কোর্সওয়ার্ক বোঝায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণ করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের জন্য নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্কের ৩টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলো হলো–

১. শ্রেণির কাজ
২. বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ এবং
৩. শ্রেণি অভীক্ষা।

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্কের ৩টি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. শ্রেণির কাজ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ এগুলো সবই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে কোনো, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। শ্রেণিকক্ষের কিছু কাজ শিক্ষার্থীরা এককভাবে, কিছু কাজ জোড়ায়-জোড়ায়, আবার কিছু কাজ তারা দলগতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক কাজ বিশেষ ধরনের শ্রেণির কাজ। ফলে এ ধরনের কাজের মাধ্যমে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল আয়ত্তে আসে এবং কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বনের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে তিনটি শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে (বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা ইত্যাদি) ওইসব বিষয়ে ১টি ব্যবহারিক কাজ এবং ২টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড রাখতে হবে।

বিষয়শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনযাচাই করা হবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করে প্রতি সাময়িকে (ছয় মাসে) তিনবার মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

২. বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে সেগুলোই বাড়ির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে করবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে যে, শিক্ষার্থী অন্য কারও সহায়তা ব্যতীত একাই বাড়ির নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করতে হবে। বাড়ির কাজ যাচাই করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দেবেন। আর শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেবেন। বাড়ির কাজ যাতে শিক্ষার্থীদের উপর অহেতুক বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার বাড়ির কাজ এমনভাবে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করায় উৎসাহিত না হয়। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে এ দিকটি বিবেচনা করে বাড়ির কাজ দিতে হবে।

বাড়ির কাজ দেওয়ার আগে শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ বাড়ির কাজের মধ্যে পেতে পারে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে সেদিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থী সেগুলো ২০–২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাড়ির কাজ দেবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে প্রতি সাময়িকে ২টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের ৩টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে প্রতি সাময়িকে ২টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের বাড়ির কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। নম্বর রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসেবেই তা সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এ কাজটি কত সময়ের জন্য হবে তা শিক্ষক নির্ধারণ করে দেবেন।

নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের পর্যবেক্ষণ টুল্‌স/সিডিউল/প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষককে নিজে করে দিতে হবে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রতিবেশী এবং কাছাকাছি এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। শিক্ষককে বিশেষভাবে নিশ্চিত হতে হবে যে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে না পড়ে। বিজ্ঞান বিষয়সমূহের জন্য তথ্য সংগ্রহ গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে হতে পারে। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থীরা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং প্রণীত ফলাফলের উপর মতামত দেবে। এরপর সমগ্র কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পাদিত কাজের একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থীরা এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন।

নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক যে কোনো নম্বর বরাদ্দ করতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। নম্বর রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসেবেই তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. শ্রেণি অভীক্ষা

শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তাদের উপর অভীক্ষা পরিচালনা করতে হয়। সাধারণত প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। তবে অধিক নম্বরপ্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বরের একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে ওইসব বিষয়ে ২টি ব্যবহারিক এবং ১টি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড রাখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে ৩টি অভীক্ষার রেকর্ড রাখা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের মানদণ্ড শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময়ে নেওয়া হবে। বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস নির্ধারিত পিরিয়ডে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন ওই শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষককে নিজ নিজ পাঠদানের বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক শিখনযাচাই করে নির্ধারিত ছকে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নং	কোর্সওয়ার্কের নাম	নম্বর
১	শ্রেণির কাজ	৫
২	বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	৫
৩	শ্রেণি অভীক্ষা	১০
	মোট	২০

কোর্সওয়ার্কের রেকর্ড সংরক্ষণ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যেসব কোর্সওয়ার্ক পরিচালনা করা হবে সেগুলোর একটি রেকর্ড রাখতে হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোর্সওয়ার্কের রেকর্ড নিম্নবর্ণিত ছকে সংরক্ষণ করতে হবে–

শ্রেণি: ষষ্ঠ থেকে দশম													**বিষয়: বাংলা ও ইংরেজি**											
প্রথম সাময়িক													দ্বিতীয় সাময়িক											মোট গড় নম্বর
রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	
		কোনো ১	বলা ২	পড়া ৩	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	কোনো/বলা			কোনো	বলা	পড়া	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	লিখিত কাজ	কোনো/বলা			
		১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	২০
১																								
২																								
৩																								

নির্দেশনা (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির জন্য)

১. **শ্রেণির কাজ :** প্রতি সাময়িকে কোনো, বলা এবং পড়া যাচাই করার জন্য ৩টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

২. **বাড়ির কাজ :** প্রতি সাময়িকে ৩টি বাড়ির কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. **শ্রেণি অভীক্ষা (লিখিত এবং কোনো ও বলা) :** প্রতি সাময়িকে ২টি লিখিত অভীক্ষা এবং ১টি কোনো/বলা অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা ছক ব্যবহার করতে হবে।

৫. ১০০ নম্বরের বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে ৬০ নম্বরের প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে এবং ৫০ নম্বরের বিষয়ের প্রতি সাময়িকে ৬০ নম্বরের প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ৬ দ্বারা ভাগ করে সাময়িক গড় নির্ণয় করা যাবে। দুইটি সাময়িকের গড় নম্বরের যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করতে হবে।

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের দুর্বলতা চিহ্নিত করে নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এ জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের শিখনের উন্নয়নে ধারাবাহিক শিখনযাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে। আর তিনটি কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে এই ধারাবাহিক শিখনযাচাই করতে হবে।

আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক শিখনযাচাই

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে (২০১২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থীকে শুধু মেধাবী হলেই হবে না, তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তাকে ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করতে হবে। ধারাবাহিক যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ যাচাই করা হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এগুলো হলো– দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও ভ্রমণ, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউট, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হলো– নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা।

শিক্ষককে বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এর একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের কৌশল

আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যযাচাই একজন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের ঘটনা বা কার্যাবলি কীভাবে গ্রহণ করে, কীভাবে সাড়া দেয়, সাড়াদান বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এবং ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিরূপণে বা পরিমাপে সমর্থ। শিক্ষার্থীর আচরণিক উদ্দেশ্যের কী পরিবর্তন হলো, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা বাস্তবায়ন হলো, শিক্ষার্থীর পাঠের কতটা অগ্রগতি হলো ইত্যাদি যাচাই করার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। মূলত এটাই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখনযাচাই। শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের জন্য দুইভাগে ভাগ করে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা :

(ক) আচরণ ও মূল্যবোধ এবং

(খ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি।

আচরণ ও মূল্যবোধ

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসে। পাশাপাশি তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সাধিত হয়। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত নানা ধরনের কাজ করতে হয়। সবাইকে আন্তরিকতার সাথে গৃহীত কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। মোট কথা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গুণাবলি ও মূল্যবোধ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করতে হয়। প্রত্যাশিত মানের মূল্যবোধ অর্জনের জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অর্জনের উপর ফলাবর্তন (Feedback) প্রদান করতে হয়। শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ প্রতি সাময়িকে একবার যাচাই করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি সাময়িকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধের রেকর্ড সংরক্ষণ নির্ধারিত ছক অনুসারে করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধের রেকর্ড সংরক্ষণের ছক

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ যাচাইয়ের মানদণ্ড	নম্বর
শিক্ষার্থী কদাচিৎ প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	১
শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	২
শিক্ষার্থী সব সময় প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	৩

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও ভ্রমণ, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউট, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। এসব কার্যক্রম তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশসহ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এ ছাড়া সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের উপর একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে (শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের প্রতিবেদনে) তা অন্তর্ভুক্ত করবেন।

শিক্ষার্থীদের সাময়িক পরীক্ষার কৃতিত্বের প্রতিবেদন প্রণয়ন

সাময়িক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা কী ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারল তা জানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্যও জরুরি। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিবেচনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতির দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হয়। শিক্ষার্থীর প্রদর্শিত কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে তার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের প্রতিবেদন প্রণয়ন ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম :
শ্রেণি : সপ্তম
ঠিকানা :

বিষয়	পূর্ণ নম্বর	পাশ নম্বর	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা			দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা			সামগ্রিক মূল্যায়ন		
			প্রাপ্ত নম্বর			প্রাপ্ত নম্বর			প্রথম + দ্বিতীয় সাময়িক		
			শ্রেণি অভীক্ষা	চূড়ান্ত	মোট নম্বর	শ্রেণি অভীক্ষা	চূড়ান্ত	মোট নম্বর	মোট নম্বর	শ্রেণিতে অবস্থান	শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য
বাংলা	১৫০										প্রথম সাময়িক পরীক্ষা
ইংরেজি	১৫০										
গণিত	১০০										
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০										
বিজ্ঞান	১০০										
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০										
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০										
শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫০										দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা
কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	৫০										
চারু ও কারুকলা	৫০										
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	১০০										
মোট নম্বর	১০০০										
মোট কর্মদিবস											
উপস্থিত কর্মদিবস											
অভিভাবকের স্বাক্ষর											
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর											

আবেগীয় ক্ষেত্রের বিবেচ্য কাজ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য আসে না। বরং তারা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিখনের আরও ক্ষেত্র যেমন– জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র এবং মনোপেশিজ ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের জন্য আসে। এক কথায় বলা যায়, তারা তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে। আর শিক্ষকরা একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের সার্বিক বিকাশের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শিক্ষার্থীরা মূলত শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিসহ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে। এসব কাজের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠিত হয়। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যেসব কাজের মাধ্যমে তাদের নানা ধরনের গুণাবলির প্রকাশ করতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– অধ্যবসায়, সৃজনশীলতা প্রদর্শন, কাজে নিরাপত্তার রক্ষা, মানসিক সততার প্রকাশ, নিয়মিত উপস্থিতি, বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিবেচনা বা সচেতনতাবোধ, গভীর মনোযোগ প্রদর্শন ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনযাচাই করা সম্ভব।

ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ

শিক্ষক সারা বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ এবং সামাজিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ করবেন। এর জন্য কোনো নম্বর বরাদ্দ থাকবে না। প্রতি সাময়িক শেষে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর নিজের মতামত প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের (আবেগীয় শিখনফল) ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা												প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানুবর্তিতা	দেশপ্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহিষ্ণুতা	সচেতনতা	সময়ানুবর্তিতা		
১													
২													
৩													

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা												প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানুবর্তিতা	দেশপ্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহিষ্ণুতা	সচেতনতা	সময়ানুবর্তিতা		
১													
২													
৩													

নির্দেশনা

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের (আবেগীয় শিখনফল) ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ কীভাবে করতে হবে তার একটি নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে দেওয়া আছে। এর জন্য একটি নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে। ছকে উল্লিখিত ১০টি নির্দেশকের আলোকে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন বা যাচাই করতে হবে। আচরণ ও মূল্যবোধের ধারাবাহিক যাচাইয়ে একজন শিক্ষার্থীর প্রতিটি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য ৩ (অতি উত্তম) বা ২ (ভালো) বা ১ (অগ্রগতি প্রয়োজন) পেতে পারে। এভাবে ১০টি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩০ এবং সর্বনিম্ন ১০ পেতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্য চার স্তরের নির্দিষ্ট নম্বরের সীমা অনুযায়ী নির্ধারিত পৃথক গ্রেড প্রদান করতে হবে।

নম্বরের সীমা এবং ধারাবাহিক যাচাইয়ের গ্রেড

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আচরণ ও মূল্যবোধের উপর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক পৃথকভাবে ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আচরণ ও মূল্যবোধের উপর ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট নির্দেশক রয়েছে। এসব নির্দেশকের প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ৩ নম্বর করে সর্বমোট ৩০ নম্বর নির্ধারিত রয়েছে। এই ৩০ নম্বরকে মোট চারটি সীমায় বিভাজন করে পৃথক পৃথক চারটি গ্রেডে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোকে ধারাবাহিক যাচাইয়ের গ্রেড বলা হয়। যেমন– ২৬ থেকে ৩০ নম্বরের সীমাকে 'অতি উত্তম' গ্রেড, ২১ থেকে ২৫ নম্বরকে 'উত্তম' গ্রেড, ১৬ থেকে ২০ নম্বরকে 'ভালো' গ্রেড এবং ১০ থেকে ১৫ নম্বরকে 'অগ্রগতি প্রয়োজন' গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্ধারিত নম্বরের এই বিভাজনকে চার স্তরের গ্রেড বলা হয়। নম্বরের সীমা এবং নির্ধারিত গ্রেড নিম্নরূপ–

নম্বরের সীমা ও নির্ধারিত গ্রেড

নম্বরের সীমা	ধারাবাহিক যাচাইয়ের গ্রেড
২৬-৩০	অতি উত্তম
২১-২৫	উত্তম
১৬-২০	ভালো
১০-১৫	অগ্রগতি প্রয়োজন

ধারাবাহিক শিখনযাচাই করার জন্য লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। এই রেকর্ডের ভিত্তিতে তাদের শিখনের উপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নকালে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের ভালো দিকগুলো লিখে রাখতে হবে এবং কোনো্ কোনো্ ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিক যাচাই করাকালে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি এর একটি রেকর্ড নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

জ্ঞানের ক্ষেত্র অনুযায়ী শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য এখানে যেসব দিকের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মেনে চলতে হবে। এছাড়া শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণের যেসব নির্দেশনার উল্লেখ রয়েছে সেগুলোও সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। তাহলে কোনো শিক্ষার্থী সম্পর্কে তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সহজ হবে। তবে চূড়ান্ত প্রতিবেদন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে সেটি একনজর দেখেই শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি এবং তার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন, বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাত্রা নিরূপণ, সহপাঠীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ ইত্যাদি দিকগুলোও তাদের মধ্যে বিকাশের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) ধারাবাহিক শিখনযাচাই বলতে কী বোঝায়?
(খ) ধারাবাহিক শিখনযাচাই কত প্রকার ও কী কী?

২. (ক) ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
(খ) শিক্ষার্থীর শিখনে ধারাবাহিক শিখনযাচাই কীভাবে সহায়তা করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. (ক) শ্রেণি অভীক্ষা কী?
(খ) শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ পরিচালনার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

২. (ক) বেঞ্জামিন ব্লুম প্রদত্ত শিখনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রগুলোকে যেসব ভাগে ভাগ করেছেন সেগুলোর বিবরণ দিন।
(খ) আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়ন-কৌশল বর্ণনা করুন।

৩. (ক) ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্কের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলোর বিবরণ দিন।
(খ) কোনো শিক্ষার্থীর যেসব আচরণ ও মূল্যবোধের উপর ধারাবাহিক শিখন যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হয় তা নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে তুলে ধরুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩–৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন ও শিখনযাচাই (ফেব্রুয়ারি ২০১৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩–৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

ইউনিট ৯ : প্রতিফলন অনুশীলন

ইউনিটের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৯.১: প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

৯.২: প্রতিফলন শিখন চক্র

৯.৩: প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ

৯.৪: প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী: শিক্ষক ডায়েরি, শিখন জার্নাল, সতীর্থ জার্নাল এবং প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা প্রণয়ন

৯.৫: প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগে সমস্যা ও উত্তরণের উপায়।

ইউনিট ৯ : প্রতিফলন অনুশীলন

গ্রিক দার্শনিক Socrates বলেছিলেন, Know thyself অর্থাৎ নিজেকে জানো। ইংরেজিতে একটি উক্তি আছে– Self criticism is the best criticism. ফরাসি দার্শনিক Anatole France বলেছেন, æThe good critic is he who narrates the adventure of his soul among masterpieces.”। এসব উক্তির মূল কথা হলো, নিজের কাজের সমালোচনা নিজে নিজেই করা। অর্থাৎ আত্মসমালোচনাই উত্তম সমালোচনা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, যে ব্যক্তি তার নিজের কার্যাবলি সম্পর্কে নিজেই সমালোচনা বা মূল্যায়ন করতে পারেন সেটাই উত্তম সমালোচনা বা সবচেয়ে ভালো মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার নিজের ভেতরের দোষক্রটি বা সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করে নিজেই সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নিতে পারেন। এটাই এক ধরনের আত্মসমালোচনা বা আত্মমূল্যায়ন। এই আত্মসমালোচনাকে অন্য কথায় আত্মপ্রতিফলন বলা যেতে পারে। আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে নিজের কাজকর্মের গুণগত মানের উন্নয়ন করতে হলে নিয়মিত এগুলোর অনুশীলন করতে হবে।

শিক্ষকতার মতো একটি জটিল পেশায় সফলতা লাভ করতে হলে শিক্ষককে সব সময় ভালো শিক্ষকের যাবতীয় গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। তবে শুধু ভালো গুণাবলি অর্জন করলেই হবে না, এগুলো প্রয়োগ করার আন্তরিক ইচ্ছাও শিক্ষকের ভেতর থাকতে হবে। ভালো শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম উপায় হলো, প্রতিফলন অনুশীলন করা। কার্যকর প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে যে কোনো শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় অপরিহার্য গুণাবলি ও কলা-কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারেন। এসব দিক বিবেচনা করে এ ইউনিটে প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে–

৯.১: প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

৯.২: প্রতিফলন শিখন চক্র

৯.৩: প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ

৯.৪: প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী : শিক্ষক ডায়েরি, শিখন জার্নাল, সতীর্থ জার্নাল এবং প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা প্রণয়ন

৯.৫: প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগে সমস্যা ও উত্তরণের উপায়।

৯.১ : প্রতিফলন অনুশীলর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণা

প্রতিফলন অনুশীলন এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষক অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজের পেশার ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। এক কথায়, পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজেই নিজের কাজকর্মের ভুলক্রটি চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নিতে পারেন। এর মাধ্যমে নিজের পেশাগত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পূর্বে এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়াকালীন উভয় পর্যায়ে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকে পেশাগত মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষককে দক্ষ শিক্ষকে পরিণত করতে পারে। তবে পেশাগত উন্নয়নের স্বার্থেই এর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়নে নিজ উদ্যোগে সব শিক্ষকই সব সময় কিছু না কিছু করে থাকেন। যেমন– শিক্ষকরা একটি শ্রেণিতে পাঠদান করার সময় এবং পাঠদান শেষ করার পর ওই ক্লাসের উপর পর্যালোচনা করে থাকেন। এই পর্যালোচনা বা আত্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো, পাঠদানে যেসব ভুলক্রটি হয়েছে সেগুলো দূর করে পরবর্তী পাঠদান আরও ক্রটিহীন করা। শিক্ষকদের এই আত্মমূল্যায়নে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে পেশাগত উন্নয়ন যথাযথ ও মানসম্মত হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আত্মমূল্যায়ন করা হলে তাকে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন বলা হয়। প্রতিফলনমূলক অনুশীলন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার পাঠদানে কার্যক্রমে অনুসৃত পদ্ধতি ও কলা-কৌশল এবং পাঠদানের অভিজ্ঞতাকে ক্রটিমুক্ত করার জন্য নানাভাবে আলোচনা ও মূল্যায়ন করে থাকেন। এভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়। এটাও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের ফলে হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে প্রতিফলন অনুশীলন বলতে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের শিক্ষকতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিয়ত তার নিজের পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলো পরিহার করে প্রয়োজনীয় সবল দিকগুলো অর্জন করেন। এভাবে

এক সময় শুধু ভালো দিকগুলোই নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। তবে এ প্রক্রিয়ায় অন্য ভালো শিক্ষকদের পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের ইতিবাচক দিকগুলো নিজে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবেন এবং ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবেন।

সুতরাং প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে বলা যায়, যে অনুশীলনের মাধ্যমে কোনো শিক্ষক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজের অথবা অন্য শিক্ষকের ভালো দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো নিজের মধ্যে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করে নিজেকে ভালো বা দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন তাকে প্রতিফলন অনুশীলন (Reflective Practice) বলা হয়। প্রতিফলনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'reflection.' এটি ল্যাটিন শব্দ 'reflectere' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, 'to bend back'. প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন ডোন্যাল্ড অ্যালান শন। এরপর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়ে আসছে।

আমেরিকার শিক্ষা দার্শনিক **ডোন্যাল্ড অ্যালান শন** (Donald Alan Schön) ১৯৩০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে (Boston, Massachusetts) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একই শহরে মৃত্যুবরণ করেন। দার্শনিক ডোন্যাল্ড শন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে Urban Planning-এর অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি প্রতিফলন অনুশীলনের (Reflective Practice) ধারণার উন্নয়ন করেন এবং সাংগঠনিক শিখন তত্ত্বে (The theory of Organizational learning) তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

Donald Alan Schön

ডোন্যাল্ড শন নিরলস গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর এমন একটি বই হলো The reflective practitioner: how professionals think in action (1983)." এই বইয়ে তিনি প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে বলেছেন, æReflective practice is the ability to reflect on one's actions so as to engage in a process of continous learning. অর্থাৎ প্রতিফলনমূলক অনুশীলন হলো ব্যক্তির কর্মের উপর প্রতিফলন করার এমন এক ক্ষমতা যা ক্রমাগত শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। Schön এর মতে, 'প্রতিফলন অনুশীলন হলো প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সমালোচনা ও প্রতিফলন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার উপায়।' প্রতিফলন অনুশীলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Donald Schön বলেন, æReflective practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline (Schön, 1996)."

Donald Schön প্রতিফলন অনুশীলনকে কোনো বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষকদের মধ্যকার অনুশীলন কাজের তুলনাকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রতিফলন অনুশীলন বলতে একজন প্রশিক্ষকের সহায়তায় কারও জ্ঞানের প্রয়োগে চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে বোঝায়।' তার এই ধারণার প্রসারের পর এর উপর ভিত্তি করে অনেক স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদের পেশা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন শুরু করে। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, Schön-এর ধারণা John Dewey-র দর্শনের সাথে সম্মিলিতভাবে প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে আরও বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে।

আমেরিকার আরেক বিখ্যাত শিক্ষা দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষা সংস্কারক **জন ডিউই** (John Dewey) ১৮৫৯ সালের ২০ অক্টোবর ভারমন্টের বার্লিংটনে (Burlington, Vermont) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫২ সালের ১ জুন নিউইয়র্ক সিটিতে (New York City) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিক্ষা বিষয়ের উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। John Dewey প্রতিফলন অনুশীলন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা করেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে ডিউইর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো, æEducation is not preparation for life; education is life itself."

প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে John Dewey বলেন, æReflection is a cognitive process- the active, persistent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds, that support it and the furtherconclusions to which it tends (1933).” তিনি প্রতিফলন অনুশীলনের তিনটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো–

১. খোলা মন (Open-mindedness)
২. সর্বান্তকরণে গ্রহণ (Whole-heartedness) এবং
৩. দায়িত্বশীলতা (Responsibility)।

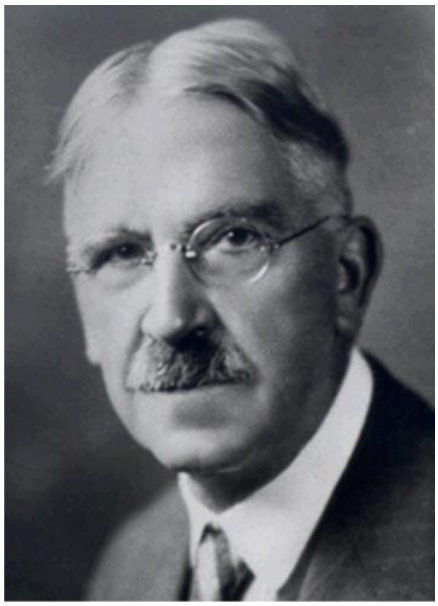

John Dewey

Dewey খোলা মন বলতে কোনো সমস্যার সমাধানে পূর্বধারণা ও চিন্তা থেকে বের হয়ে নতুন নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন উপায় খোঁজা এবং সক্রিয় শ্রোতা হিসেবে অন্যের বক্তব্য বিবেচনার জন্য গ্রহণ করাকে বুঝিয়েছেন। এছাড়া কোনো সমস্যার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে এবং যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে উপযুক্ত সমাধান সর্বান্তকরণে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রতিফলন অনুশীলনের একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু, তিনি দায়িত্বশীলতাকে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে এটিকে ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ কারণে প্রতিফলন অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অনুশীলনকারীকে খোলা মন নিয়ে নতুন ধারণা অর্জনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

Boud, Keogh and Walker (1985)-এর মতে, æReflection is an important human activity in which people recapture their experience, think about it, mull it over and evaluate it. It is this working with experience that is important in learning. The capacity to reflect is developed to different stages in different people and it may be this ability ehich characterizes those who learn effectively from experience.”

Donald Alan Schön তার বইয়ে প্রতিফলন অনুশীলনের বর্ণনা করতে গিয়ে দুই ধরনের প্রতিফলনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো Reflection-on-action (কর্মের উপর প্রতিফলন) এবং অন্যটি হলো Reflection-in-action (কর্মে প্রতিফলন)। পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের প্রতিফলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্মের উপর প্রতিফলন (Reflection-on-action)

Donald Schön এর মতে, ব্যক্তি কোনো কাজ শেষ করার পর অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটার পর যখন এর প্রতিফলন বা আত্মসমালোচনা করেন তখন এটাকে কর্মের উপর প্রতিফলন (Reflection-on-action) বলা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাজটি শেষ করার পর কাজের ভালোমন্দ বা দুর্বল দিকগুলো অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে পরবর্তী কাজের উপর যথাসম্ভব একটি ত্রুটিহীন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি যে কাজটি সম্পন্ন করেছেন তার উপর একটি সমালোচনামূলক চিন্তন সম্পন্ন করেন এবং প্রাপ্ত দুর্বল দিকগুলোর যাতে পরবর্তীকালে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকটি নিশ্চিত করেন।

কর্মের উপর প্রতিফলন ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করে তখন একই সাথে তার কাজের গুণগত মানের ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হয়। এক কথায়, কর্মের উপর প্রতিফলন বলতে কোনো বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করার পর তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ এবং তার কার্যকারিতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে নিজের মনে প্রতিফলন ঘটানো বা ফলাবর্তন প্রদান করাকে বোঝায়। এটি John Dewey-র Notion of Reflection-এর অনুরূপ।

কর্মের উপর প্রতিফলন সম্পর্কে Russel and Munby বলেন, æReflection on action is understood through phrases like thinking on your feet, keeping your wits about you, and learning by doing [and] suggest not only that we can think about doing but that we can think about doing something while doing it.”

অন্যদিকে Donald Schön বলেন, æReflection on action (after you have done something), similar to Dewey’s notion of reflection, is the basis of much literature that is related to reflective teaching and reflective teacher education (1983).”

কর্মের উপর প্রতিফলন সম্পর্কে এক কথায় বলা যেতে পারে যে, কোনো শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চিহ্নিত সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও এর বিশ্লেষণ করে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং শিখন-শেখানোর উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়। কর্মের উপর প্রতিফলন ঘটিয়ে অনুশীলনকারী তার নিজস্ব দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। এটাই হলো কর্মের উপর প্রতিফলন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো শিক্ষক তার পাঠদানের পর শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অবসর সময়ে নিজের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারেন। তিনি নিজে চিন্তা করে পাঠদানকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নিজের মনের মধ্যে প্রতিফলন ঘটাতে পারেন এবং তার পাঠদানের কোন্ কোন্ দিক দুর্বল ছিল এবং কীভাবে সেগুলোর উন্নয়ন ঘটানো যায় তার একটি কার্যকর উপায় নিজেই বের করতে পারেন। এছাড়া এ দিকটি নিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাথে মতবিনিময়ও করতে পারেন। এর মাধ্যমে নিজের পাঠদানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। ব্যক্তি যখন এ ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তখন এটাকে কর্মের উপর প্রতিফলন বলা হয়।

কর্মে প্রতিফলন (Reflection-in-action)

প্রতিফলন অনুশীলন মূলত নিজের কাজকর্মের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানের একটি কৌশলমাত্র। যে কোনো পেশাজীবী যখন তার পেশায় কোনো সমস্যার মুখোমুখি হন তখন তিনি সেগুলো নিজের পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন। তিনি নানা রকম সম্ভাব্য সমাধানের উপায় প্রয়োগ করেন। তিনি 'জানা' (knowing) এবং 'করা' (doing)-র মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। Donald Schön এটাকে কর্মে প্রতিফলন (Reflection-in-action) বলেছেন।

Schön বলেন, æReflection in action (while doing something) is understood such phrases as thinking on your feet and keeping your wits about you which suggest that 'not only can we think about doing but that we can think about doing something whilst doing it. Some of the most interesting examples of this process occur in the midst of performance' (1983)."

Schön-এর মতে, পেশাজীবীর এ ধরনের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তার কোনো কাজে প্রয়োগের ফলে শিখনকে কার্যকর করে তোলা যায় এবং এভাবেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়। এর প্রভাবে ভবিষ্যতে সমস্যার ত্রুটিহীন সমাধান করা যায়। এ জন্য শিক্ষকতা পেশায় প্রতিফলনমূলক অনুশীলন অত্যন্ত জরুরি।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত যে কোনো তত্ত্বীয় বা তথ্যগত জ্ঞান বা অর্জিত ধারণাকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাকে কর্মে প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিফলন অনুশীলনকারী তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সকল জ্ঞান বা শিখন লাভ করেছে তাকে বাস্তব পরিস্থিতিতে শিখন-শেখানো কার্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করার প্রক্রিয়াই হলো কর্মে প্রতিফলন।

কর্মের উপর প্রতিফলন এবং কর্মে প্রতিফলন দুটি পর্যায়ই ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে ব্যবহৃত হয় এবং একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। উভয় প্রকার প্রতিফলনই হচ্ছে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষকসহ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলনের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেমন উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, তেমনি শিক্ষকরাও নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের যারা প্রশিক্ষণ দেন অর্থাৎ শিক্ষক প্রশিক্ষকরাও তাদের প্রশিক্ষণের গুণগত মানের উন্নয়ন করার সুযোগ লাভ করেন।

প্রতিফলন অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে হবে। ভালো শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তার সহায়তা নিলে নিজের দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করা সহজ হয়। প্রতিফলনের জন্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিফলন অনুশীলনের কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ–

- কার্যত প্রতিফলন অনুশীলন এক ধরনের চিন্তন এবং এই চিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার ফলাফলকে কাজে পরিণতকরণ।
- প্রতিফলন অনুশীলন মূলত শিখনের একটি উপায় এবং এটি পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে।
- এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ এর সঠিক ও বাস্তবসম্মত চর্চার মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয় কিংবা ব্যক্তির মধ্যে কার্য সম্পাদনের দক্ষতা তৈরি হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য চর্চা বা নিয়মিত অভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন সম্ভব হয়।
- বাস্তবে প্রতিফলন অনুশীলন হলো নিজের চিন্তাভাবনা ও কর্ম সম্পর্কে সুগঠিত, সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন করা।
- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সুচিন্তার সংগঠন হয়। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যক্তির অধিক সচেতন থাকার কারণে সম্পাদিত কর্মের গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকে।

- প্রতিফলন অনুশীলনের সঠিক ও কার্যকর চর্চার জন্য ইতিবাচক এবং অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য কাজের খুঁটিনাটি বিষয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
- এটি একান্তভাবেই ব্যক্তির আত্মসমালোচনামূলক এবং আত্মশুদ্ধিমূলক একটি প্রচেষ্টা মাত্র।
- প্রতিফলন অনুশীলনের কার্যকর চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন নতুন সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলন কোনো ধারণা বা বিষয়বস্তুর তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়। এর মাধ্যমে তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।
- এটি অন্যের ভালো দিকগুলো আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।
- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

John Dewey (1933) প্রতিফলন অনুশীলনকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এগুলোকেও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যথা :

১. পরামর্শ (Suggestion)
২. সমস্যা (Problem)
৩. অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)
৪. যুক্তি স্থাপন (Reasoning)
৫. পরীক্ষণ (Testing)।

John Dewey-র মতে, প্রতিফলন অনুশীলনের এ পর্যায়গুলো সম্পাদনে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই; প্রতিফলন অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে কোনোটি যে কোনো সময় ঘটতে পারে। তিনি তার বিখ্যাত How We Think বইয়ে প্রতিফলন অনুশীলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে, æReflective thinking, in distinction from other operations to which we apply the name of thought, involves (1) a state of doubt, hesitation, perplexity, mental difficulty, in which thinking originates, and (2) an act of searching, hunting, inquiring to find material that will resolve the doubt, settle and dispose of the perplexity."

প্রতিফলন হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোনো পেশাজীবী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তার পেশার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী চিন্তনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করে।

পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যে যে পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই পেশাগত উন্নয়ন ঘটানো খুব জরুরি। কেউই একদিনে তার পেশায় সফলতা লাভ করতে পারেন না। প্রতিটি সফল পেশার পেছনে রয়েছে দৃঢ় মনোবল এবং ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। যে কোনো পেশার সফল ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড বা তাদের সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা সবাই নিজ নিজ পেশায় সফলতা লাভ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন। অনেকেই একই পেশায় সফল অন্য ব্যক্তিদের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো নিজের পেশায় প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই সফল ব্যক্তিরা তাদের পেশায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, কোনো পেশায়ই একদিনে সফলতা অর্জন করা যায় না। আবার কোনো পেশাকে নিখুঁত ও কার্যকর করে তুলতে হলে নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন অনেক জরুরি। অর্থাৎ প্রতিটি পেশায় প্রতিফলন অনুশীলন সব পেশাজীবীর জন্যই দরকার। এখানে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো–

১. **ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন :** প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে। এর নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে নিজের দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করা যায় এবং চিহ্নিত দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। এভাবে একদিকে যেমন ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে, অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।
২. **সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন :** শিক্ষকতা একটি অন্যতম মহৎ পেশা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতিকে শিক্ষিত গড়ে তোলা যায়, অন্যদিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং ধারাবাহিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় এবং পেশার সাথে সেবার একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়।
৩. **পেশার গুণগত উন্নয়ন :** প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের কাজকর্মের ত্রুটিগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং চিহ্নিত দুর্বল দিকগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয় বলে পেশার গুণগত উন্নয়ন ঘটে এবং এর ফলে উন্নত সেবাদান সম্ভব হয়।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি :** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা নির্ভর করে এর কর্মীদের উপর। অর্থৎ কোনো প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি নির্দিষ্ট কাজকর্মের জন্য নিয়োজিত থাকেন তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামের উপর প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সুনাম নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি দক্ষ হন তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ব্যক্তিগত সফলতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫. **কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন :** ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্ভব হয় বলে প্রতিফলন অনুশীলন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। কারণ ব্যক্তি তার দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এমন কোনো কৌশল নেই যার মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নয়ন ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে ভালো, উন্নত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। এর জন্য দরকার ব্যক্তির নিয়মিত প্রতিফলনমূলক অনুশীলন।

৬. **নতুন ধারণা লাভ :** প্রতিফলন অনুশীলন মানেই হলো আত্মোন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি একদিকে যেমন নিজের কাজকর্মের উপর প্রতিফলন ঘটিয়ে এসবের উন্নয়ন করতে পারেন, অন্যদিকে অন্যের কাজের ভালো দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিজের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন। এই প্রতিফলনের মাধ্যমে সব সময় নতুন নতুন ধারণার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি এর মাধ্যমে নতুন ধারণা লাভ করতে পারেন এবং ধারাবাহিকভাবে নিজের পেশার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

৭. **ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ সাধন :** একদিনে নিজের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয় না। সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হলেও ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত অনুশীলন ও চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। অন্যের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলেও অনেক সময় নতুন ধারণা লাভ সম্ভব হয়। ফলে ব্যক্তি তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এক কথায় বলা চলে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরে ধীরে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাত সক্ষম হয়।

৮. **আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি :** ব্যক্তি যদি নিয়মিত তার কাজকর্মের গুণগত মান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং এর দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালান তাহলে একদিকে যেমন কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে ধীরে ধীরে কার্য সম্পাদনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। এর ফলে ব্যক্তি এক সময় সার্থকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হবে।

৯. **পেশাগত জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক :** শিক্ষকতা একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এ পেশায় সফলতা লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরে আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। এ পেশায় পেশাগত জ্ঞানের সাথে আত্মবিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণভাবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের কাছে এই পেশাকে খুব সহজ মনে হলেও বাস্তবে এমন ধারণা সঠিক নয়। এ পেশায় যে কোনো ব্যর্থতা শিক্ষকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদেরও চরমভাবে হতাশ করে তুলতে পারে। এ কারণে আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। মনে রাখতে হবে, পেশাগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। এর জন্য প্রতিফলন অনুশীলন জরুরি।

১০. **সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন :** যে কোনো পেশায় সফলতা লাভ করতে হলে নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। নিয়মিত চর্চা বা অনুশীলন ব্যক্তির কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটায় এবং তার প্রতিভারও বিকাশ সাধন করে। কার ভেতরে কী প্রতিভা রয়েছে তা বুঝতে হলে দরকার কার্য সম্পাদন করা। কাজের মাধ্যমেই মানুষ তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যায়। এ জন্য কাজকর্মের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব, অন্যদিকে প্রতিভার বিকাশ সাধনও সম্ভব প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাজীবীদের পক্ষে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও সুপ্ত জ্ঞানের চর্চা করা সহজ হয়। এ উদ্দেশ্যেও প্রতিফলন অনুশীলন অব্যাহত রাখা দরকার।

১১. **পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ :** প্রতিফলন অনুশীলনই নিজের সম্পর্কে একটি চিত্র প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের কাজকর্মের উপর একটি বাস্তব ধারণা দিতে পারে। অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুধাবন করতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পেশাজীবীকে তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে। এ কারণে প্রতিফলন অনুশীলন করা প্রয়োজন।

১২. **দায়িত্ব সচেতন হওয়া :** নিজের কাজকর্মের উপর কোনো সমালোচনা বা কাজের গুণগত মান নিয়ে কোনো চিন্তভাবনা না করলে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো সচেতনতা তৈরি হয় না। যদি কাজকর্মের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা থাকে এবং যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হলো কিনা তা জানার কোনো কর্তৃপক্ষ থাকে তাহলে ব্যক্তি তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও অধিক সচেতন হয়। শিক্ষকতা পেশায়ও এটি খুব জরুরি। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষকদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে যেসব দিকের আলোচনা করা হয়েছে এগুলো ছাড়াও আরও নানা ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যের ভালো দিকগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিফলনের অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের সহপাঠীদের ভালো আচরণ, সুঅভ্যাস, শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ ইত্যাদি দিকগুলো দেখে নিজের মধ্যে সেসব প্রতিফলনে সচেষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের জন্য জরুরি। কারণ একদিকে শিক্ষক যেমন প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে অন্যের ভালো দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবেন, তেমনি তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যাতে প্রতিফলন অনুশীলনের অভ্যাস গঠিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯.২ : প্রতিফলন শিখন চক্র

মানবসমাজে যত ধরনের পেশা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে শিক্ষকতা একটি অন্যতম জটিল ও কঠিন পেশা। সমাজে প্রচলিত অন্যান্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার তুলনা চলে না। কারণ পেশাগত কারণেই এ পেশাটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিক্ষকরা সব সময় মানবীয় উপাদান নিয়ে কাজ করেন। দেশ ও জাতি গঠনের কঠিন দায়িত্বে তারা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানসহ শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষককে সম্ভব সব রকমের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। এ জন্য শিক্ষকের থাকতে হয় উন্নত প্রশিক্ষণ। কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় রাখা যায় এবং কীভাবে পড়ালেখায় তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায় সেসব দিক নিয়ে শিক্ষককে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এ কারণে শিক্ষককে প্রতিনিয়ত ভালো ও উন্নত পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রেণিতে উন্নত পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার আধুনিক কলা-কৌশল আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক নিজ পেশায় সফল হতে পারেন। কিন্তু এর পরও শিক্ষককে অন্য ভালো শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যে শিক্ষক ভালো এবং শিক্ষকতা পেশায় যিনি দক্ষ তার পাঠদান কার্যক্রমসহ অন্যান্য কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ ও উন্নত শিক্ষকে পরিণত করা যায়। তবে শিক্ষকতা পেশায় সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের নিজের প্রচেষ্টার উপর। শিক্ষক নিজে যদি আন্তরিক হন এবং নিজের পেশা সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন তাহলে তিনি ভালো শিক্ষকে পরিণত হতে পারবেন।

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন, কার্যকর পাঠদানের জন্য পদ্ধতিসম্মতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ, পাঠদানের পূর্বে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিতে পাঠদান করা যে কোনো শিক্ষকের অপরিহার্য দায়িত্ব। এমনকি ভালো শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা, নিজের কাজকর্মের স্বমূল্যায়ন করা ইত্যাদি দিকগুলোও শিক্ষককে ভালো শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। একটি ভালো অভ্যাস শনাক্ত করার পর নিয়মিত অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তা আয়ত্ত করা বা দক্ষতা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিখন দক্ষতা শনাক্ত করা, সেটি অর্জনের জন্য অনুশীলন করা, ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করা এবং এর একটি নতুন অভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। এটিকে প্রতিফলন শিখন চক্র বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিফলনের মাধ্যমে শিখনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে একটি চক্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এটাকেই প্রতিফলন শিখন চক্র বা Reflective Learning Cycle বলা হয়।

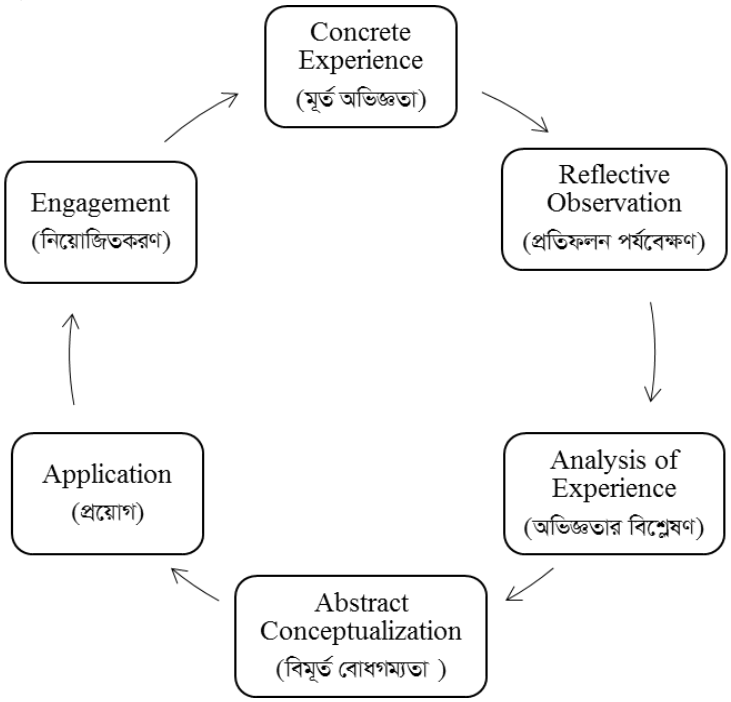

চিত্র : প্রতিফলন শিখন চক্র

প্রতিফলন শিখন চক্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যক্তিকে তার পেশাগত উন্নয়নে কোনো বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত সব পেশাধারীকেই কোনো না কোনো সময় পেশা সংশ্লিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। হাতে-কলমে কাজ না করে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকে বলা হয় তাত্ত্বিক জ্ঞান। আর তাত্ত্বিক জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তির পেশার কার্যকর ও ঈপ্সিত উন্নয়ন ঘটে না। তাত্ত্বিক জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তি হয়তো পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ধারণা বা অনুসন্ধান পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে পেশার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা

করতে হবে। যেমন– কেউ যদি শিক্ষক হতে চান তাহলে তাকে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পূর্বে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে কীভাবে পাঠদান করতে হবে, শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের কীভাবে সক্রিয় রাখতে হবে এবং কীভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞানের যাচাই করা যাবে অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা এসব দিক নিয়ে হাতে-কলমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তাহলে শিক্ষক হতে আগ্রহী ব্যক্তি তার পেশায় সফল হবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। একইভাবে শিক্ষককে তার অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিফলন অনুশীলন করতে হয়। এটা সম্ভব হয় প্রতিফলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। অর্থাৎ ব্যক্তি অন্যের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করে যেসব নতুন নতুন ধারণা অর্জন করে সেগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলন করার প্রচেষ্টাই হলো প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ।

কোনো ব্যক্তি যখন প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করেন তখন যে ঘটনা বা বিষয়বস্তুর উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেন তখন সেই ঘটনা কেন ঘটেছিল এবং এর সঙ্গে ওই ব্যক্তির পূর্বের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক কী তাকে এটা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতার একটি সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতার একটি ছাপ নিজের মধ্যে ধারণ করেন। এভাবেই ব্যক্তি কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ধারণা অর্জনের চেষ্টা করেন। তবে ব্যক্তি নতুন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ভবিষ্যতে তার কোনো্ কোনো্ দিক বা কতটুকু নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করা সম্ভব সে বিষয়েও ব্যক্তিকে সচেতন থাকতে হয়। এটা হতে পারে অর্জিত অভিজ্ঞতার কার্যকর অনুশীলনের মাধ্যমে। অর্জিত অভিজ্ঞতার কার্যকর অনুশীলন করা তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যক্তি নতুন পরিবেশের সাথে এর একটি অনুবন্ধ (Co-relation) বা সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন। এটা তার পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও সম্ভব হতে পারে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবর্তিত পরিবেশে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন সেগুলোর কার্যকর সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন।

আমেরিকার বিশিষ্ট শিক্ষা দার্শনিক David Kolb ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞতামূলক শিখন (experiential learning), ব্যক্তিক এবং সামাজিক পরিবর্তন (individual and social change), পেশা বা বৃত্তিমূলক উন্নয়ন (career development) শিক্ষা সম্বন্ধে তার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। তিনি এসবের উপর বহু গবেষণা করেছেন। অভিজ্ঞতামূলক প্রতিফলন শিখন চক্র তার এমন একটি উদ্ভাবন। David Kolb চার স্তরবিশিষ্ট যে অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র (learning cycle) উদ্ভাবন করেছেন সেটি নিম্নরূপ–

(THE KOLB LEARNING CYCLE)

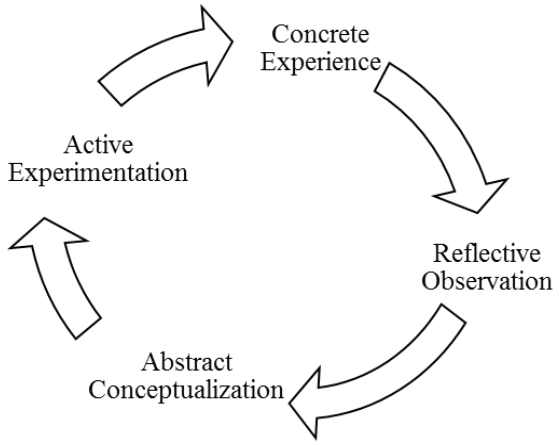

চিত্র : David Kolb এর অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র

David Kolb এর অভিজ্ঞতামূলক প্রতিফলন শিখন চক্রের বিভিন্ন স্তর নিয়ে নিচে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো–

মূর্ত অভিজ্ঞতা (Concrete Experience)

বাস্তব অভিজ্ঞতার স্তর দিয়ে David Kolb এর অভিজ্ঞতামূলক প্রতিফলন শিখন চক্রটি সূচিত হয়েছে। এই প্রতিফলন শিখন চক্রের প্রথম ধাপে কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজের সম্পাদিত কর্মের মূল্যায়নের মাধ্যমে অথবা অন্যের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করে সচেতনভাবে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আচরণ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, প্রক্রিয়া অথবা অন্য কোনো তথ্যকে বর্ণনা করেন যা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। David Kolb এর মডেল অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি শুধু কোনো কিছু দেখে এবং পড়ে শিখতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তি ওই কাজটি সঠিকভাবে করেন। অর্থাৎ কার্যকরভাবে কোনো কিছু শিখতে

হলে ব্যক্তিকে তা অবশ্যই সেটা করতে হবে। এ পর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং এর কার্যকর মূল্যায়ন করে কর্ম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ বা মূর্ত ধারণা অর্জন সম্ভব হয়। এটাকেই David Kolb মূর্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation)

David Kolb প্রদত্ত অভিজ্ঞতামূলক শিখন মডেলের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ। এই ধাপে ব্যক্তি তার সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে মনের পর্দায় প্রতিফলন ঘটান বা ওই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত চিন্তা বা অনুভূতির সাথে অন্যের চিন্তা বা অনুভূতির তুলনা করে ঐ তথ্য বা আচরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। এভাবে ব্যক্তি তার শিখন সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এটা প্রতিফলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এ স্তরে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে 'শব্দভাণ্ডার' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কারণে যে অন্যের সাথে মতবিনিময় বা তথ্যের আদান-প্রদান অথবা কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হলে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যেও প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

বিমূর্ত বোধগম্যতা (Abstract Conceptualization)

David Kolb-এর মডেলের তৃতীয় ধাপে রয়েছে ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ এবং ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ কী ঘটেছে এর প্রতিফলন এবং ব্যক্তি কী জানে এ দুয়ের মধ্যে একটি কার্যকর সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই বিমূর্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। প্রতিফলন শিখনের এই ধাপে ব্যক্তি তার পর্যবেক্ষণকৃত অভিজ্ঞতাকে তার মূল অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য যে কোনো স্থান থেকে পূর্বে শেখা অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতার একটি কার্যকর সম্পর্ক বা অনুবন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে এই অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি প্রতিচ্ছবি বা রূপ নিজের মস্তিষ্কে ধারণ করেন। এভাবেই কোনো বিষয়ে একটি বিমূর্ত ধারণা অর্জন সম্ভব হয়।

সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation)

David Kolb এর অভিজ্ঞতামূলক প্রতিফলন শিখন চক্রের সর্বশেষ এই ধাপে রয়েঝে সক্রিয় পরীক্ষণ। এ পর্যায়ে ব্যক্তি চিন্তা করে অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে পরীক্ষণ চালায় যে তার এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনকে কীভাবে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে কিংবা সম্পৃক্ত করতে পারে কিংবা কীভাবে এই দক্ষতা বা আচরণ আরও উন্নত করা যায়। এটাকেই সক্রিয় পরীক্ষণ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা শিখেছে ভবিষ্যতে সেটার কার্যকর অনুশীলন করা হয়ে থাকে এ স্তরে। ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে যেসব ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলো পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রয়োগ করা হলে তাকে সক্রিয় পরীক্ষণ বোঝায়।

প্রতিফলন শিখনের চক্র দেখে বোঝা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো শিখন অসচেতনভাবে হলেও এভাবেই ব্যক্তি শিখে থাকে। ব্যক্তি যদি ভবিষ্যৎ কর্মের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন না ঘটায় তাহলে ওই অভিজ্ঞতা থেকে তারা কিছুই শিখতে পারবে না। তাই কোনো কাজ করার পূর্বে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে হয়, তা না হলে একই ভুল বারবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন– নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন শিক্ষক পাঠ ব্যাখ্যার সাথে উপকরণ প্রদর্শনের কথা প্রায়ই ভুলে যান কিংবা উপকরণ ব্যবহারের সহিত উন্নত চিন্তন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যদি অপারগ হন তাহলে এই কাজগুলো নিয়ে যদি তিনি ভাবেন অথবা সহকর্মীর সাথে আলাপ করেন এবং তার শেখা পাঠদান পদ্ধতি বা কৌশলের সঙ্গে তার চিন্তা বা অনুভূতিকে সম্পৃক্ত করেন তাহলে তিনি এ সম্পর্কে একটা বিমূর্ত ধারণায় পৌঁছবেন এবং তিনি বুঝবেন পাঠ ব্যাখ্যার সাথে সাথে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করলে বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট ও স্থায়ী হবে এবং পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে তিনি পরবর্তী পাঠে বিষয়গুলো সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি এ কাজটি করতে অভ্যস্ত হবেন। এভাবে শিক্ষক প্রতিদিনের ক্লাসের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠদানের নতুন নতুন পদ্ধতি কলা-কৌশল শিখতে পারেন এবং বাস্তবে তা কাজে লাগিয়ে সার্থকতার সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারেন। এভাবে প্রতিটি পেশাজীবী David Kolb-এর অভিজ্ঞতামূলক প্রতিফলন শিখন চক্রের মাধ্যমে পেশাগত কলাকৌশল অর্জনসহ নতুন নতুন আচরণ শিখে নিজ নিজ পেশায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন।

শিক্ষকতা পেশায় উৎকর্ষ অর্জন অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষকের নিজের প্রচেষ্টার উপর। শিক্ষক যদি তার পেশাগত উন্নয়নে আগ্রহী হন এবং এর জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তাহলে প্রতিফলন শিখন চক্র অনুসরণ করার মাধ্যমে তিনি নিজেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন।

৯.৩ : প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ

প্রত্যেক পেশাধারীকে তার পেশার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পেশাধারীকে তার পেশা সংশ্লিষ্ট অন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির কার্য সম্পাদন কৌশলকে আদর্শ ধরে নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি তার পেশায় সফল হয়েছেন তার কার্য সম্পাদনের গুণগত মানকে আদর্শ ধরা যেতে পারে। এরপর প্রতিফলনে আগ্রহী ব্যক্তি ওই আদর্শকে অনুসরণ করে নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রতিফলন করতে পারেন। এভাবে নিজের পেশাগত উন্নয়ন করা সম্ভব। একইভাবে শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিফলন অনুশীলন করার প্রয়োজন হয়। আর শিক্ষকতা পেশায় প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে ভালো শিক্ষকের ভালো গুণাবলি আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া বা কৌশল।

যে কোনো পেশাধারী তার পেশার উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেশার দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ধীরে ধীরে পেশার গুণগত মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রতিফলন অনুশীলন এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক তার পেশার সার্বিক উন্নয়নে নিজেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। এ লক্ষ্যে শিক্ষককে অবশ্যই সবার আগে তার পেশার প্রতি আন্তরিক হতে হবে এবং যথেষ্ট সচেতনতার সাথে প্রতিফলন অনুশীলন করার চেষ্টা করতে হবে। কীভাবে একজন শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলন করবেন তা জানার জন্য শিক্ষককে প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণ করার কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষকতা পেশার ভালো দিকগুলোর আরও উন্নয়ন করা সম্ভব তা শিক্ষককে দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তাহলে ধরে নেওয়া যাবে যে, শিক্ষক তার পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন। প্রতিফলন অনুশীলনকে বিশ্লেষণ করলে এর যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলোই ব্যক্তির দক্ষতার ধারাবাহিক উন্নয়নে সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রতিফলন অনুশীলনকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমেরিকার শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা গবেষক জন এম. পিটার্স (John M. Peters) প্রতিফলন অনুশীলনকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সংক্ষেপে একে DATA হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখানে ইংরেজি DATA-র প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে আলাদা আলাদা অর্থ বোঝানো হয়েছে। যেমন–

D = Description (বর্ণনা)
A = Analysis (বিশ্লেষণ)
T = Theorize (মতবাদ গঠন)
A = Act (কার্য সম্পাদন)।

নিচে পিটার্সের প্রতিফলন বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিকগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

Description (বর্ণনা)

যে কোনো ঘটনার কোনো না কোনো কার্যকারণ থাকে। কার্যকারণ ছাড়া কোনো ঘটনা এমনি এমনি ঘটে না। প্রতিফলন অনুশীলনও এমন একটি ঘটনা যা কেন ঘটবে তার একটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা বিবরণ অনুশীলনকারীকে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতিফলন অনুশীলন কেন দরকার তার একটি ব্যাখ্যা প্রতিফলনের আগে প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে করতে হবে। কোনো ব্যক্তির প্রশিক্ষণকার্যে যে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করার অভিপ্রায় রয়েছে সে বিষয়ের বা ওই ঈপ্সিত দক্ষতার বর্ণনা করতে হবে এ পর্যায়ে। শিক্ষক কেন তার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে চান বা পরিবর্তন আনতে চান এখানে তার একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। এখানে এই ব্যাখ্যা বা বর্ণনাকে প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্দেশ্য হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। মোট কথা, কেন প্রতিফলন অনুশীলন করা প্রয়োজন তার একটি উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করাকেই সংক্ষেপে বর্ণনা বা Description হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

Analysis (বিশ্লেষণ)

শিক্ষকতা পেশার মতো একটি জটিল পেশা অনুশীলন করাকালে অনুশীলনকারীর নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। অনুশীলনকারী যতটুকু গুণগত মান বজায় রেখে পাঠদান কার্যক্রমটি পরিচালনা করার চেষ্টা করেন বাস্তবে দেখা যায় ততটুকু মান বজায় থাকে না। প্রশ্ন হলো, কেন পাঠদান অনুশীলনে ঈপ্সিত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না কিংবা কেন পাঠদানে নানা রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষণে কেন দক্ষতামূলক ত্রুটি হয় তার অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করেন ও তা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হন। এ জন্য প্রতিফলন অনুশীলনকারী শিক্ষককে তার পেশার উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত ত্রুটিবিচ্যুতি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তাহলে শনাক্তকৃত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান নির্ণয় করা সহজ হবে।

Theorize (মতবাদ গঠন)

শিক্ষক তার শনাক্তকৃত ত্রুটি নিরসনের জন্য বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত বা নিজস্ব চিন্তন থেকে উদ্ভাবিত উপায় অনুযায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং উদ্ভাবিত ওই উপায়টি সফলভাবে কার্যকর হবে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেটাই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণ দক্ষতা বলে ধরে নেওয়া হয়। এর মূল কথা হলো, প্রতিফলন অনুশীলনে যেসব ত্রুটি চিহ্নিত হয় সেগুলো দূর করার জন্য প্রতিফলন অনুশীলনকারী নানা ধরনের পথ খুঁজে বের করতে পারেন। এসব পথ নির্ধারণ করার পর এগুলো দিয়েই একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ এর উপর নির্ভর করে ব্যক্তির পক্ষে একটি সাধারণ মতবাদ গঠন সম্ভব হয় বলে একে মতবাদ গঠনের স্তর বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাপ্রসূতও হতে পারে অথবা অন্যের উদ্ভাবিত সমাধান অনুসরণ করে নতুন পথ শনাক্তকরণও হতে পারে। ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার পথ যেভাবেই উদ্ভাবন করা হোক না কেন তা এক সময় মতবাদ গঠনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে বলে একে মতবাদ গঠন বলা হয়। মতবাদ গঠনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নের পরবর্তী দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হয়।

Act (কার্য সম্পাদন)

প্রতিফলন অনুশীলনকারী যে ধরনের কার্য সম্পাদনই করার চেষ্টা করুক না কেন তার মধ্যে নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। যেমন– শিক্ষক যখন তার শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন তখন বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষককেই উপযুক্ত পথ খুঁজে বের করতে হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক তার উদ্ভাবিত বা প্রাপ্ত নতুন শিক্ষণ দক্ষতা (new teaching skills) কাজে লাগান এবং শিক্ষণের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন। এটাকেই পিটার্স কার্য সম্পাদনের স্তর হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ পর্যায়ে পূর্বে অনুসৃত পদ্ধতি এবং সমর্থনযোগ্য তত্ত্ব বা পদ্ধতির মধ্যে বিরাজমান ঘাটতি বা ত্রুটিসমূহ কমিয়ে আনা হয়। আর এটা বারবার প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও প্রতিফলনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

প্রতিফলন বিশ্লেষণের আরও একটি মডেল রয়েছে। এই মডেলটি উদ্ভাবন করেছেন Linda Lawrence-Wilkes। এ জন্য এটিকে Lawrence-Wilkes 'REFLECT' মডেল (২০১৪) বলা হয়। Lawrence-Wilkes ১৯৪৯ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার উদ্ভাবিত প্রতিফলন বিশ্লেষণের এই মডেলটি নিম্নরূপ–

Lawrence-Wilkes 'REFLECT' মডেল

R	Remember	Look back, review, ensure intense experiences are reviewed 'cold'. (Subjective and objective) [ফিরে দেখা (অর্জিত জ্ঞান/দক্ষতা সম্পর্কিত), পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা নিশ্চিত করা। (বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক)]
E	Experience	What happened? What was important? (Subjective and objective) [কী ঘটেছিল? কী গুরুত্বপূর্ণ? (বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক)]
F	Focus	Who, what, where, etc. Roles, responsibilities, etc. (Mostly objective) [কে, কী, কোথায় ইত্যাদি, দায়িত্ব ও কার্যাবলি ইত্যাদি। (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক)]
L	Learn	Question: why, reasons, perspectives, feelings? Refer to external checks. (Subjective and objective) [প্রশ্ন : কেন, কারণ, প্রেক্ষাপট বা পরিপ্রেক্ষিত, অনুভূতি? বহিস্থঃপরীক্ষণের উল্লেখ করা। (বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক)]
E	Evaluate	Causes, outcomes, strengths, weaknesses, feelings - use metacognition. (Subjective and objective) [কারণ, ফল, সবল দিক, দুর্বল দিক, অনুভূতি- বিমূর্তজ্ঞানের ব্যবহার। (বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক)]
C	Consider	Assess options, need/possibilities for change? Development needs? 'What if?' Scenarios? Refer to external checks (Mostly objective) [যাচাই বিকল্পসমূহ, পরিবর্তনের জন্য চাহিদা/সম্ভাবনা? উন্নয়ন চাহিদা? 'কী যদি?' দৃশ্যকল্প? বহিস্থঃপরীক্ষণের উল্লেখ করা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক)]
T	Trial	Integrate new ideas, experiment, take action, make change. (Repeat cycle) [নতুন ধারণার সমন্বিতকরণ, পরীক্ষণ, ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিবর্তন সাধন। (চক্রের পুনরাবৃত্তি)]

Lawrence-Wilkes প্রতিফলনের যে মডেল উদ্ভাবন করেছেন সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি প্রতিফলনের ইংরেজি প্রতিশব্দ REFLECT-এর প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য সংবলিত একটি করে আলাদা শব্দ তৈরি করেছেন।

যেমন– R দিয়ে Remember, E দিয়ে Experience, F দিয়ে Focus, L দিয়ে Learn, E দিয়ে Evaluate, C দিয়ে Consider এবং T দিয়ে Trial শব্দ তৈরি করেছেন। এরপর তিনি প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এসব শব্দের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে প্রতিফলনের স্বরূপ ধরা পড়ে। এগুলোকে প্রতিফলনের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। এটাই প্রতিফলন বিশ্লেষণ হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে।

Lawrence-Wilkes প্রতিটি শব্দ দিয়ে প্রতিফলনের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিম্নরূপ–

R = Remember (স্মরণ করা/মনে করা) : Lawrence-Wilkes এটাকে Look back, review, ensure intense experiences are reviewed 'cold'. (Subjective and objective) হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কোনো পেশার উন্নয়নের জন্য ওই পেশার অর্জিত জ্ঞান/দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়ে ফিরে দেখা, সম্পাদিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয় বোঝানো হয়। এটা বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হতে পারে। স্মরণ করার দিকটি ব্যক্তির অতীত জ্ঞান অর্থাৎ সম্পাদিত কর্মের উপর প্রতিফলন হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কী ভেবেছিল, কী জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল এসব বিবেচনা করা বোঝায়। তবে এটিকে প্রতিফলনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে মনে করা হয়।

E = Experience (অভিজ্ঞতা) : Lawrence-Wilkes 'E' অক্ষর দিয়ে Experience-এর উল্লেখ করেছেন। তিনি Experience বা অভিজ্ঞতা বলতে What happened? What was important? (Subjective and objective) বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির পেশাগত অনুশীলনে কী ঘটেছিল এবং কোনো্ কোনো্ দিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা বিবেচনা করতে হয়। অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো্ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল? এটিও বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়ে থাকে।

F = Focus (বিশেষ দিকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া) : Lawrence-Wilkes এর মতে প্রতিফলন অনুশীলন বা অভিজ্ঞতা অর্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে কী ছিল? কোনো্ দিকটিকে কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল? তিনি অভিজ্ঞতা অর্জনের Focus বলতে বুঝিয়েছেন, Who, what, where, etc. Roles, responsibilities, etc. (Mostly objective)। অর্থাৎ কে, কী, কোথায় ইত্যাদি, দায়িত্ব ও কার্যাবলি ইত্যাদি। এটা অধিকাংশক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় বা যে প্রতিফলন অনুশীলন করা হয় Lawrence-Wilkes সেটাকেই Focus বলেছেন। অর্থাৎ যে দিকটি বা যে বিষয়বস্তুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব ও জোর দিয়ে কোনো ঘটনা বা কার্যক্রম আবর্তিত হয় সেটাকই Focus বলা যেতে পারে।

L = Learn (শেখা) : Lawrence-Wilkes 'L' অক্ষর দিয়ে Learn বুঝিয়েছেন। তার মতে Learn মানে হলো, নতুন কোনো জ্ঞান/দক্ষতা/ধারণা অর্জন করা। এ পর্যায়ে তিনি কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন কেন প্রয়োজন বা কী উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, এর প্রেক্ষাপট বা পরিপ্রেক্ষিত কী সেটার বর্ণনা করতে হবে। এর ফলে ব্যক্তির কী অনুভূতি হয়েছিল এবং নির্ধারিত বিষয়বস্তুর বাইরে আর কী কী দিকনির্দেশনার উল্লেখ করা হয়েছিল তার বিবরণ থাকতে হবে। এটিও বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়ে থাকে। তিনি যেসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে Learn বুঝিয়েছেন সেগুলো হলো Question : why, reasons, perspectives, feelings? Refer to external checks. (Subjective and objective)।

E = Evaluate (মূল্যায়ন করা) : প্রতিফলন অনুশীলনের কারণ, এর ফল, সবল দিক, দুর্বল দিক এবং ব্যক্তির অনুভূতি কেমন ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় Lawrence-Wilkes এর বর্ণিত মডেলের Evaluate পর্যায়ে। এটিকে এক কথায় মূল্যায়ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা আত্মমূল্যায়ন হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজস্ব কাজকর্মের মূল্যায়ন করবে, নিজস্ব চিন্তাভাবনার মধ্যে নতুনত্ব কী আছে তা বিশ্লেষণ করবে। সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ করাও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। Lawrence-Wilkes এগুলোকে Causes, outcomes, strengths, weaknesses, feelings - use metacognition. (Subjective and objective) শব্দ/শব্দগুচ্ছ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মূল্যায়ন পর্যায়টিও বিষয়ভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক। তিনি 'E' অক্ষর দিয়ে Evaluate উল্লেখ করেছেন।

C = Consider (বিবেচনা করা/মনে মনে গভীর চিন্তা করা) : Lawrence-Wilkes এর মতে, প্রতিফলন অনুশীলনের পর্যায়ে অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে প্রতিফলনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ, আত্মোলব্ধি, আত্মসচেতনতাও প্রতিফলন বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কীভাবে প্রতিফলনের মাধ্যমে পেশার আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব এবং আর কী কী বিকল্প পন্থা অনুসরণের জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজন, পেশার গুণগত পরিবর্তনের জন্য কী কী চাহিদা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করাই হলো প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণ করা। এ পর্যায়ে যেসব ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয় সেগুলো অধিকাংশক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। Lawrence-Wilkes একে Assess options, need/possibilities for change? Development needs? 'What if?' Scenarios? Refer to external checks (Mostly objective) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

T = Trial (পরীক্ষণ করা) : Lawrence-Wilkes 'T' অক্ষর দিয়ে Trial শব্দের উল্লেখ করেছেন। এখানে Trial বলতে নতুন জ্ঞান ও ধারণার মধ্যে সমন্বিত করার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে যেসব নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটবে সেগুলো সমন্বিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টিও

তুলে ধরা হয়েছে। Lawrence-Wilkes এটাকে Trial হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রতিফলনের মাধ্যমে পেশার পরিবর্তনকে সামনে রেখে এর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বলে এ পর্যায়ে পরিবর্তন সাধনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি Integrate new ideas, experiment, take action, make change শব্দাবলি দিয়ে Trial স্তরটি ব্যাখা করেছেন।

প্রতিফলন বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দেখা যায় যে, এটি পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষকতা পেশায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিফলনের প্রয়োগ ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রতিফলনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে John Peters এবং Lawrence-Wilkes এর প্রদত্ত মডেল অনুসরণ করা অবশ্যক। কারণ তারা যে দুটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন সেগুলো পেশাগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

Peters-এর বর্ণনা মতে, প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগ করতে হলে কেন এটি প্রয়োগ করা দরকার তা প্রথমেই বর্ণনা করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করার পর তা বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষককে পাঠদানের শুরুতে তার কোনো্ কোনো্ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে চান সেটা নির্দিষ্ট করার পর পাঠদান কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে। পাঠদান শেষ করার পর আত্মসমালোচনা বা স্ব-মূল্যায়ন করে পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করবেন। এরপর সবল দিকগুলোর আরও উন্নয়ন ঘটানো এবং দুর্বল দিকগুলো নিরসন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে বারবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিফলনের কার্যকর প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে। একইভাবে পেশাগত সমস্যা সনাক্তের পর সেগুলো দূর করার পদক্ষেপ নেওয়ার উপায় বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এটাও প্রতিফলন প্রয়োগের আরেকটি কৌশল। অনেক সময় দেখা যায় পাঠদানকালে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটে যেগুলো নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজে চিন্তাভাবনা করে সেসব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, ওই সমস্যাটি সমাধানের জন্য অন্য কোনো শিক্ষক ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছেন। সমস্যাটির সমাধান যেভাবেই হোক না কেন প্রতিফলন প্রয়োগের মাধ্যমেই এটি করতে হবে। পিটার্সের কার্য সম্পাদনের স্তর অনুযায়ী প্রতিফলন প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষককে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পথ বাছাই করে পাঠদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।

অপরদিকে Lawrence-Wilkes এর মডেল অনুযায়ীও প্রতিফলন প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। Lawrence-Wilkes প্রতিফলনকে যেভাবে একটি মডেলে প্রকাশ করেছেন সেটা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যক্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব দিকের প্রতি ব্যক্তিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক সেগুলোই ওই মডেলে তুলে ধরা হয়েছে। তার মডেলটি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য শিক্ষককে পাঠদানের প্রত্যেকটি স্তর গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং বিরাজিত সমস্যাগুলো শনাক্ত করার পর সেগুলো দূর করার জন্য Linda Lawrence-Wilkes এর মডেল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা শিক্ষককে বারবার করতে হবে যাতে তার পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো নিরসন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষক হিসেবে সফল হওয়ার জন্য John Peters এবং Lawrence-Wilkes যে মডেল দাঁড় করিয়েছেন সেগুলো অনুসরণ এবং কার্যকরভাবে প্রতিটি স্তর বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে অনুশীলন করা হলে শিক্ষকতা পেশায় গুণগত উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়। যে কোনো শিক্ষককে ভালো শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন করতে হলে তাকে নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন করা উচিত। শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যে পেশায় উন্নয়নের জন্য অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে শিক্ষক যত বেশি অনুশীলন করবেন তিনি তত বেশি সফল হবেন এবং তার পাঠদানও তত বেশি আকর্ষণীয় ও কার্যকর হবে। শিক্ষার্থীরাও ওই শিক্ষকের পাঠদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে। তবে শিক্ষককে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে প্রতিফলন অনুশীলন করতে হবে। এক্ষেত্রে Peters এবং Lawrence-Wilkes-এর মডেল কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

৯.৪ : প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী : শিক্ষক ডায়েরি, শিখন জার্নাল, সতীর্থ জার্নাল এবং প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা প্রণয়ন

যে কোনো স্তরের শিক্ষককে ভালো শিক্ষকে পরিণত হতে হলে নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন করা দরকার। এর মাধ্যমে শিক্ষক একদিকে যেমন নিজের সুপ্ত দক্ষতাগুলো বিকশিত করার চেষ্টা করতে পারেন, অন্যদিকে তিনি অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের ভালো দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিজের পেশাকে আরও উন্নত করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। এমনকি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষককে ভালো শিক্ষক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যও নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস করা দরকার। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের পাঠদানের ভুল-ত্রুটি এবং সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেই নিজের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন। তবে এ সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়মিতভাবে একটি ডায়েরিতে লিখে রাখা দরকার। এ ধরনের ডায়েরি ছাড়াও শিখন জার্নাল, সতীর্থ জার্নাল প্রতিফলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য এসব সামগ্রীকে প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী বলা হয়।

যে কোনো পর্যায়ের একজন শিক্ষককে শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিজ প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের পাঠদানের কলা-কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এরপর শিক্ষককে বিশ্লেষিত ওই উপাদানগুলোকে নিজের পাঠদানে প্রয়োগ করতে হবে।

এভাবে অনবরত দক্ষ শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, ভালোভাবে পাঠদানের অনুশীলনের অভ্যাস গঠন, নিজের পাঠের আত্মমূল্যায়ন, ভালো পাঠদানের ভিডিও পর্যবেক্ষণ, সতীর্থ ও সহযোগী শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত দক্ষতাগুলোর ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন এবং প্রতিফলন অনুশীলনের প্রচেষ্টা একজন শিক্ষককে ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য কার্যকরভাবে সহযোগিতা করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিফলনের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সে অনুযায়ী শিখনফল অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

প্রতিফলনে সহায়ক উপায়

শিক্ষকতা একটি অত্যন্ত জটিল পেশা। এ পেশায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন না। এর জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়। এ কাজে সফলতা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। নিয়মিত অধ্যয়ন, অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলন অনুশীলন তাকে আস্তে আস্তে দক্ষ শিক্ষকে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। ভালো শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষককে নানা ধরনের উপায় অনুসরণ করতে হবে। এগুলোকে প্রতিফলনে সহায়ক উপায় বা পথ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। এসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে–

- নিয়মিত শিখন সাময়িকী অধ্যয়ন।
- প্রতিফলনের জন্য নিয়মিত শিক্ষক ডায়েরি লিখন ও অনুসরণ।
- পোর্টফোলিও লিখন।
- শিখন সহযোগী ও সতীর্থ অনুশীলন।
- আলোচনা ও মতবিনিময়।
- বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক প্রশিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা।
- শিখন চুক্তি সম্পাদন
- স্ব-মূল্যযাচাইকরণ।
- কর্মসহায়ক গবেষণা অনুসরণ।

প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তার পেশায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে পারেন। কারণ প্রতিফলন অনুশীলনের সুবিধাই এ রকম যে, এটি ব্যক্তির পেশার উন্নয়নে সহায়তা করে। এ ছাড়াও প্রতিফলনের নিম্নবর্ণিত সুবিধা রয়েছে–

- শিক্ষকের নিজস্ব পাঠদান সম্পর্কে এটি একটি গভীর উপলব্ধির সুযোগ করে দেয়।
- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে কার্যকর এবং বহুমাত্রিক সুবিধা তৈরি করে।
- আদর্শ শিক্ষকের স্বীকৃতি প্রদান করে।
- গতানুগতিক পাঠদানের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষকের সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দেয়।
- শ্রেণি পরিবেশে ভিন্ন মাত্রায় শিখন তত্ত্ব প্রয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে ইত্যাদি।

শিক্ষক ডায়েরি

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক ডায়েরি লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ডায়েরিতে শিক্ষক নিয়মিতভাবে তার নিজের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকসহ দক্ষ শিক্ষকের পাঠদানের ভালো দিকগুলো লিখে রাখেন। নিয়মিতভাবে তিনি এই ডায়েরিতে নিজের পাঠদানের ভালো দিক ও দুর্বল দিকগুলো লিখবেন, সতীর্থ শিক্ষক, সহযোগী শিক্ষক, এবং দক্ষ অন্যান্য শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের অনুসরণযোগ্য দিকগুলো ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন। এ ডায়েরি তার শিক্ষকতা জীবনে চলার পথে পরিচালক হিসেবে কাজ করবে যদি তিনি এটা অনুসরণ করেন। ডায়েরি অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে পাঠদানে অথবা শিক্ষকতা জীবনে খারাপ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করা এবং ভালো দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা। এই প্রক্রিয়ায় একজন সাধারণ শিক্ষক দক্ষ শিক্ষকে রূপান্তরিত হতে পারেন। এ জন্য শিক্ষক ডায়েরি অনুসরণ করা জরুরি। একজন প্রশিক্ষণার্থী অথবা কর্মরত নতুন শিক্ষক যখন নিয়মিতভাবে নিজের পাঠের ভুল-ত্রুটি, ভালো দিক, দুর্বল দিক এবং পাঠটি আরও কীভাবে ভালো করা যেত এ ব্যাপারে মন্তব্য করে নিয়মিতভাবে একটি ডায়েরিতে লিখে রাখেন এবং পরবর্তীকালে ওই ডায়েরি পড়ার অভ্যাস করেন তখন ওই ডায়েরিটিই প্রতিফলন শিখন সহায়ক সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। পর্যবেক্ষণে তার বিবেচনার যেসব সূক্ষ্ম বিষয় ডায়েরিতে লিখে রাখা যেতে পারে সেগুলো হলো–

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আচরণের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে তাদের আচরণ কেমন ছিল।
- পাঠদানকালে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেছেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যেসব প্রশ্ন করেছেন সেগুলো কোনো্ স্তরের প্রশ্ন ছিল।
- শিক্ষক প্রশ্ন করার পর উত্তর দেওয়ার জন্য কাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ উত্তরদানের জন্য কীভাবে শিক্ষার্থীদের বাছাই করেন।
- শিক্ষক শ্রেণিতে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলো কি উন্মুক্ত প্রশ্ন নাকি বদ্ধ প্রশ্ন ছিল।
- প্রশ্নগুলো পাঠদান সংশ্লিষ্ট ছিল কিনা।
- শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাস কেমন ছিল।
- শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কীভাবে দল গঠন করেছেন।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের দলগত কাজ দিয়েছেন।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগত কাজ করার সময় শিক্ষকের তদারকি কেমন ছিল।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলগত কাজে সহযোগিতা করছেন কিনা।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলগত কাজ উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা।
- শিক্ষক কীভাবে পাঠ ব্যাখ্যা করেছেন।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট উদাহরণের ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে পাঠের সারাংশ আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা।
- শিক্ষকের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার দক্ষতা কেমন ছিল।
- পাঠে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে উপকরণের মান কেমন ছিল।
- পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল কিনা
- পাঠদানকালে শিক্ষক কোনো আইসিটি সামগ্রী ব্যবহার করেছেন কিনা।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন ইত্যাদি।

শিখন জার্নাল

শিখন জার্নাল বা শিখন সাময়িকী হচ্ছে এক ধরনের পত্রিকা যার মধ্যে নিয়মিতভাবে শিক্ষার উপর নানা ধরনের নিবন্ধ, পাঠদানের নতুন নতুন পদ্ধতি, দক্ষতা ও কলা-কৌশল সম্পর্কিত গবেষণাপত্র, শিক্ষার নানা রকম তত্ত্ব ও তথ্য, কোনো আবিষ্কারের ঘটনা ও কাহিনী ইত্যাদি দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সাময়িকী একজন শিক্ষক যদি নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করেন তাহলে তার ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে এসব জ্ঞান, দক্ষতা, কলা-কৌশল ও পদ্ধতিগুলো বিশেষ সহায়ক হবে। শিখনের জার্নাল অধ্যয়নের পাশাপাশি শিক্ষক এসব জ্ঞান, দক্ষতা ও কলা-কৌশল তার পাঠদান কার্যক্রমে প্রয়োগ করে নিজের পাঠদানে বৈচিত্র্য আনতে পারেন। এতে গতানুগতিকতা পরিহার করে পাঠে নতুনত্ব আনা সম্ভব হয়। এ কারণেই ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে শিখন জার্নাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা বিজ্ঞানের যেসব আধুনিক জ্ঞান, তত্ত্ব ও কৌশল উদ্ভাবিত হয় সেগুলো শিখন জার্নালে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো প্রতিনিয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের গবেষণা পরিচালনা করছে এবং তারা নিত্যনতুন গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করছে। এসব জ্ঞান ও কলা-কৌশল আমাদের জানতে হলে নিয়মিত শিখন জার্নাল অধ্যয়ন করতে হবে। শিখন জার্নালে যেসব বিষয়বস্তু পাওয়া যেতে পারে সেগুলো হলো–

- শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণামূলক নিবন্ধ।
- বিভিন্ন শিক্ষামূলক গবেষণার সারসংক্ষেপ এবং পরিসংখ্যানগত ডাটা।
- শিক্ষামূলক গবেষণার ফলাফলের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এসবের ব্যবহার বা প্রভাব কী হতে পারে সে সম্পর্কিত বিবরণ।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার বর্ণনা এবং এসবের ব্যবহার কৌশল।
- পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিবরণ এবং এগুলোর প্রয়োগ কৌশল।
- শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ও তথ্য ইত্যাদি।

সতীর্থ জার্নাল

প্রশিক্ষণার্থীরা বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন কর্মকাণ্ডসহ সতীর্থদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় কাজ করতে পারেন। তারা একত্রে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন, পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে একজন পাঠ দেবেন এবং অন্যজন তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার পাঠের ভুল-ত্রুটি শনাক্ত করে সে অনুযায়ী তাকে ফলাবর্তন দেবেন। এ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে পর্যায়বৃত্তে পরিণত হয়েছে তার একটি বিবরণ ধারাবাহিকভাবে একটি জার্নালে লিখে রাখতে হবে। এটাকেই সতীর্থ জার্নাল বলা হয়। এভাবেই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা সতীর্থ জার্নাল ব্যবহার করে একে অপরের সহযোগিতায় শিখন-শেখানো কাজে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন। সতীর্থ জার্নালে কেবল পাঠদান উন্নয়ন সম্পর্কিত দিকগুলো লিখে রাখতে হয়, তা নয়। বরং কোনো সতীর্থ শিক্ষকের ভালো পাঠদান প্রক্রিয়া কিংবা কোনো সতীর্থের ভালো উপস্থাপনশৈলী পর্যবেক্ষণ করা হলে সেখান থেকে পর্যবেক্ষণকারী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে সেগুলোও ধারাবাহিকভাবে সতীর্থ জার্নালে লিখে রাখা যেতে পারে। এরপর এই জার্নাল অনুসরণ করে নিজের কর্মে এসবের প্রতিফলন ঘটানো যেতে পারে।

একই যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক শিখন সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা শিখন জার্নালে লিখে রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিফলনের যেসব উপায় রয়েছে যতদূর সম্ভব সবগুলো উপায়ই বিবেচনা করতে হবে। এগুলোকে সূক্ষ্ম প্রতিফলনের সহায়ক উপায় হিসেবে বর্ণনা করা যায়। সূক্ষ্ম প্রতিফলনের সহায়ক পন্থাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন শিক্ষক দক্ষ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তবে এই অনুশীলন বা চর্চা একদিন-দুদিন নয়, বরং সমগ্র পেশাগত জীবনে অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলেই ক্রমাগতভাবে তার পেশাগত উন্নয়ন সাধিত হবে।

পেশাগত প্রতিফলন অনুশীলনে করণীয়

প্রতিটি পেশাজীবীকে পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিফলন অনুশীলন করা আবশ্যক। শিক্ষকতা পেশায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তারাও একইভাবে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের পেশার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তবে শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর এই প্রতিফলন অনুশীলনের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ প্রতিফলন অনুশীলন করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। পর্যবেক্ষণ হতে হবে বাস্তব পরিবেশে। এ ছাড়াও প্রতিফলন অনুশীলন করতে শিক্ষককে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এই প্রতিফলন ফলপ্রসূ করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/শিক্ষক/পেশাজীবীকে মনে রাখতে হবে-

- এ প্রতিফলন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।
- প্রতিফলন কার্যাবলির মান ও গুরুত্বের প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যত্নশীল হতে হবে।
- প্রতিফলন কার্যাবলি পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট পেশার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।
- প্রতিটি কাজ পেশাজীবীর বয়স ও মেধার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- এই অনুশীলন শুধু পেশাগত অভিজ্ঞতার শেষে নয় বরং পেশা গ্রহণের আগে, পেশা চলাকালীন এবং পেশার শেষেও হবে।
- শিক্ষকের জন্য এ অনুশীলন শ্রেণিকক্ষের ভেতরের অভিজ্ঞতার সহিত শ্রেণিকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতার যোগসূত্র তৈরি করবে।
- প্রতিফলন অনুশীলন একদিনের প্রচেষ্টা নয়, বরং এটি একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া।

প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা প্রণয়ন

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করা। শিক্ষা ব্যক্তিকে কর্মজীবনের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষার প্রতিটি শাখায় প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও দক্ষতা, যুক্ত হচ্ছে নানা ধরনের তথ্য। সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের মতো শিক্ষককেও এসব নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে নিজেকে হালনাগাদ করে রাখতে হয়। কারণ সমাজের সদা পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে রাখতে হলে দরকার নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন। বৈশিষ্ট্যগতভাবেই প্রতিফলন অনুশীলন একটি পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

কোনো শিক্ষক তার পেশাগত দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য যেসব কাজ করতে পারেন তার মধ্যে একটি হলো প্রতিফলন অনুশীলন। এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে উন্নতি ঘটানোর জন্য অধ্যয়নের পাশাপাশি অন্য সফল শিক্ষকের কর্মপদ্ধতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো আয়ত্ত করার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যান। একই সঙ্গে শিক্ষক তার পেশার দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করা বা দুর্বল দিকগুলোকে সবল দিকে পরিণত করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে পরিণত করতে চান। এর জন্যও দরকার প্রতিফলন অনুশীলন। তবে প্রতিফলনের মাধ্যমে ঈপ্সিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রতিফলনযোগ্য দিকসমূহ লিখে রাখতে হবে। প্রতিফলনযোগ্য দিকগুলো লিখে রাখলে শিক্ষকের পক্ষে সেগুলো অনুশীলন করা সহজ ও সুবিধাজনক হয়। এ কারণে প্রতিফলন

অনুশীলনকারীকে প্রতিফলন অনুশীলনের পাশাপাশি প্রতিফলনের বিভিন্ন দিক নিয়মিতভাবে লিখে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিফলন অনুশীলনের ক্ষেত্রে যেসব দিক প্রতিফলনের আওতাভুক্ত হবে তা ভবিষ্যতে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে প্রতিফলনকারীকে সফল ও দক্ষ শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ জন্য পর্যবেক্ষণের পূর্বে পর্যবেক্ষণাধীন শিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে হবে, পাঠদানের প্রতিটি স্তরে কী ঘটছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, অর্থাৎ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রতিটি ইস্যুর নোট নিতে হবে।

পর্যবেক্ষণকালে যেসব দিক বিবেচনা করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ–

- পাঠদানের জন্য শিক্ষকের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। যেমন– আসন বিন্যাস, ভৌত সুবিধাবলি এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ইত্যাদি।
- উপকরণ সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা এবং এগুলোর সমাধানের উপায়।
- আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির ব্যবহার এবং এর কার্যকারিতা।
- শিক্ষকের পাঠ উপস্থাপন কৌশল।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলগত কাজ পরিচালনায় শিক্ষকের শ্রেণি তদারকি করা এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও উৎসাহ দানের কৌশল।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে শ্রেণিতে দলগত কাজ উপস্থাপনের সুযোগ।
- পাঠদান চলাকালীন পাঠ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণ, প্রশ্নের ধরন এবং তাদের মধ্য থেকে উত্তর আদায়ের কৌশল।
- শিক্ষকের শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার্থীদের কাজে সম্পৃক্তকরণ।
- শিক্ষকের আইসিটি সামগ্রীর ব্যবহার দক্ষতা।
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল।
- পাঠদান সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য লেখা এবং পরবর্তী পাঠের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন যেগুলো তার নিজস্ব অনুশীলনের উদ্দেশ্যে প্রতিফলন করবেন। কারণ এর মাধ্যমে কার্যকর শিখন ঘটে, এটি সফল শিক্ষক হতে সহায়তা করে, আত্মবিশ্বাস ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। ঠিক এ কারণেই প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে অথবা শিক্ষানবিস একজন নতুন শিক্ষককে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত দিকগুলো লিখে রাখতে হবে। প্রতিফলনে প্রাপ্ত দিকগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত ছকটি নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে–

প্রতিফলন অনুশীলন লিপিবদ্ধকরণের নমুনা

প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণের দিক	পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত মতামত/মন্তব্য
পাঠ সম্পর্কিত পরিকল্পনা ● পাঠ পরিকল্পনা ● পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ ● শ্রেণি পাঠের প্রস্তুতি	
পাঠদানকালে যোগাযোগ ● উচ্চারণের স্পষ্টতা ● দৃষ্টিবিন্যাস ● শ্রেণিতে বিচরণ ● পাঠের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন ধাপের/অংশের সাথে সম্পর্ক	
শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ● নির্দেশনা ● শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ● জোড়া বা দলগত কাজের ব্যবস্থাপনা ● শ্রেণির কাজ তত্ত্বাবধানের দক্ষতা ● সময় ব্যবস্থাপনা ● শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা	

শিক্ষকের আচরণ ● শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক ● শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও প্রশংসা প্রদান ● বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা	
সম্পৃক্ততা ● শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা ● কার্যক্রম নির্বাচন ● জেন্ডার সচেতনতা	
প্রশ্নকরণ ● প্রশ্নের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার ● উচ্চস্তরের প্রশ্নের প্রয়োগ ● প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থাপনা ● উত্তরের ত্রুটি সংশোধন ও নতুন প্রশ্নকরণ	
শিক্ষা উপকরণ ● যথা সময়ে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার ● অন্যান্য উপকরণের/সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার ● চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার	

প্রতিফলন অনুশীলন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বা সংক্ষিপ্ত কোনো পদ্ধতিতে প্রতিফলন অনুশীলন করা যায় না। প্রতিফলনের উদ্দেশ্যই থাকে কোনো শিক্ষকের মধ্যে যেসব দক্ষতার অভাব রয়েছে সেগুলো অর্জন করা। কোনো দক্ষতা বা পাঠদানের পদ্ধতি ও কলা-কৌশল একদিনে যথার্থভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এ জন্যই প্রতিফলনে আগ্রহী ব্যক্তিকে যথেষ্ট সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। একই সঙ্গে প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সবল ও প্রয়োজনীয় দিকগুলো লিখে রাখতে হয়। পরবর্তীকালে লিখিত দিকগুলো অনুশীলন করে নিজের মধ্যে প্রতিফলন করতে হবে। তবে শিক্ষক হিসেবে দক্ষ হওয়ার জন্য অন্য দক্ষ শিক্ষকের পাঠদান ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা, প্রতিফলনযোগ্য দক্ষতা শনাক্ত করা, পর্যবেক্ষিত বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং নিজের মধ্যে এগুলোর প্রতিফলন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবেন।

৯.৫ : প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগে সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

শিক্ষকতা পেশার ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটাতে প্রতিফলন অনুশীলন সহায়তা করলেও এটি প্রয়োগে বাস্তবে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি এর ভৌত সুবিধাবলি বিষয়ক সমস্যারও অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন– বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকার কারণে দৈনন্দিন স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকায় পাঠদানে বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুরবস্থা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি কারণেই শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। এসব কারণে প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এক কথায় বলা চলে, সমসাময়িককালে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রধান বলে প্রতীয়মান হয় তার মধ্যে রয়েছে, উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, ইতিবাচক শিখন-শেখানোর পরিবেশ সংবলিত আধুনিক শ্রেণিকক্ষের অভাব, দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা, বহু প্রতিষ্ঠানে অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, ক্ষেত্রবিশেষে প্রাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে অধিকাংশ শিক্ষকের অনাগ্রহ, অনেক শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি। এগুলোর সবই হলো প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। এসব কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিফলন অনুশীলন যথার্থ হয় না।

প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন ঘটাতে নিবিড়ভাবে সহায়তা করলেও কিছু সমস্যার কারণে এর সফল প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে প্রতিফলন অনুশীলন করা শিক্ষকের পক্ষে অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণে প্রতিফলন অনুশীলনে সাধারণত যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো নিম্নরূপ–

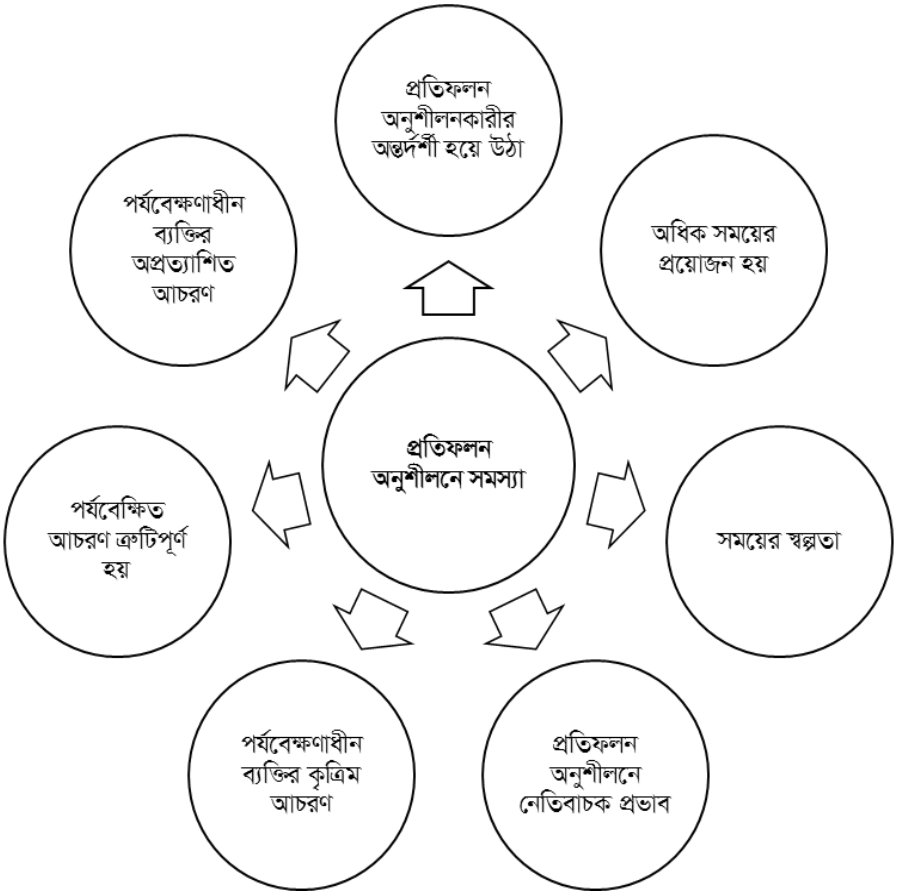

চিত্র : প্রতিফলন অনুশীলনে সমস্যা

প্রতিফলন অনুশীলনের সমস্যাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

প্রতিফলন অনুশীলনকারীর অন্তর্দর্শী হয়ে ওঠা

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পেশা সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে পর্যবেক্ষণকারী নিজের মধ্যে ভালো দিকগুলো প্রতিফলন করার চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণকারীকে অন্য ব্যক্তির কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শী হতে হয়। অর্থাৎ তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে গভীরভাবে। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিফলন অনুশীলনে অনুশীলনকারী অতিমাত্রায় অন্তর্দর্শী হয়ে ওঠে ফলে তার মধ্যে কর্ম সম্পর্কে উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। নিজের মধ্যে এ ধরনের উদ্বেগ থাকার কারণে তার নিজস্ব আচরণ অস্বাভাবিক হতে পারে এবং তিনি নিজে অতিমাত্রায় অন্তর্দর্শী হয়ে ওঠার কারণে কাজকর্ম নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন অপরিহার্য হলেও এটি একদিনে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ যথেষ্ট সময় নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রতিফলন অনুশীলন করতে হয়। যে কোনো ব্যক্তি তার যে পেশার উন্নয়ন ঘটাতে চান তাকে ওই পেশার ভালো পেশাধারী অন্য ব্যক্তির কাজকর্ম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুসরণযোগ্য ভালো দিকগুলো

লিখে রাখতে হবে। এরপর এগুলো নিয়মিত অনুশীলন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটা অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে করতে হয় বলে প্রতিফলন অনুশীলনে অধিক সময় ব্যয় হয় বা সময়ের অপচয় ঘটে। তবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যতটুকু সময় ব্যয় করা হয়ে থাকে সেটার কার্যকর ব্যবহার করা উচিত।

সময়ের স্বল্পতা

যেহেতু প্রতিফলন অনুশীলন দীর্ঘ সময়ব্যাপী করতে হয় সে কারণে প্রতিফলনকারীকে যথেষ্ট ধৈর্য্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তি তার নিজস্ব ব্যস্ততার জন্য পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। ফলে পর্যবেক্ষণও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এছাড়া যে শিক্ষককে বা যাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে তার নিজেরও ব্যস্ততা থাকায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে অধিক সময় দেওয়া যায় না। ফলে সময় স্বল্পতার কারণে পর্যবেক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগে সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিফলন অনুশীলনে নেতিবাচক প্রভাব

প্রতিফলন অনুশীলন করতে হলে অনুশীলনকারীর সংশ্লিষ্ট পেশা সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকলে তার পর্যবেক্ষণ যথাযথ হয়। যিনি প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি পর্যবেক্ষিত আচরণের সঙ্গে তার নিজের অভিজ্ঞতার তুলনা করে নতুন আচরণ অর্জনের চেষ্টা করেন। যদি ওই ব্যক্তির পেশা সম্পর্কে পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতা সব সময় ইতিবাচক নাও হতে পারে। অনেক সময় নতুন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকারীর মধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই দেখা যায় পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় কখনো কখনো প্রতিফলন অনুশীলনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির কৃত্রিম আচরণ

অনেক সময় দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হবে আগে থেকে ওই ব্যক্তি তা জানার ফলে তিনি স্বাভাবিক আচরণ নাও করতে পারেন। আবার কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তির মধ্যে কৃত্রিম আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। এমনকি পর্যবেক্ষণ করার বিষয়টি পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির জানার ফলে তিনি এ সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন এবং সব সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকেন যাতে পর্যবেক্ষণকালে কোনো নেতিবাচক কিছু না ঘটে। অথচ এটাই পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির কাছ থেকে যথার্থ আচরণ করার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ কারণে প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণকালে পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির কৃত্রিম আচরণ যথার্থ প্রতিফলনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

পর্যবেক্ষিত আচরণ ত্রুটিপূর্ণ হয়

প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্দেশ্যে যখন কোনো শিক্ষক অন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন পর্যবেক্ষণাধীন শিক্ষকের আচরণ অর্থাৎ পর্যবেক্ষিত আচরণ সব সময় যথার্থ হয় না। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে একটি বিশেষ অবস্থায় আচরণ করতে গিয়ে অবচেতনভাবে হলেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করেন। এ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি সব সময় যথার্থ আচরণ নাও পেতে পারেন। আবার যিনি প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ করবেন পর্যবেক্ষণে তার নিজস্ব ত্রুটিরও সৃষ্টি হতে পারে। এই উভয় কারণে পর্যবেক্ষিত আচরণ অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ হয়।

পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আচরণ

অনেক সময় দেখা যায়, পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তি পর্যবেক্ষণকালে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মধ্যে সব সময় এমন একটি সতর্কভাব পরিলক্ষিত হয় যে পর্যবেক্ষণে যাতে কোনো নেতিবাচক কিছু ধরা না পড়ে। অথচ বাস্তবে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফলে তিনি যে আচরণ করেন কার্যত তা অপ্রত্যাশিত আচরণ হিসেবে ধরা পড়ে। পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তিও এটা অনেক সময় বুঝতে পারেন না। এ কারণে বলা যায়, পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির আচরণ সব সময় প্রত্যাশিত নাও হতে পারে।

প্রতিফলন অনুশীলন প্রয়োগের সমস্যা উত্তরণের উপায়

প্রতিফলন অনুশীলনে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয় সেগুলো নিরসনের জন্য অনুশীলনকারীকে কার্যকরভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে প্রতিফলন অনুশীলনকারী শিক্ষককে নিচের দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে–

১. **প্রতিফলন ডায়েরির নিয়মিত ব্যবহার :** প্রতিফলন অনুশীলনে যথেষ্ট সমস্যা থাকলেও প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শুধু শিক্ষকতা নয়, বরং যে কোনো পেশাতেই যত রকমের সমস্যার সৃষ্টি হোক না কেন সেগুলো আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দূর করতে হবে। এ জন্য নিজের পেশাগত আচরণ নিয়ে নিজেকে আত্মমূল্যায়ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে নিজের পাঠদান কার্যক্রমের সবল ও দুর্বল দিকগুলো প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে। এরপর নিয়মিতভাবে প্রতিফলন ডায়েরি ব্যবহার করতে হবে।

২. **পুনঃপাঠদান এবং অনুশীলন করা :** যে কোনো পাঠদানে ত্রুটি থাকবেই। যত ভালো শিক্ষকই হোন না কেন পাঠদান করতে গেলে কিছু না কিছু ত্রুটি ধরা পড়তে পারে। ঠিক তেমনি পাঠদানকালেও নানা ধরনের ত্রুটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ জন্য প্রতিফলন ডায়েরিতে পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো লিখে রাখতে হবে এবং দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করার পর সেগুলো দূর করার জন্য পুনরায় পাঠদান করতে হবে এবং এভাবে বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠদানের গুণগত মান উন্নয়ন করার চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে হলে প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষানবিস শিক্ষককে পুনঃপাঠদান এবং নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

৩. **পাঠের সবল দিকগুলো শনাক্ত করা :** পাঠদানের দুর্বল দিকগুলোই যে কেবল শনাক্ত করার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয় তা নয়। বরং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে পাঠদানের সবল দিকগুলোও শনাক্ত করতে হবে। এরপর আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে তার নিজের পাঠদানের ফলাবর্তন করতে হবে এবং এভাবে পাঠের সবল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো পাঠদানে বারবার প্রয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে এক সময় নিজের পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো নিরসন করা সম্ভব হবে এবং প্রতিফলন অনুশীলনও যথার্থ হবে।

৪. **নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা :** প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে কার্যকর প্রতিফলনের মাধ্যমে নিজের পাঠদানের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাঠদান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ভালো দিকগুলো নিজের পাঠদানে প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য যতই সময়ের স্বল্পতা থাকুক না কেন ভালো শিক্ষকের পাঠদান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫. **নিয়মিত অনুশীলন করা :** বৈশিষ্ট্যগত কারণে প্রতিফলন অনুশীলন একটি নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়ায় অনুশীলনকারীকে নিয়মিতভাবে অনুশীলন করতে হবে এবং নিজের পাঠদানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে নিয়মিত অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পারলে প্রতিফলন অনুশীলন কার্যকর হয়ে উঠবে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাও নিরসন করা সহজ হবে। ই.এল. থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Connectionism) তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিয়মিত সংযোগ সাধন করতে পারলে শিখন স্থায়ী হয়। এ দিকটি বিবেচনা করে বলা যায়, প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও নিয়মিত অনুশীলন জরুরি।

৬. **প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে সচেতন হওয়া :** প্রতিফলন অনুশীলন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অন্যের গুণগত পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে সেখান থেকে ভালো দিকগুলো শনাক্ত করার পর তা নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজের পাঠদানে প্রয়োগ করা অনেক দক্ষতা সাপেক্ষ। এ কারণে প্রতিফলন অনুশীলনকারীকে পর্যবেক্ষণে যথেষ্ট সচেতন না হলে ঈপ্সিত মাত্রায় প্রতিফলন অনুশীলনের ফললাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রতিফলন অনুশীলনকালে অনুশীলনকারীকে সচেতন থাকতে হবে যাতে পাঠদানের দুর্বল দিকগুলোর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

৭. **পুনরাবৃত্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে সবল দিকগুলো লিখে রাখা :** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেসব দিক সবল এবং যেগুলো নিজের পাঠদানে প্রয়োগযোগ্য বলে মনে হবে প্রয়োজনে সেগুলো প্রতিফলন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানো যেতে পারে। কারণ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই প্রতিফলনে অনুশীলনে সমস্যা নিরসন করা যায়। এভাবে অনুশীলন করলে প্রতিফলন অনুশীলনে অনেক সমস্যাই দূর হয়ে যাবে।

৮. **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পোষণ :** পর্যবেক্ষণকারী এবং পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তি উভয়কে প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পোষণ এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে যাতে প্রতিফলনের কাজটি শুরুতেই নিজেদের আয়ত্তে থাকে। এর ফলে প্রতিফলন সম্পর্কে অহেতুক নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হবে না।

শিক্ষকতা পেশা একটি জটিল পেশা। এটি অন্য পেশার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানবীয় সম্পদ নিয়ে কাজ করতে হয়, যাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আজ যারা শিক্ষার্থী তারা আগামী দিনগুলোতে দেশের উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব দেবেন। এ কারণে বর্তমানের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকের দায়িত্ব। এই শিক্ষার্থীদের যারা শিক্ষাদান করবেন তাদের অর্থাৎ সেই শিক্ষকদের আগে দক্ষ ও উপযুক্ত হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। নিজেকে ভালো ও দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দরকার নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক অথবা কর্মরত নতুন শিক্ষক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো শনাক্ত করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা নিয়মিতভাবে পাঠদানে প্রয়োগ এবং এই অভ্যাসের নিয়মিত অনুশীলন করে শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো (একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং ব্যক্তিগত) অর্জন করতে পারেন।

একজন প্রশিক্ষণার্থী যদি প্রতিদিন কোনো না কোনো একটি ভালো পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেন কিংবা নিজের পাঠদানের ভালো-মন্দ দিক শনাক্ত করতে পারেন এবং এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী দুর্বল দিকগুলো পরিত্যাগ করে ভালো দিকগুলো আয়ত্ত করার অভ্যাস গড়ে তোলেন তাহলে এই চেষ্টা বা অনুশীলন তাকে ভালো শিক্ষক হতে সহায়তা করবে। প্রতিফলন অনুশীলনে কেবল অপরের ভালো দিকগুলোই নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ লাভ ঘটে এবং দুর্বল দিকগুলো পরিহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটা অত্যন্ত সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণকারীকে মেনে চলতে হবে।

অন্যদিকে ভালো শিক্ষক হওয়ার প্রচেষ্টায় একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ভালো পাঠদানের ভিডিও পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বারবার ভিডিও চালিয়ে ভালো দক্ষতাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে অনুযায়ী নিজের পাঠ সাজিয়ে পাঠদানের অভ্যাস গঠন করতে পারেন। এমনকি প্রতিফলন অনুশীলনকারী শিক্ষক নিজেও তার পাঠদানের ভিডিও করাতে পারেন এবং পাঠদান শেষ হলে নিজেই নিজের ক্লাসের ভিডিও দেখে সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়েও নিজের পাঠদান দেখতে পারেন। এরপর উভয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করে ওই ক্লাস সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। এভাবে প্রতিফলন অনুশীলন করলে নিজের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

একই সঙ্গে প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য নিয়মিত প্রতিফলন ডায়েরি লেখা এবং অনুসরণ করাও দরকার। এ ডায়েরিতে পাঠদানের দক্ষতা এবং উপ-দক্ষতাগুলো ভালোভাবে রেকর্ড করে নিজের অনুশীলনের মধ্যে সেটা ফুটিয়ে তুলতে পারলেই প্রতিফলন অভিজ্ঞতা শিখনে পরিণত হতে পারে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. (ক) প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কী বোঝায়?
(খ) প্রতিফলন অনুশীলনের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২. (ক) প্রতিফলন শিখন চক্র কী?
(খ) প্রতিফলনে সহায়ক সামগ্রী বলতে কী বোঝায়?

৩. (ক) শিখন জার্নাল কাকে বলে?
(খ) শিখন জার্নালে সাধারণত কী কী দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে?

রচামূলক প্রশ্ন

১. (ক) David Kolb-এর চার স্তরবিশিষ্ট অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্রটি ব্যাখ্যা করুন।
(খ) প্রতিফলন শিখন চক্র অনুযায়ী প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation) কীভাবে করতে হয়?

২. (ক) বিমূর্ত বোধগম্যতা (Abstract Conceptualization) স্তরটি ব্যাখ্যা করুন।
(খ) শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন ঘটাতে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ব্যাখ্যা করুন।

৩. (ক) পেশাগত প্রতিফলনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
(খ) প্রতিফলন অনুশীলনে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান বর্ণনা করুন।
(গ) 'প্রতিফলন অনুশীলনে সফলতা লাভ করতে হলে নিয়মিত প্রতিফলন ডায়েরি লেখা ও অনুসরণ করা একটি কার্যকর কৌশল' এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন ও শিখনযাচাই (ফেব্রুয়ারি ২০১৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). What is reflection in learning?, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) *Reflection: Turning Experience into Learning*, London: Kogan Page, 7-17.

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). Promoting reflection in learning: a model, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) *Reflection: Turning Experience into Learning*, London: Kogan Page, 18-40.

সহায়ক তথ্যসূত্র

রায়, সুশীল, মূল্যায়ন: নীতি ও কৌশল (১৯৯৫), সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ- ১১৯।

তপন, ডঃ শাহজাহান ও অন্যান্য, শিক্ষা মূল্যায়ন: নীতি ও ব্যবহারিক দিক (১৯৯৭), স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। পৃ- ১০৮।

রায়, সুশীল, মূল্যায়ন: নীতি ও কৌশল (১৯৯৮), জলপাইগুড়ি, ভারত।

রায়, সুশীল, শিক্ষা মনোবিদ্যা (১৯৯৯), ৮ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১।

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০০০), মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

শিক্ষা মূল্যায়ন: নীতি ও ব্যবহারিক দিক (২০০১), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

হক, মোহাম্মদ নাজমুল ও জাহান, মনিরা, শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা: পিয়াঁজে তত্ত্ব (২০০২), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০০৭), প্রভাতী লাইব্রেরী, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ শিখন সামগ্রী)–২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৭-৩৫ এবং ৫১ -৫৩, ৫৯, ৬০,৭১।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ১ এবং ৩), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড), শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (মডিউল ৪ এবং ৫), ২০০৮, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০০৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ ও ৩: শিখন সামগ্রী)-২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- বিএড (মডিউল ৪ এবং ৫)-২০১০, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (২০১২)-বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, এনসিটিবি, ঢাকা।

ঢালী, স্বপন কুমার, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন (২০১৩), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

হাবীব, মোঃ আহসান এবং আন্যান্য, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৩), মিতা ট্রেডার্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ), সেসিপ, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৪।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬ খ্রি:।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন ও শিখনযাচাই (ফেব্রুয়ারি ২০১৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৬১-৬৫।

উদ্দিন, এম জামাল ও চৌধুরী, মুহাঃ শহীদুল আমিন, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা।

চারু ও কারুকলা: ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Scott, Psychology, Foresman and Company; page 83.

Page and Thomas, International Dictionary of Education, Kogan Page, London/ Nichols Publishing Company, New York 1978.

Hergenhahn, B.R.(1982), An Introduction to Theories of Learning, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632, USA.

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). What is reflection in learning?, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) *Reflection: Turning Experience into Learning*, London: Kogan Page, 7-17.

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). Promoting reflection in learning: a model, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) *Reflection: Turning Experience into Learning*, London: Kogan Page, 18-40.

Patel R.N Education, Theory and Practice, Himalaya Publishing House, Bombay, Delhi, Nagpur, 1992, Page-176.

Best, John W & Kahn, James V, Research in Education (Seventh Edition, 2001), Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi.